শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীদিবাকর মিশ্র

শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীদিবাকর মিশ্র

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ, রবিবার
শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের প্রাকট্যতিথিবাসরে
বঙ্গভাষায় প্রথম প্রকাশ

প্রকাশক : শ্রীগোস্বামী প্রেস, কটক - ৭৫৩০০২

বিক্রেয় নহে

আনুকূল্য : ঐকান্তিকী শ্রদ্ধামাত্র

শ্রীদিবাকর মিশ্রের দ্বারা কটক শ্রীগোস্বামী প্রেসে মুদ্রিত

প্রাক্‌কথন

এই জগতে দেখা যায় যে, কোন বস্তুর মহিমাজ্ঞান হইলেই তাহার আদরযত্ন করিতে লোক তৎপর হইয়া থাকে। সেইরূপ কোন ব্যক্তির গুণগরিমা উপলব্ধি করিতে পারিলে সেই ব্যক্তির প্রতি স্বতঃই ভক্তিভাবে হৃদয় ভরিয়া যায় এবং যেকোন মতেই তাঁহার সেবাসম্পর্কে আসিতে মনুষ্য ব্যগ্র হইয়া উঠে।

শ্রীগুরুকরণ সম্পর্কেও এই কথাই প্রযোজ্য। শ্রীগুরুদেবের মহিমাজ্ঞান হইলেই তাঁহার সম্পর্কে আসিবার জন্য হৃদয়ে ব্যগ্রতা জাগে। উপরোক্ত বিষয়টি প্রাকৃত ভূমিকার কথা, কিন্তু শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত। তিনি হ্লাদিনী শক্তির দূত। সূর্য যেরূপ স্বপ্রকাশ, শ্রীগুরুদেবও সেইরূপ স্বপ্রকাশ। প্রাকৃত বিচারের দ্বারা চালিত হইয়া এই হ্লাদিনী-শক্তির দূতের স্বরূপ উপলব্ধি করা একান্ত অসম্ভব।

কর্মফলবাধ্য হইয়া সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে জীবের দৈবক্রমে জীবোদ্ধার-উদ্দেশ্যে সংসারে ভ্রমণশীল মহতের সঙ্গে যোগাযোগ হইয়া যায়। ইহার ফলে তাহার হৃদয়ে একটি ভক্ত্যুন্মুখ সংস্কারের সৃষ্টি হয়। সেই সংস্কার ফলে পরবর্তিকালে সাধুসঙ্গের প্রতি স্বতঃই তাহার আগ্রহ জন্মে এবং ভগবদিচ্ছায় তাহার উপযুক্ত সাধুসঙ্গলাভও হইয়া থাকে। আকস্মিক মহৎকৃপাজাত সংস্কারের দ্বারা চালিত হইয়া সে শ্রীগৌরকৃষ্ণে জাতরতি এই সাধু বা মহৎকে নিজের গুরুরূপে বরণ করে এবং শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া তদনুযায়ী আচরণ করে। ভক্তিশাস্ত্রে ইহাকে পূর্বাঙ্গরূপ গুরুকরণ বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় সাধক যত্নসহকারে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করিয়া ভক্তিসাধনে রত হইলে ক্রমশঃ অবিদ্যামুক্তি (রজস্তমোগুণ হইতে মুক্তি) লাভ করে। অনন্তর হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় তাহার শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রত্যঙ্কুর জাত হয়। তখন সে ভক্তিসাধনের উপযুক্ত অধিকারী হইয়াছে জানিতে পারিয়া শ্রীগুরুদেব তাহাকে রাগমার্গের ভজনপদ্ধতি উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহাই পরাঙ্গরূপ গুরুকরণ। এই ভূমিকায় সে শ্রীগুরুদেবের প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজের নিয়ামক ও প্রিয়তম জানিয়া যত্নসহকারে তাঁহার উপদেশানুযায়ী সাধন করে। এই সাধনভক্তি অনুষ্ঠানের ফলে সে প্রেম লাভ করে। ইহাই ভক্তিসাধনের ক্রম।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে জানা যায় যে, গুরুলাভ জীবের চেষ্টাসাধ্য নহে। আকস্মিক মহৎকৃপাজনিত ভাগ্যই শ্রীগুরুদেবের সান্নিধ্যলাভের একমাত্র কারণ। যাহার আকস্মিক মহৎকৃপাজনিত পূর্ব সংস্কার না থাকে, সে শ্রীগুরুরূপী মহতের সংস্পর্শে আসিলেও তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না।

এসম্পর্কে একটি বিষয় উল্লেখ করা নিতান্ত লজ্জাজনক হইলেও মহৎকৃপার মহিমার কথা উল্লেখ করিবার দুর্বার লোভ হেতু ইহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া সম্ভবপর হইল না। এ বিনীত লেখকের জন্ম কটক জেলার এরসমা থানাস্থিত পঞ্চপল্লী গ্রামে। পিতা শ্রীলক্ষ্মণ মিশ্র ও মাতা শ্রীমতী যমুনা দেবী। পিতা প্রত্যহ শেষরাত্রিতে শয্যাত্যাগ করিয়া শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেন এবং এই বিনীত লেখককেও বাল্যকাল হইতে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেন। শ্রীগ্রামেশ্বর মহাদেব এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাল্যকাল (৮।৯ বৎসর বয়স) হইতে অনেক সময়ে পিতার আদেশে দ্রোণপুষ্প চয়ন করিয়া শ্রীগ্রামেশ্বরকে দিতাম। তাঁহার দর্শনান্তে তাঁহাকে দণ্ডবৎপ্রণামের সময় কিছু প্রার্থনা করিবার কথা মনে জাগিত। কিন্তু কি প্রার্থনা করিতে হইবে সেবিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতাম না। কারণ সেই বয়স হইতেই কোন একটি উৎকৃষ্ট পথে যাইবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছিল। অতএব কোন্ পথে গেলে ভাল হইবে, সেই চিন্তা সর্বদা হৃদয়কে উদ্বেলিত করিত। কিন্তু নিজে চিন্তা করিয়া নিজের গন্তব্যপথ স্থির করা সম্ভব হইত না। তবুও সেই চিন্তায় মন সর্বদা অস্থির হইত। ফলে পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করাও সম্ভব হইত না। এইরূপে দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ মনে জাগিল, "হে প্রভো! যে পথে গেলে মঙ্গল হইবে, এ অধমকে সেই পথেই লইয়া যান,"—এই প্রার্থনাই সর্বদা মনে বলবত্তর হইতে থাকে। যখনই দর্শন করিতে যাই তখনই এই প্রার্থনা করিতে থাকি।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস। সেই সময় আমি রেভেন্সা কলেজিয়েট স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। হঠাৎ একজন বাল্যবন্ধুর নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলাম। তাহাতে উভয়ের একসঙ্গে তীর্থভ্রমণ করিতে যাইবার কথা লেখা ছিল। তাহার মধ্যে আর একখানা চিঠি কটকস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে দেওয়ার জন্যও ছিল। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ শ্রীগৌড়ীয় মঠের শাখাবিশেষ। তথায় ঐ চিঠিটি দিতে গিয়া মঠবাসী বৈষ্ণববৃন্দের নিকট হইতে শ্রীল আচার্যদেবের সম্পর্কে শুনিতে পাইলাম। সেই দিন হইতে কেমন যেন বিশ্বাস জন্মিল যে, যে পথের অনুসন্ধিৎসা আমার মনে জাগিয়াছে, এই মহাপুরুষই সেই

পথের সন্ধান নিশ্চিতরূপে দিতে পারিবেন। এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে জাত হইবার পর তাঁহার উপদিষ্ট ভক্তিযোগের প্রতিও আমার আগ্রহ বাড়িতে লাগিল।

তাহার পর ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই ১৭ তারিখে গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে যোগদান করিলাম। তথায় প্রসঙ্গক্রমে বৈষ্ণবগণের নিকট শুনিতে পাইলাম যে, কেবল শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগুরুদেবতাত্ম বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথাশ্রবণই ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইবার একমাত্র সাধন। তাঁহাদের সেই উপদেশ শিরোধার্য করত তদবধি কোন গ্রন্থপাঠে প্রয়াসী না হইয়া কেবল শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথাশ্রবণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি। কারণ বৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত নিজের প্রাকৃত জ্ঞানকে সম্বল করিয়া গ্রন্থপাঠ করিলে তদ্দ্বারা গ্রন্থের উদ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ত হৃদ্‌বোধ হইবেই না, অধিকন্তু নিজেকে শাস্ত্রজ্ঞজ্ঞানে দম্ভবৃদ্ধি হইয়া ভক্তিপথচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। এজন্য সিদ্ধান্তবিদ্ বৈষ্ণবগণের বা শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে সিদ্ধান্ত-শ্রবণই একান্ত কাম্য। এসম্পর্কে জনৈক বঙ্গীয় কবির প্রতি শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর উপদেশ প্রণিধানযোগ্য—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"

(শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ৫।১২৩-২৪)

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কটকস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে অবস্থান করার সময় শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীমুখ হইতে শ্রীভক্তিসন্দর্ভব্যাখ্যা শুনিবার জন্য পত্র পাইলাম। পত্র পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমায়াপুর যাত্রা করিলাম। পরদিবস প্রায় বেলা একটার সময় শ্রীমায়াপুরে পৌঁছাইলাম। বৈশাখ মাস। রৌদ্রের তাপে মুখ জ্বলিয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় তথায় পৌঁছাইয়া শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীচরণদর্শন করিতে গেলাম। তাঁহাকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া উঠিতে না উঠিতেই জনৈক ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রসাদ পেয়েছেন ?" তাঁহার এইপ্রকার প্রশ্নে আমার মনে একটু বিরক্তিভাব আসিল। কারণ এতদিন পরে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেছে, তাঁহার সহিত দু'একটি কথা না বলিয়া প্রথমেই নিজের সুখের জন্য প্রসাদ পাইতে যাইব! অবশ্য আমি দণ্ডবৎপ্রণাম করার সময় তাঁহার নিকট অনেক লোক ছিলেন। সুতরাং আমার সঙ্গে আলাপ

করিবার সুযোগও তখন তাঁহার ছিল না। আমার মুখমণ্ডল হইতে অন্তরের বিরক্তিভাব জানিতে পারিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন, "আপনি রাগ করিতেছেন কী? সকলে প্রসাদ পাইবার পর শ্রীল আচার্যদেব প্রসাদ পাইবেন। তিনি এপর্যন্ত জলগ্রহণও করেন নাই।" তাঁহার নিকট হইতে এইটুকু শোনা মাত্র আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কোথায় শিষ্যের শ্রীগুরুদেবের অবশেষ প্রসাদ পাওয়ার কথা; অথচ এখানে শিষ্যগণের প্রসাদ পাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত শ্রীগুরুদেব জলস্পর্শ না করিয়া বসিয়া আছেন! শিষ্যগণ সকলেই প্রসাদ পাইয়াছেন, এই সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হইলে, তিনি প্রসাদ পাইবেন! ধন্য শিষ্যবৎসল শ্রীগুরুদেব! ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম যে, যাঁহারা ভোগরন্ধন, প্রসাদপরিবেষণ, বাসনমাজা ও গোসেবাদিতে নিযুক্ত থাকেন, সাধারণতঃ তাঁহাদের প্রসাদ পাইতে বিলম্ব হয়। তজ্জন্য তাঁহারা ঠিক সময়ে শ্রীল আচার্যদেবের পাঠে যোগ দিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে যথাসময়ে শ্রবণের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীল আচার্যদেব আদেশ করিয়া থাকেন যে, সকলে প্রসাদ পাইয়া পাঠ-শ্রবণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, এই খবর পাইবার পর তিনি প্রসাদ পাইতে যাইবেন। সেদিনও তাহাই হইল। আমাদের প্রসাদগ্রহণের খবর পাইবার পর যে ঘরে সকলে প্রসাদ পান, সেই ঘরে শ্রীল আচার্যদেব প্রসাদ পাইতে গেলেন। প্রসাদ-সেবনগৃহের সম্মুখস্থিত 'ভক্তিবিজয়ভবন'নামক অতিথিশালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সে দৃশ্য দেখিতেছিলাম। তিনি খুব বেশী হইলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে যৎসামান্য প্রসাদ পাইয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট পাছে কেহ লইয়া যায়, সেই আশঙ্কায় নিজের উচ্ছিষ্টপত্র নিজেই উঠাইয়া উচ্ছিষ্টগর্তে নিক্ষেপ করিলেন ও মুখহাত ধুইয়া তথা হইতে সোজা নাটমন্দিরে পাঠ করিতে গেলেন। সে দৃশ্য আজও চোখের সামনে ভাসিতেছে। তখন প্রায় বেলা দুইটা। তখন হইতে রাত্রি প্রায় সাতটা বা আটটা পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ-ছয় ঘন্টাব্যাপী তিনি এক আসনে বসিয়াই পাঠ করিতে থাকেন। ইহা একদিনের ঘটনা নয়। দৈনন্দিন ইহা চলিতে থাকে। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু মঠবাসী ও গৃহস্থভক্ত আমন্ত্রিত হইয়া পাঠ শুনিতে আসিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য মঠের বিরাট নাটমন্দির ও তাহার বাহিরের পূর্ব ও দক্ষিণ পার্শ্ব শ্রোতাগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত।

অধিকারী-অনধিকারী নির্বিশেষে সকল শ্রোতাকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত শুনাইয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি তাহাদের আগ্রহ জন্মাইবার বাসনায় তিনি যে কী আবেগে সেইসব সিদ্ধান্ত কীর্তন করিতেন এবং প্রত্যেক শ্রোতাকে ইহা বুঝাইবার জন্য

যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেন, উহা দেখিলে তিনি প্রত্যেকের প্রতি কিরূপ স্নেহশীল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। আহা ! মাদৃশ জন্মজন্মান্তরের অপরাধী, অনভীপ্সু ও নিতান্ত অযোগ্যকেও স্বীয় শক্তি সঞ্চারের দ্বারা শুদ্ধভক্তিসাধনে অধিকারী করাইবার জন্য তাঁহার কী অদম্য চেষ্টা, কী আবেগ, কী অকথনীয় ক্লেশস্বীকার ! হে অদোষদর্শী, অনুগতবৎসল, হীনার্থাধিকসাধক শ্রীগুরুদেব ! এ নরাধম তোমার এই গুণাকৃষ্ট হইয়া কবে তোমার শ্রীপাদপদ্মে আত্মবিক্রয় করিবে ?

প্রায় মাসাধিক কাল শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা শুনিবার পর তাঁহার আদেশে আবার কটক মঠে ফিরিয়া আসিলাম। তথায় কিছুদিন থাকিয়া তথা হইতে আন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী জেলার কভুর মঠে গেলাম। ভক্তিসন্দর্ভপাঠে সাধনহিসাবে শ্রীহরিনামকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা শুনিয়া আমার অবিবেকিতা হেতু নিজের অধিকার বিচার না করিয়া আমি সবসময়ে শ্রীহরিনাম করিতাম; মঠের অন্যান্য কায়িক সেবায় মনোযোগ দিতাম না। শ্রীপদ্মনাভ দাস ব্রহ্মচারী তৎকালে তথাকার মঠরক্ষক ছিলেন। তিনিও আমার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া আমাকে এইরূপ হরিনাম করিতে কোন বাধা দেন নাই কিম্বা অন্যান্য কায়িক সেবা করিতে বাধ্যও করেন নাই। কিন্তু অন্যসকলেই ভিক্ষা, অর্চন ও ভোগরন্ধন প্রভৃতি কায়িক শ্রম করিবার সময় আমি বসিয়া বসিয়া কেবল শ্রীহরিনাম করিতেছি, ইহাও আমার খুব ভাল লাগিত না। তাই এইরূপ কার্যের যুক্তিযুক্ততা জানিবার জন্য আমি পত্রের দ্বারা শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম। অবশ্য আমার পত্র দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যে, আমার শ্রীহরিনাম করিবার অধিকার হইয়াছে, ইহা তাঁহার দ্বারা সাব্যস্ত করাইয়া লইলে আমি অন্যান্য কায়িক সেবা না করিয়া কেবল শ্রীহরিনাম করিলেও আর কাহারও চক্ষুশূল হইব না। এই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহাকে পত্র দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমার ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা লিখিয়া আমাকে নিম্নলিখিত পত্র দিলেন—"তোমার পত্র পাইলাম। রজস্তমোগুণ-তাড়িত ব্যক্তির পশুবল কোন দিন ভগবৎসেবায় লাগিলে তাহার মঙ্গল হইবে।" কেবল এইটুকু লিখিয়া তিনি তাঁহার পত্রের পরিসমাপ্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার এই পত্র পাওয়া মাত্রই আমার অন্তরস্থিত অন্যাভিলাষে ভীষণ আঘাত লাগিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ভাবিলাম, "শ্রীল আচার্যদেব আমার প্রকৃত অধিকারের (উচ্চাধিকারের) কথা জানিতে না পারিয়া আমাকে হেয়জ্ঞান করিয়াছেন।" তিনি যে আমার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী ও অন্তর্যামী, অন্যাভিলাষরাক্ষসের কবলে পড়িয়া এই জ্ঞান আমার

একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। ফলে তাঁহার এই কৃপোপদেশ পালন করিতে পূর্ণপ্রাণে সম্মত হইতে পারিলাম না, অথচ তাঁহার উপদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিতেও সাহস হইল না। এই পরিস্থিতিতে পড়িয়া কি সিদ্ধান্ত লইব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তিন দিন এইরূপ ঘোর উদ্বেগের মধ্যে অনাহারে কাটিয়া গেল। তাহার পর আমার দয়নীয় অবস্থা জানিতে পারিয়া আমার প্রতি তাঁহার কৃপা হইল। তাঁহার কৃপায় আমি অনুভব করিতে পারিলাম—"তিনি আমার অন্তর্যামী। আমার অধিকার কি, আমা হইতে তাঁহার সে সম্বন্ধে যথেষ্ট বেশী জ্ঞান আছে। সুতরাং আমার অধিকার জানিয়া তিনি আমার প্রতি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা নতমস্তকে বরণ করিয়া লওয়াই আমার একমাত্র কর্তব্য। তাঁহার আদেশ পালন করিতে গিয়া যদি মৃত্যুও হইয়া যায়, তাহাও ভাল। অন্যথা এ অপরাধী শরীর থাকিয়াই বা লাভ কী?" এই অনুভূতির পর আমার অন্তরের সমস্ত অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা সমূলে বিদূরিত হইয়া গেল এবং সেই মুহূর্ত হইতেই তাঁহার কৃপোপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে সংকল্পবদ্ধ হইলাম।

ইহার পরেই আমাকে মাদ্রাজ-মঠে যাইতে পত্রে আদেশ আসিল এবং আমি তথায় পৌঁছাইবার ৩।৪ দিনের পর পূজনীয় শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থগোস্বামী মহারাজ এলাহাবাদ মঠ হইতে একাকী তথায় আসিয়া পৌঁছাইলেন। তাঁহার সেবায় কাহাকে নিযুক্ত করা যাইবে, তজ্জন্য বিচার হইল। সেসময় শ্রীব্রজসুন্দর দাসজী মাদ্রাজ মঠের মঠরক্ষক ছিলেন। তিনি আমার প্রতি খুবই স্নেহশীল ছিলেন। তাই শ্রীল মহারাজের সেবায় আমাকে নিযুক্ত করার জন্য আমি তাঁহাকে বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলাম। তখন আমার শরীর খুবই রুগ্ণ ছিল। এইরূপ রুগ্ণশরীরে আমি শ্রীল মহারাজের সেবার দায়িত্ব বহন করিতে অসমর্থ হইব বলিয়া আমাকে শ্রীব্রজসুন্দরজী বুঝাইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। যাহাই হউক, পরে আমি তাঁহাকে শ্রীল আচার্যদেবের পত্র দেখাইলে তিনি কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে শ্রীল মহারাজের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। অল্প কিছুদিনের পর আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেল এবং আমি মনের আনন্দে শ্রীল মহারাজের সেবায় লাগিয়া গেলাম। দেখিতে দেখিতে (১৯৪৫ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল। তাহার পর শ্রীল মহারাজ তথা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে চলিয়া যাওয়ায় আমি তাঁহার সেবা হইতে বঞ্চিত হইলাম। এই যে তিন বৎসর কাল শ্রীল মহারাজের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম, তাহা আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা সুখময় সময়। শ্রীল আচার্যদেবের অহৈতুকী কৃপায়ই যে আমি শ্রীল মহারাজের সেবার

সুযোগ পাইলাম, উহা মর্মে মর্মে অনুভব করিলাম। শ্রীল মহারাজের সেবা করার সময়ে শ্রীহরিনাম কীর্তনে তাঁহার অভূতপূর্ব আবেশ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তখন আমি অনুভব করিলাম যে, কায়দ্বারা মহতের পরিচর্যারূপা সেবা করিলেই চিত্ত হইতে রজস্তমোগুণ দূর হইয়া মহতের প্রসঙ্গরূপা সেবা অর্থাৎ তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণের যোগ্যতা লাভ হইবে। এই উদ্দেশ্যেই শ্রীল আচার্যদেব অহৈতুকী কৃপা করিয়া এ অধমকে মহৎসেবার সুযোগ দিয়াছেন। তাঁহার এই কৃপোপদেশ যে মাদৃশ স্বসুখকামী কর্মাধিকারীর প্রতি যথার্থ, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাঁহার এই উপদেশপালনে যদি অমনোযোগী হইতাম তবে বিপথগামী হইয়া ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হইতাম। কায়দ্বারা মহতের পরিচর্যা শুদ্ধভক্তিলাভের পরম সহায়ক। এই পরিচর্যার ফলে চিত্তবিক্ষেপ দূর হইয়া শ্রীহরিনামকীর্তনে আবেশ লাভ হইয়া থাকে। আবেশ ব্যতীত বিক্ষিপ্তচিত্তে শ্রীহরিনাম শ্রবণকীর্তন সুষ্ঠু হয় না। এই আবেশলাভের উদ্দেশ্যেই মহৎসেবার আবশ্যকতা আছে।

এসম্পর্কে শ্রীল জীবপাদ নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন -"তদেবং মহাভাগবত-প্রসঙ্গফলমুক্তম্। তৎপরিচর্যাফলমাহ, (শ্রীভা: ৩।৭।১৯) –

'যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ ॥'

যেষাং যুষ্মাকং মহাভাগবতানাং সেবয়া পরিচর্যয়া কূটস্থস্য নিত্যস্য ভগবতঃ পাদয়ো রতিরাসঃ প্রেমোৎসবো ভবেৎ। তীব্র ইতি বিশেষণং প্রসঙ্গমাত্রাৎ পরিচর্যায়াং বিশিষ্টং ফলং দ্যোতয়তি। আনুষঙ্গিকং ফলমাহ,– ব্যসনার্দন ইতি; ব্যসনং সংসারঃ; যত এবোক্তম্ (ভা: ১১।১৯।২১) 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' ইতি; মম পূজাতোঽপ্যভি সর্বতোভাবেনাধিকা অধিকমৎপ্রীতিকরীত্যর্থঃ।" (শ্রীভ: স: ২৪৪ অনু:)

অর্থাৎ এইরূপে মহাভাগবতগণের প্রসঙ্গ-ফল উক্ত হইল। এখন তাঁহাদের পরিচর্যার ফল বলা হইতেছে–"যাঁহাদের সেবা হেতু কূটস্থ (নিত্যস্বরূপ) ভগবান্ মধুসূদনের পাদযুগলে ব্যসন(সংসার)নাশক তীব্র রতিরাস উৎপন্ন হয়।"

'যাঁহাদের' অর্থাৎ আপনাদের ন্যায় মহাভাগবতগণের 'সেবা' অর্থাৎ পরিচর্যা হেতু 'কূটস্থ' নিত্যস্বরূপ ভগবানের পাদযুগলে 'রতিরাস' অর্থাৎ প্রেমোৎসব উৎপন্ন হয়। প্রেমোৎসবের বিশেষণ 'তীব্র' এই পদটির দ্বারা মহাভাগবতগণের কেবলমাত্র প্রসঙ্গ অপেক্ষা পরিচর্যার বিশিষ্ট ফল সূচিত হইতেছে। পরিচর্যার আনুষঙ্গিক ফল বলিতেছেন –'ব্যসননাশক'। 'ব্যসন' অর্থ এখানে সংসার। (সুতরাং পরিচর্যার বিশিষ্ট ফল প্রেমলাভ ও আনুষঙ্গিক ফল সংসারবিমুক্তি)।

শ্রীল জীবপাদের উপরোক্ত উক্তি হইতে জানা গেল যে মহতের প্রসঙ্গরূপা সেবা অপেক্ষা পরিচর্যারূপা সেবার ফল অধিক। অর্থাৎ প্রথমে পরিচর্যারূপা সেবার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানাবেশের সঞ্চার হয়। পরিচর্যাদ্বারা মহৎকে সন্তুষ্ট করিলে তিনি সেবকের হৃদয়ে স্বহৃদয়স্থিত ভগবৎসুখানুসন্ধানাবেশ সঞ্চারিত করিয়া দেন। ইহাই মহতের পরিচর্যার মহনীয় ফল। এই উদ্দেশ্যেই শ্রীল আচার্যদেব মাদৃশ নরাধমকে শাসন করিয়া মহৎসেবার সুযোগ দিয়াছিলেন।

তাহার পর আমি কটক মঠে আসিলাম। গৃহত্যাগের অনধিকারী জানিয়া শ্রীল আচার্যদেব আমাকে মিশন ত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পত্রদ্বারা কৃপাদেশ করিলেন। কিন্তু মঠত্যাগের বাসনা আমার না থাকায় তাঁহার পূর্ব পত্রের স্পষ্টীকরণের জন্য পুনর্বার তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম। তাহার উত্তরে তিনি প্রথম পত্রস্থিত তাঁহার আদেশ বিনা দ্বিধায় পালন করিতে জানাইলেন। তাঁহার কৃপানির্দেশানুসারে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মিশন ত্যাগ করিলাম ও ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শ্রীল রায়রামানন্দ প্রভুর তিরোভাব তিথিতে বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলাম। বিবাহ করিবার অব্যবহিত পরে লজ্জিত হইয়া আমার বিবাহসংবাদ শ্রীল আচার্যদেবকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছিলাম। তাহার উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, "তুমি কোন পাপ কর নাই, যেজন্য তোমাকে লজ্জিত হইতে হইবে। সংসারে প্রবেশ করিবার একমাত্র লক্ষ্য স্বভাববিহিত পন্থায় কর্মার্পণ করিয়া তাহা হইতে পুনঃ উত্তীর্ণ হওয়া, কেবল প্রবৃত্তিমার্গে কর্ম করিয়া সংসারবন্ধনকে দৃঢ় করা নহে। মহতের সঙ্গ এবং তাঁহার অহৈতুকী কৃপাই এই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায়। সুতরাং সেই মহতের সঙ্গ ও কৃপালাভ উদ্দেশ্যেই কর্মার্পণ করা উচিত।" তাঁহার উপরোক্ত পত্র হইতে গৃহস্থাশ্রম স্বীকারের জন্য তাঁহার উপদেশের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি, তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। প্রবৃত্তিপরায়ণ হইয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-উদ্দেশ্যে কর্ম করিয়া সংসারবন্ধন দৃঢ় করার পরিবর্তে মহতের সঙ্গ ও কৃপালাভের উদ্দেশ্যে কর্মার্পণ করিয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য তিনি মাদৃশ কর্মাধিকারীকে গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিতে উপদেশ দিলেন।

তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় আমার গৃহস্থাশ্রম সর্বতোভাবে ভজনের অনুকূল হইলেও নিজের অযোগ্যতা হেতু আমার ভজনে অগ্রগতি না হইয়া বিষয়াসক্তিই বাড়িয়া যাইতেছে। তথাপি তিনি পরম করুণাময়। তিনি তাঁহার কোন কোন

নিষ্কপট সেবককে বলিয়াছেন—"তুমি বাড়ী গেলে আমার সেবা হইতে বঞ্চিত হইবে ভাবিয়া দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। তুমি সদুপায়ে যতটুকু অর্থ উপার্জন করিবে, তাহাতে শাকান্ন যাহা অনায়াসে পাওয়া যায় তদ্দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহপূর্বক প্রাণিমাত্রে কাহারও নিন্দা না করিয়া 'হা গৌরনিতাই' বলিয়া সর্বক্ষণ ক্রন্দন কর।

'ভজ গৌরাঙ্গ, স্মর গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই ত আমার প্রাণ রে ॥'

যে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে, সে যেখানেই থাকুক না কেন, আমি তাহাকে ছাড়িতে পারিব না। সে আমাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, তাহাতে কিছুই যায় আসে না, আমি কিন্তু তাহাকে ছাড়িতে পারিব না।"

নিতান্ত অযোগ্য হইলেও মাদৃশ কর্মফল-আত্মসাৎকারী ঘোর বিষয়ীর প্রতি তাঁহার এই কৃপাসিক্ত বাণীর উপরে আস্থা রাখিয়া আমি পড়িয়া রহিয়াছি। কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল তাঁহার সেই অহৈতুকী কৃপালাভের আশাবন্ধ লইয়া যেন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারি, কৃপাময় বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে এই কাতর প্রার্থনা।

অনেক সময় প্রশ্ন জাগে যে, শ্রীল আচার্যদেবের ন্যায় একজন মহতের সঙ্গে মাদৃশ জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধী, মহাপাষণ্ডী, পতিতান্ধ জীবের যোগাযোগ হইল কিরূপে? নিজের কি কোন চেষ্টা এই যোগাযোগের সহায়ক? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অনাদিবহির্মুখ স্বসুখবাসনায় নিবিষ্টচিত্ত মাদৃশ পতিত জীবহৃদয়ে এইরূপ অমলাশয় মহতের পাদাশ্রয় করিবার অভিলাষ কদাপি জাগিতে পারে না। ইহার একমাত্র কারণ করুণাময় বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীগ্রামেশ্বরের অহৈতুকী কৃপা। কাহারও নিকট হইতে শ্রীগুরুদেবের সন্ধান না পাইলেও এ অধম সেই আশুতোষ শ্রীগ্রামেশ্বরের অনুগ্রহে পরমকরুণাময় শ্রীগুরুদেবের কৃপারজ্জুদ্বারা আকর্ষিত হইয়া আপনা হইতেই উৎকণ্ঠাভরা হৃদয়ে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সন্নিধানে পৌঁছাইয়াছে। শ্রীগ্রামেশ্বরের কৃপা ব্যতীত এই অপূর্ব যোগাযোগ কখনও সম্ভব হইত না। তাই এ অধম অনুভব করিয়াছে যে, যে মহৎ ব্যক্তির সন্ধান শ্রীগ্রামেশ্বর তাহাকে দিয়াছেন, তিনি প্রাকৃত মনুষ্যমাত্র নহেন, তিনি অবশ্যই শ্রীহ্লাদিনীশক্তির দূত। পৃথিবীর কোন শক্তি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হইতে তাহাকে চ্যুত করিতে পারিবে না। যে যোগাযোগ শ্রীভগবানের বা মহতের কৃপায় হইয়া থাকে, তাহাই যথার্থ।

এ কথা সত্য যে এ অধম নিতান্ত অযোগ্য ও সহস্র সহস্র দোষে দোষী। তথাপি তাহার ভাগ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপী যে মহতের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তিনি অদোষদর্শী। শুক্তিকার আধারে অম্বুধির নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দেওয়ার মত তিনি কৃপাম্বুধি হইয়া শুক্তিকার ন্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এ দীনহীনকে নিজের সর্বস্ব বিতরণ করিয়া দেওয়ার জন্য সতত ব্যগ্র। এমন আশ্রিতবৎসল শ্রীগুরুদেবকে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভাষায় 'হীনার্থাধিকসাধক' বলিয়া বাক্য নিবৃত্ত হইতেছে। কারণ ইহার পর তাঁহার গুণ বর্ণনা করিবার আর ভাষা নাই। অতএব তাঁহার কৃপালাভের আশায় তাঁহার প্রদত্ত শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিয়া পড়িয়া রহিলেই শত অযোগ্যতা থাকিলেও তিনি নিজের অহৈতুকী কৃপাদ্বারা এই দীনকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট করিবেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার আশ্রিতগণের সমস্ত দোষত্রুটিকে তথা তাঁহার কীর্তিত বাণী হৃদয়ঙ্গম করিবার অযোগ্যতাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াও তাহাদের নিকট শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর উপদিষ্ট রাগমার্গীয় ভক্তিকথা অনুক্ষণ কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, সকলেই এই অপূর্ব সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া শুদ্ধভক্তিরসার্ণবে অবগাহন করুক এবং তাঁহার হৃদয়দেবতা শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রতি অহৈতুকী প্রীতিতে নিবিষ্ট হউক।

নিতান্ত অনর্থগ্রস্ত সর্ব্বনিম্ন প্রাকৃত ভূমিকা হইতেও ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণের দ্বারা ক্রমপন্থায় অগ্রসর হইয়া মহৎকৃপায় সকলেই যাহাতে রাগমার্গীয় ভক্তির অধিকার লাভ করেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে জলাঞ্জলি দিয়া, প্রতিষ্ঠার মস্তকে পদাঘাত করিয়া ও কল্পনাতীত কায়ক্লেশ স্বীকার করিয়া অনুক্ষণ সকলকেই ইষ্টদেবের প্রতি প্রীতিযুক্ত করাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার এই উপদেশ কেহ গ্রহণ করিতে পারিল না বলিয়া তিনি ব্যথিত হইয়া কত যে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই।

সাধারণতঃ শিষ্য শ্রীগুরুকৃপালাভের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া থাকে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাহার দৃষ্টান্ত। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে তাঁহার কিরূপে যোগাযোগ হইবে, তজ্জন্য তিনি বুকফাটা ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তাঁহার আর্তিতে শ্রীগৌরহরি ধৈর্য ধরিতে না পারিয়া শ্রীলোকনাথ গোস্বামী যে অনতিবিলম্বে তাঁহাকে শিষ্যরূপে অঙ্গীকার করিবেন, ইহা স্বপ্নযোগে জানাইলেন। কিন্তু শ্রীল

আচার্যদেবের আচরণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। শিষ্যগণ তাঁহার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না বলিয়া তিনি যেরূপ ব্যথিত হইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছিলেন, তাহার সমান্তরাল উদাহরণ নাই।

তাঁহার এই আচরণ স্পষ্টই জানাইয়া দিতেছে যে, তিনি সাধারণ মানব ছিলেন না। তিনি ছিলেন—হ্লাদিনীশক্তির অন্তরঙ্গতম দূত। পতিতান্ধ কলিহত জীবকে ষট্সন্দর্ভে পরিবেষিত শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তরস পান করাইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তিনি এ জগতে আসিয়া ছিলেন।

এই গ্রন্থে তাঁহার অনন্যসাধারণ আচরণ ও শিক্ষার কথাই বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি ভক্তিসাধকগণের উদ্দেশ্যে যেসব উপদেশ দিয়াছেন এবং যেসব আচরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এ যুগে বিরল। তাঁহার উপদেশ ও আদর্শের অনুসরণে যে ব্রতী হইবে, সে যে নিশ্চিতভাবে ভজনপথে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া নিজে উপলব্ধি করিতে পারিবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়া ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকট লীলা সংগোপন করিয়াছিলেন। আপাততঃ তিনি লোকচক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইলেও আশ্রিতগণের প্রতি তাঁহার করুণাবারি এখনও বর্ষিত হইতেছে। তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"মহৎ অপ্রকট হইয়া গেলেও তাঁহার বাণী অপ্রকট হয় না। যে তাঁহার বাণীর অনুশীলন করিবে, সে অবশ্যই তাঁহার (অপ্রকট মহতের) কৃপাভাজন হইতে পারিবে।" তাঁহার এই কৃপাসিক্ত বাণী অনুসরণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইতে পারিলে এই জন্মেই যে প্রেমলাভ হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীগুরুদেবের মাহাত্ম্য সম্পর্কে শ্রীল শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—

"তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেত্ততো ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৃণাং ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টৃণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্যাৎ। তৎপ্রসাদো হি স্ব-স্ব-নানাপ্রতীকারদুস্ত্যজানর্থহানৌ পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্। (শ্রীভা: ৭।১৫।২২-২৫)—

অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ॥
আন্বীক্ষিক্যা শোক-মোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া॥

কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া ॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥

উত্তরত্র বামনকল্পে ব্রহ্মবাক্যম্—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাদ্ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্ ॥

অন্যত্র—

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥

* * *

জ্ঞানপ্রদাদ্গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তীত্যুক্তম্। অতএব তদ্ভজনাদধিকো ধর্মশ্চ নাস্তীত্যাহ,—নাহমিতি।" (শ্রীভ: স: ২৩৭ অনু:)

তথাপি বৈশিষ্ট্যকামী ব্যক্তি সমর্থ হইলে ভগবৎশাস্ত্রোপদেষ্টা বা ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টা শ্রীগুরুদেবের নিত্য সেবা বিশেষভাবে করিবেন। কারণ নিজের নানাবিধ প্রতিকার সত্ত্বেও যেসব অনর্থ দূর করা কঠিন, তাহার ক্ষয়সাধন এবং ভগবানের পরম অনুগ্রহলাভ বিষয়ে শ্রীগুরুকৃপাই মূল।

সংকল্প-পরিত্যাগের দ্বারা কামকে, কামবর্জনের দ্বারা ক্রোধকে, অর্থ-অনর্থ বিচারদ্বারা লোভকে, তত্ত্ববিচারের দ্বারা ভয়কে, আত্মা-অনাত্মার ভেদবিচারের দ্বারা শোক ও মোহকে এবং মহৎসেবার দ্বারা দম্ভকে জয় করিবে। এইরূপ মৌনের দ্বারা যোগের বিঘ্নসমূহকে, কামাদি চেষ্টা-পরিত্যাগের দ্বারা হিংসাকে, কৃপা অর্থাৎ হিতাচরণদ্বারা ভূতজ (প্রাণিজাত) দুঃখকে, সমাধিদ্বারা দৈবদুঃখকে, যোগের প্রভাবদ্বারা দেহজাত ও মনোজাত পীড়াকে, সাত্ত্বিক আহারাদির দ্বারা নিদ্রাকে, সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণকে এবং উপশম(ইন্দ্রিয়নিগ্রহ)দ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। কিন্তু কেবল গুরুভক্তির দ্বারাই পুরুষ এইসকলকে অনায়াসে জয় করিতে পারিবে। অতঃপর মন্ত্রোপদেশক শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ সম্বন্ধে বামনকল্পে শ্রীব্রহ্মার বাক্য—

'যিনি মন্ত্র তিনিই সাক্ষাৎ গুরু, আর যিনি গুরু তিনিই সাক্ষাৎ শ্রীহরি। শ্রীগুরুদেব যাহার প্রতি সন্তুষ্ট, স্বয়ং শ্রীহরিও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।'

অন্যত্র বলা হইয়াছে—

'শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব রক্ষা করেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব সর্ববিধ প্রযত্নদ্বারা শ্রীগুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে।'

*   *   *   *

জ্ঞানদাতা গুরু হইতে অধিক সেবাযোগ্য কেহই নাই—ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অতএব তাঁহার ভজন অপেক্ষা অধিক ধর্মও কিছুই নাই বলিয়া উক্ত হইয়াছে 'নাহমিতি'।

শ্রীল জীবপাদের উপরোক্ত উপদেশ বিশ্লেষণ করিলে জানা যায় যে দেহযাত্রানির্বাহ হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্ত্যঙ্গযাজন পর্য্যন্ত যাবতীয় কার্যে সর্বতোমুখী চেষ্টাদ্বারা একমাত্র শ্রীগুরুদেবের সন্তোষবিধান যাহার লক্ষ্য হইবে তাহার পক্ষে ভক্তিলাভ সুনিশ্চিত। কারণ শ্রীগুরুদেবের ভজন অর্থাৎ সন্তোষবিধান ব্যতীত অন্য কোন উৎকৃষ্ট সাধন নাই।

হে হীনার্থাধিকসাধক শ্রীগুরুদেব! তুমি এ অযোগ্য জীবকীটের সহস্র সহস্র দোষক্রটির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দিস্নেহসিক্ত হইয়া তাহাকে ভক্তিরসামৃত পান করাইতে সতত ব্যগ্র। তোমার এই অসামান্য বাৎসল্য সর্বদা এ অধমের স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিয়া তাহাকে তোমার কৃপালাভের জন্য আর্তিযুক্ত করুক, তোমার এই গুণ স্মরণপূর্বক তোমার কৃপালাভের আশাবন্ধ লইয়া সে ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে করিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করুক—তোমার শ্রীচরণে এ দীনাতিদীনের এই সাশ্রু নিবেদন।

মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সন্তোষবিধানার্থে ও তাঁহার অহৈতুকী কৃপাপ্রাপ্তি উদ্দেশ্যে তাঁহার নিজজন মদীয় অভীষ্টদেব শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের চরিতের কিয়দংশ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সুধী পাঠকবৃন্দ ইহা পাঠ করিয়া তাঁহার অসাধারণ গুণবিষয়ে তথা যোগ্যাযোগ্যনির্বিশেষে সকলকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে মজ্জন ও অবগাহন করাইবার সুদৃঢ় সংকল্পবিষয়ে অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত হউন, ইহাই তাঁহাদের চরণে এ অধমের সকাকু প্রার্থনা।

এই গ্রন্থে তাঁহার প্রবর্তিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসমূহের ও তাঁহার অনন্যসাধারণ আচরণের কথাই বিশেষভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীল জীবপাদের অনুসরণে এইসব বিপ্লবাত্মক ভক্তি-সিদ্ধান্তের প্রবর্তন এবং ইহা সকলের বোধগম্য করাইবার জন্য তদনুরূপ আচরণ তাঁহার আচার্যত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। রজস্তমোগুণাক্রান্ত অন্যাভিলাষিগণের প্রবল প্রতিরোধ ও বহুবাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সিংহশাবকের ন্যায়

নির্ভীকভাবে এইসব সিদ্ধান্তের প্রবর্তন ও প্রচলনকে তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অত্যল্প বয়সে তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদাশ্রয়ী হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি তাঁহার নিরপেক্ষ অসাধারণ আচরণের দ্বারা কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার এতাদৃশ আচরণের দ্বারা তিনি যে একজন সাধারণ ব্যক্তি নহেন, ইহা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ অন্যসকলকে শিক্ষা দেওয়ার সময় তাঁহার আচরণকেই দৃষ্টান্তস্বরূপ রাখিতেন। তিনি কখনও তাঁহার কোনও আচরণে দোষ দেখিতে পান নাই এবং তিনি তাঁহাকে শিষ্যরূপে পাইয়া খুব উল্লসিতই হইয়াছিলেন। কারণ উপযুক্ত গুরু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত শিষ্য পাওয়া দুর্লভ।

শ্রীল জীবপাদের ষট্‌সন্দর্ভ ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উল্লেখ করিয়া তিনি দেখাইয়াছিলেন যে প্রাকৃত ভূমিকায় অনুষ্ঠিত ভক্ত্যঙ্গ শুদ্ধভক্তি নহে, উহা স্বরূপতঃ কর্ম্মই। ইহাতে কেবল ভক্তির আকার থাকায় ইহা কর্ম্মমিশ্রভক্তিপদবাচ্য। ইহা নিজের ঐহিক বা পারলৌকিক সুখলাভের কিম্বা অনর্থনিবৃত্তির (মুক্তিলাভের) উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হইয়া কেবল শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলেই রজস্তমোগুণ দূর হইয়া মহৎকৃপায় শুদ্ধভক্তিসাধনের যোগ্যতা লাভ হয়। এই সিদ্ধান্ত সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য তিনি যে কতভাবে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত।

তাঁহার যে সতীর্থগণ ভোগাভিনিবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠাকামী ছিলেন, তাহারা তাঁহার উপরোক্ত সিদ্ধান্তের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অন্যাভিলাষিতাযুক্তা ভক্তির কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রতিই অনুরক্ত রহিলেন। অন্তরে বাসনা যাহাই থাকুক না কেন, কেবল ভক্তির বাহ্য অনুষ্ঠানই শুদ্ধভক্তি,—এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহারা অন্তরের বাসনা অপেক্ষা ভক্ত্যনুষ্ঠানের কেবল বাহ্য আড়ম্বরকেই অধিক গুরুত্ব দিয়াছিলেন। তাই তাহারা তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্তের ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত-মাধ্যমে ভক্তির অনুষ্ঠান অপেক্ষা উদ্দেশ্যেরই যে গুরুত্ব অধিক, ইহা তাহাদিগকে বুঝাইতে বহু চেষ্টা করিয়াও বিফল হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি গভীর মনোবেদনা লইয়া উক্ত অন্যাভিলাষিগণের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি মিশনের আচার্যত্ব পরিত্যাগপূর্বক শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া নিবিষ্টচিত্তে ভজন করিলেন। যাহারা তাঁহার এই আদর্শ ও উপদেশানুসারে মিশন ত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে বা অন্যত্র থাকিয়া ভজন করিলেন, তাহাদিগকে তিনি স্বীয় উপদেশদ্বারা ভজনে অগ্রগতি করিবার প্রেরণা দিয়াছিলেন।

তিনি মিশনের আচার্যত্ব ত্যাগ করিলেন সত্য, কিন্তু এত লোক হরিভজনের উদ্দেশ্যে আসিয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ শুদ্ধভক্তি-সম্পর্কীয় তাঁহার উপদিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিল না জানিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, অপ্রকটের সময়েও সকলের কথা চিন্তা করিয়াই তিনি যে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার নিম্ন আচরণ হইতে তাহা স্পষ্ট জানা যায়। অপ্রকটলীলাবিষ্কারের অব্যবহিত পূর্বে তিনি বলিলেন, "সকলের সঙ্গে ত' আর দেখা হইবার সুযোগ হইবে না। সকলকে বলিয়া দিবেন **'শ্রীশ্রীনিতাইগৌরসীতানাথ'** ও **'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশচীসুতগৌরগুণধাম'** এই নাম চোখের জলে বুক ভাসাইয়া সর্বদা কীর্তন করিবেন; তাহা হইলে নিশ্চিতরূপে সকলেই শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপালাভ করিতে পারিবেন।" এই বলিয়াই তিনি তাঁহার প্রকটলীলা সাঙ্গ করিলেন। ইহা তাঁহার অনুগতবাৎসল্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন নহে কী ?

শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে অপূর্ব পারদর্শিতা ও অখণ্ড ইষ্টসুখানুসন্ধানাবেশের দ্বারা তাঁহার নিত্যসিদ্ধ আচার্যত্ব স্বতঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহা মহা পণ্ডিতগণও তাঁহার সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না।

"নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম না যায় রক্ষণে।" (শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ৩।২২) — শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তিকে তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া প্রতি ক্ষেত্রে সর্বদা নিরপেক্ষ থাকিতেন এবং তাঁহার অনুগত সকলকে নিরপেক্ষ থাকিতে শিক্ষা দিতেন। ভুলক্রমেও তিনি একদিনও কোন বিষয়ীর দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই এবং অন্যসকলকেও তাহা গ্রহণ না করিতে কড়া নির্দেশ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তিনি বিষয়ীর সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে ভজন করিবার আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

সাধনে অধিকারবিচার যে বিশেষ আবশ্যক তাহা তিনি বারংবার বলিয়াছেন এবং প্রত্যেক সাধকের অধিকার বিচার করিয়া তদুচিত সাধনে তাহাকে প্রবৃত্ত করাইতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টাও করিয়াছেন। অধিকার বিচার না করিয়া অনধিকারী প্রবৃত্তিমার্গী ব্যক্তিকে ত্যক্তাশ্রমিরূপে সাজাইয়া ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত করাইবার চেষ্টাদ্বারা যে জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি হইয়া সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হইতেছে, ইহা অনস্বীকার্য। এইরূপ কার্যের ফলে রজস্তমোগুণাক্রান্ত অহংকারী জীব নিজচেষ্টায় ভক্তি করিতেছে বলিয়া মনে করিলেও তাহার তাদৃশী ভক্তি রাজসী ও তামসীরূপ সগুণা ভক্তিতেই পর্যবসিত হয়। তাহার হৃদয়ে ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকায় ত্যক্তাশ্রমীর প্রতিষ্ঠা

ক্ষুন্ন হইবার ভয়ে সে প্রকাশ্যে ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার পরিবর্তে গোপনেই করিয়া থাকে। এইরূপে সে 'মিথ্যাচারী' বা 'কপটাচারী' হইয়া পড়ে। তাহার এইরূপ পাপাচরণ বেশী দিন গোপনে থাকিতে পারে না। যখন উহা প্রকাশ পাইয়া যায় তখন সে তাহাকে লুকাইবার চেষ্টা করিয়া তৎসহিত আরও অনেক অবাঞ্ছিত পাপকর্ম করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ পাপকার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে তাহার চিত্ত কঠিন হইয়া যায় ও ভক্তির প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। তাহার পাপ ক্রমশঃ অপরাধের দিকে গতি করে এবং অপরাধের ফলে তাহার পতন হয়। সাধুবেশ-গ্রহণ সত্ত্বেও তাহার পাপাচরণ দেখিয়া লোকের তাহার প্রতি ঘৃণা জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধুসমাজের প্রতিও ক্রমশঃ এই ঘৃণাভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এবংবিধ অকালভেকধারিগণের দোষেই সমাজের অজ্ঞ ব্যক্তিগণ অপরাধফলভাগী হইয়া থাকে। তজ্জন্য শ্রীল আচার্যদেব অপক্ক গৃহত্যাগিগণকে জগজ্জঞ্জালের কারণ বলিয়া অভিহিত করিয়া এইরূপ কার্যের তীব্র বিরোধ করিয়াছেন এবং প্রবৃত্তিমার্গী সাধক যাহাতে কর্মার্পণ করিয়া ক্রমপন্থায় চলিতে পারে তদনুরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

তিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তের দ্বারা অকালভেকের অবৈধতা প্রতিপাদন করিয়া কোন্ অধিকারে লোক গৃহত্যাগের যোগ্য বিবেচিত হইবে, তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন ও অনধিকারী হইয়াও যাহারা অবস্থাচক্রে পড়িয়া অজ্ঞতাবশতঃ গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে পুনশ্চ গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বহুদিন সাধুবেশ ধারণ করিয়া পুনরায় গৃহস্থ হইলে প্রতিষ্ঠা ক্ষুন্ন হইবে, এই আশঙ্কায় অনেকে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না; কিন্তু যাহারা তাঁহার উক্ত উপদেশকে নিজের অধিকারোচিত বলিয়া উপলব্ধি করিলেন, তাহারা তাঁহার আদেশানুসারে গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিয়া ক্রমপন্থায় চলিলেন এবং বৈষ্ণবপ্রায় না হইয়া বিষয়ীপ্রায় হইলেন।

তাঁহার আচার্যত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল প্রতিষ্ঠার মস্তকে পদাঘাত। তিনি আচার্য হইবার অব্যবহিত পর হইতেই প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেওয়ার, নিজের কোন ফটো তোলার কিম্বা খবরকাগজে নিজের নাম প্রকাশ করিবার প্রতি সর্বতোভাবে বিতৃষ্ণ থাকিতেন এবং ভক্তিসাধনের প্রধান প্রতিবন্ধক প্রতিষ্ঠাকামনা হইতে বহু দূরে থাকিতে সকলকে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "যেদিন খবরকাগজের প্রতিপৃষ্ঠায় আমার নিন্দা প্রকাশিত হইবে, সেদিন জানিব সত্য সত্যই শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ আমাকে কৃপা করিয়াছেন।"

তাঁহার উপদেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, তিনি ভক্তি-অনুষ্ঠানের উপরে গুরুত্ব না দিয়া **'ভক্তিবাসনা'**র উপরেই গুরুত্ব দিতেন। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত—সকলে ভক্তিকেই স্ব স্ব সাধনের অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সকলের ভক্তিসাধন সকলকে সমান ফল দেয় না। তাহাদের বাসনাভেদেই ফলভেদ হইয়া থাকে। শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ভক্তির যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহা সাধকের বাসনাকে ভিত্তি করিয়াই করা হইয়াছে। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২২৪তম অনুচ্ছেদে তিনি লিখিয়াছেন,—"অত্র নিমিত্তানি চ ত্রীণি—কামনা, নৈষ্কর্ম্যম্, ভক্তিমাত্রঞ্চেতি। নিষ্কামত্বস্তু কেবলং ন সম্ভবতি,—'যদ্ যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্' ইত্যুক্তেঃ। অত্র চ কামনানৈষ্কর্ম্যয়োঃ প্রায়ঃ কর্মত্যাগঃ, প্রীণনন্তু তদাভাস এব, স্বার্থপরত্বাৎ। ভক্তৌ পুনঃ প্রীণনমেব ভক্তেস্তদেকজীবনত্বাৎ।"

অর্থাৎ এই কর্মার্পণের তিনপ্রকার উদ্দেশ্য দেখা যায়, যথা—কামনা, নৈষ্কর্ম্য ও কেবল ভক্তিমাত্র। 'জীব যে যে কার্য করে সেসমস্ত তাহার কামনামূলক চেষ্টা মাত্র'—এই ন্যায়ানুসারে কেবল নিষ্কামত্ব কোন কর্মে সম্ভবপর হয় না। কামনা ও নৈষ্কর্ম্য—এই উভয়ের সম্বন্ধযুক্ত কর্মার্পণে স্বার্থপরতা থাকে বলিয়া কেবল ত্যাগেরই প্রাধান্য, ভগবৎপ্রীণন (শ্রীভগবানের সুখচিন্তা) আভাসমাত্র। আর ভক্তিমূলক কর্মার্পণে ভগবৎপ্রীণনই প্রধান লক্ষ্য। কারণ **ভগবৎপ্রীণনই ভক্তির একমাত্র জীবনস্বরূপ**।

শ্রীল জীবপাদের এই সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়া শ্রীল আচার্যদেব ভক্তির বাহ্য অনুষ্ঠানের উপর কোন গুরুত্ব না দিয়া বাসনার উপরেই গুরুত্ব দিয়াছেন। এই বাসনার মধ্যে শ্রীভগবানকে সুখী করিবার বাসনা বা 'ভক্তিবাসনা'রই প্রাধান্য আছে বলিয়া শ্রীল জীবপাদের উক্তি হইতে জানা যায়। এই হেতু তিনি সাধকের ভক্তিবাসনার উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কারণ ভক্তিবাসনাই ভক্তির প্রাণ। ভক্তিবাসনাহীন ভক্ত্যনুষ্ঠানকে তিনি কখনও উৎসাহিত করেন নাই; বরং ইহা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সমান বলিয়া ইহা হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। যেস্থলে ভক্তিবাসনা ভক্ত্যনুষ্ঠানের প্রেরয়িত্রী সেস্থলে অনুষ্ঠিত ভক্তি শুদ্ধভক্তিপদবাচ্য এবং তাহা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। সুতরাং সকলের হৃদয়ে এই ভক্তিবাসনার সৃষ্টিই তাঁহার সমস্ত আচরণ এবং উপদেশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

এইরূপ আচরণ ও বিভিন্নশাস্ত্র হইতে সৎসিদ্ধান্ত উপস্থাপনপূর্বক শুদ্ধভক্তি-সম্পর্কে জগদ্বাসিগণের ভ্রান্ত ধারণার উপরে কুঠারাঘাত করিয়া তিনি একপ্রকার ধর্মবিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি যথার্থ শুদ্ধভক্তিপিপাসু, তিনি তাঁহার কৃপায়

বলীয়ান্ হইয়া এই বিপ্লবের সৈনিকরূপে আত্মরক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিবিরুদ্ধ মতবাদিগণের যাবতীয় অপচেষ্টাকে সমাজ হইতে মূলোৎপাটন করিতে সতত যত্নবান্ হইবেন।

এ কথা সত্য যে, তাঁহার ন্যায় তত্ত্ববেত্তা মহৎ এ জগতে বিরল। সৌভাগ্যবশতঃ যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে ব্যাকুল প্রার্থনা করুন। তাহা হইলে পরমকরুণ প্রভুদ্বয় তাঁহাদের নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া তাঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত করাইবেন। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে ভজন করিলে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্যসেবা লাভ হইতে পারিবে। এই পন্থা অবলম্বন না করিয়া যাহারা নিজ প্রাকৃত বুদ্ধিবলে শ্রীগুরুদেবকে চিনিবার চেষ্টা করিবেন, তাহারা তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হইবেন।

হে সুধী পাঠকবৃন্দ! আপনারা বিরলব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মহাপুরুষের চরিত, তাঁহার অনন্যসাধারণ আচরণ ও শিক্ষার বিষয় এই গ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হউন এবং সর্বথা অযোগ্য, জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত দুরন্ত অপরাধে জর্জরিত ও কর্মফল-আত্মসাৎকারী এ নির্ঘৃণের মস্তকে চরণ স্থাপনপূর্বক কৃপাশীর্বাদ করুন যেন এ অধম নিজবুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবকে চিনিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার লালসায় সতত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে সক্রন্দন প্রার্থনা জানাইতে পারে।

বঙ্গভাষায় পারদর্শিতার অভাবে নির্ভুল মুদ্রণের জন্য বহু যত্ন সত্ত্বেও এই গ্রন্থ মুদ্রাকরপ্রমাদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। সুতরাং কোন স্থানে ভুল থাকিলে সংশোধনপূর্বক পাঠ করিতে একান্ত অনুরোধ। মুদ্রণগত বা সিদ্ধান্তগত কোন গুরুতর ত্রুটি থাকিলে কৃপাপূর্বক এই বিনীত লেখককে জানাইলে কৃতার্থ হইব। বহু শ্রম স্বীকারপূর্বক মদীয় গুরুভ্রাতা শ্রীসদনুগ্রহ দাসজী উৎকল ভাষায় লিখিত মূল রচনা হইতে বঙ্গভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঙ্গাধর ষড়ঙ্গী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক ইহার প্রুফ সংশোধন করিয়াছেন। তজ্জন্য এ বিনীত লেখক তাঁহাদের উভয়ের নিকট চিরঋণী।

কৃপাভিক্ষু

শ্রীদিবাকর মিশ্র

কৃপাভিক্ষা

বিপ্রলম্ভ-রসাবিষ্ট ওহে গুরুদেব!
বহুভাগ্যে লভিয়াছি সন্ধান যে তব ॥১
ইষ্টপ্রীতিবাঞ্ছারূপ ভক্তিবীজসার।
বিতরণে এ মরতে তব অবতার ॥২
অবতরি অযাচিতে কৈলে ইহা দান।
ঊষরক্ষেত্র মো হৃদি নহে যোগ্য স্থান ॥৩
আমি ত অভাগা মত্ত বিষয়সন্ধানে।
না জন্মিল প্রীতিলেশ তব শ্রীচরণে ॥৪
অপরাধে বজ্র হৈতে কঠিন হৃদয়।
তব কৃপা আশে আর্তি না জাগিল হায় ॥৫
স্বভাবকরুণাসিন্ধু তুমি ত নিশ্চিত।
কৃপাবাঞ্ছা নাহি মোর তাই যে বঞ্চিত ॥৬
তোমা' বিনা কা'র আমি লইব শরণ।
মো হৃদিদেবতা তুমি পতিততারণ ॥৭
ধন্য প্রভু তুমি ত না ছাড় নিজজন।
এ বিমুখে শ্রীচরণে কর আকর্ষণ ॥৮
তোমা' বিনা কেবা আর আছে দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন্ হয় ॥৯
হৃদি ভরি যে ডাকিবে হা গৌর-নিতাই।
প্রতিজ্ঞা তোমার তারে উদ্ধারিবি তুই ॥১০
বালবৎ অজ্ঞ মুই প্রেয় মোর ধ্যান।
তুমি কর কৃষ্ণপ্রীতি-সুধারস দান ॥১১
কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দি-স্নেহ বহি।
অপরাধক্লেদ মোর দূর করি' তুই ॥১২

সুমেরুসমান ভক্তিরত্ন কৈলে দান।
হৃদয়-আধার মোর সর্ষপসমান ॥১৩
ব্যর্থ তোর কৃপা জানি ব্যথিত অন্তর।
দেখি মো অভাগ্য বরষিলে অশ্রুধার ॥১৪
কি দিয়া পূজিব তোর চরণকমল।
অশ্রুমুক্তামালা মোর নাহি ত সম্বল ॥১৫
শ্যামবিরহিণী-শ্যামাভাবে বিভাবিত।
শ্রীগৌরস্বরূপতত্ত্ব তুমি কৈলে ব্যক্ত ॥১৬
তাঁ'র প্রদর্শিত ভক্তি বিরহের পথ।
সর্ব জীবে দিলে শিক্ষা আচরি সতত ॥১৭
নিঃসঙ্গে ভ্রমিয়া ব্রজবনেতে অজ্ঞাতে।
বিরহে জ্বলিয়া ভক্তি সাধিলে একান্তে ॥১৮
শ্রীগৌরকৃপায় তব মহিমার জ্ঞান।
মো উষর হৃদে স্ফূর্তি হউক অবিরাম ॥১৯
তব আদরশ সদা হউ মো সম্বল।
তব কৃপা আশে সদা ঝরু নেত্রে জল ॥২০
অন্ধ অনভীপ্সু মুইঁ বিমুখ পামর।
কৃপা বরণের যোগ্য কর একবার ॥২১
তোমার কৃপামহিমা দেহ হৃদে ভরি'।
যায় যেন এ জীবন তব গুণ স্মরি' ॥২২
তব কৃপা হেতু তব তত্ত্বজ্ঞানোদয়।
সেই কৃপা সদা মোর হউক সহায় ॥২৩
তব কৃপা বিনা যত ভজন-সাধন।
সব বৃথা, কেবল সে বন্ধন-কারণ ॥২৪
নহে হৃদি বিগলিত নাহি নেত্রে লোর।
কৃপাদৃষ্টি আকর্ষিব কেমনে তোমার ॥২৫
হা হা গুরুদেব! কৃপা করি নিজগুণে।
পাদপদ্মে দেহ স্থান এই নরাধমে ॥২৬

বিষয়সূচী

প্রকরণ		পৃষ্ঠাঙ্ক
আবির্ভাবের কারণ	...	১
পূর্ব পরিচয়	...	১
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত সাক্ষাৎকার	...	৩
গৃহত্যাগ	...	৪
অতি অল্প বয়স হইতেই অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান	...	৪
নিরপেক্ষতা	...	৫
আচার্যরূপে শ্রীঅনন্তবাসুদেব	...	৬
সন্ন্যাসগ্রহণ	...	৬
আভ্যন্তরীণ সংস্কার	...	৬
প্রচারকের স্বরূপনির্ণয়	...	৭
শ্রীনামকীর্তনের প্রণালী শিক্ষা	...	৯
অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গযাজনপ্রণালী শিক্ষা	...	১১
(১) শ্রীভগবানের সুখান্বেষণ-চেষ্টা	...	১১
(২) আরতিদর্শন	...	১১
(৩) শ্রীহরিবাসরতিথি পালন	...	১২
(৪) শ্রীতুলসীসেবা	...	১২
(৫) শ্রীগঙ্গাস্নান	...	১৩
শ্রীনামকীর্তনের মর্যাদাস্থাপন	...	১৩
শ্রীমহামন্ত্র-গ্রহণরীতি শিক্ষা	...	১৩
ভৃত্যাদর সম্পর্কে শিক্ষা	...	১৪
গোসেবা-শিক্ষা	...	১৮
শ্রীবৈষ্ণবসেবা-শিক্ষা	...	১৮
মাধুকরী ভিক্ষা	...	২০
বিষয়ীর অন্ন	...	২০

অভিনন্দনাদিতে বাধাদান ... ২২
শ্রীগুরুপূজা-বিষয়ে শিক্ষা ... ২৪
শ্রীগুরুবর্গের প্রতি অভিনিবেশ-বিষয়ে উপদেশ ... ২৬
মন্দিরাদিতে নিজ-নামাঙ্কন ... ২৭
কর্মার্পণের জন্য উপদেশের তাৎপর্য ... ২৮
অকপট অশ্রুর প্রতি গুরুত্ব আরোপ ... ৩৩
ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিউদ্রেককারী ... ৩৫
'ভক্তিলতাবীজ' বিষয়ে স্পষ্টীকরণ ... ৩৬
অকালভেকের অসারতা প্রতিপাদন ... ৪২
অপক্ক গৃহত্যাগিগণকে গৃহস্থ হইতে উপদেশ ... ৪৮
রজস্তমোগুণাক্রান্ত সাধকের পক্ষে কায়িক সেবার উপাদেয়তা ... ৫০
পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা ও শ্রীহরিনাম সম্পর্কে শিক্ষা ... ৫৮
তাঁহার অভিলষিত শিষ্যের স্বরূপ ... ৫৯
ভক্তিযাজনের অধিকারী ও ভক্তভাগবত-সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ ... ৬৩
ভক্তি জীবের চেষ্টাসাধ্য নহে ... ৬৬
ব্রহ্মচারী, যতি ইত্যাদির বেশাদির শাস্ত্রীয় বিধান ... ৬৮
পঞ্চতত্ত্ব-কীর্তন-সম্পর্কে শিক্ষা ... ৭১
শ্রীধামবাস-সম্পর্কে শিক্ষা ... ৭২
বস্ত্রাবৃত-দেহে দণ্ডবৎপ্রণাম শাস্ত্রনিষিদ্ধ ... ৭৩
শ্রীভগবন্নামাঙ্কিত প্রস্তরফলকের উপর পদক্ষেপ অপরাধ ... ৭৫
মৃত্যুসময়ে ভক্তিযাজন ... ৭৫
ছবিপূজা-সম্পর্কে শিক্ষা ... ৭৭
নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতি কশাঘাত ... ৮২
দেহারামীর উপর কশাঘাত ... ৮৩
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শিক্ষা ... ৮৪
গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা ... ৯১
মাধ্বমত ও গৌড়ীয়মতের তুলনাত্মক বিচার ... ৯১
সম্বন্ধ (উপাস্য) ... ৯১
অভিধেয় (উপাসনাপদ্ধতি) ... ৯১

প্রয়োজন (সাধনের ফল)	...	৯৩
মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা	...	৯৪
গৌড়ীয়সম্প্রদায় কবে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত হইল ?	...	৯৫
ব্রজগোপীগণের সম্পর্কে শ্রীমন্মধ্বাচার্যের উক্তি	...	৯৫
শ্রীমন্মহাপ্রভু মাধ্বমত স্বীকার করেন নাই	...	৯৮
মাধ্বমত সম্পর্কে শ্রীল সনাতন গোস্বামী	...	৯৯
মাধ্বমত ও শ্রীল জীবগোস্বামী	...	১০০
মাধ্বমত ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর	...	১০২
চারি সম্প্রদায় ও মাধ্ব-গৌড়ীয়-গুরুপরম্পরা	...	১০২
গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক কে ?	...	১০৮
গৌড়ীয় সম্প্রদায় স্বয়ংসম্পূর্ণ	...	১০৯
গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা	...	১১০
গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার যোগ্যতা	...	১১১
অধিকারনির্ণয়	...	১১৪
শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যের মাহাত্ম্য প্রদর্শন	...	১১৮
ভগবৎসেবোপকরণের মাহাত্ম্য প্রদর্শন	...	১২০
প্রকৃত হরিভজনকারীর আদর্শ আচরণ শিক্ষা	...	১২১
(১) প্রচার বন্ধ	...	১২১
(২) পত্রিকা-প্রকাশন বন্ধ	...	১২২
(৩) অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ত্যাগ	...	১২২
(৪) বিরোধিগণকে মঠদান	...	১২৩
বাহ্যাড়ম্বরশূন্য অকপট হরিভজন	...	১২৪
গৃহস্থলীলা	...	১২৫
শ্রীগুরুদেবকে চিনিবে কিরূপে ?	...	১২৭
তাঁহার পদাঙ্কানুসারিণী পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণী	...	১৪৫
মিশনরক্ষা সম্পর্কে আলোচনা	...	১৪৮
শ্রীব্রজধামে স্বভজনে রত	...	১৪৮
শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ	...	১৪৯
বিপ্রলম্ভময় তীব্র বৈরাগ্য	...	১৫৬

শ্রীগোস্বামিগ্রন্থসেবা ... ১৫৭

তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ... ১৫৭

সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠা-বিসর্জনকারী ... ১৫৮

অপ্রাকৃত দৈন্যের মূর্তি ... ১৬০

ব্রাহ্মণগণের মর্যাদাস্থাপন ... ১৬১

অকপট ভজনপিপাসুর পরম বন্ধু ... ১৬১

পার্থিব যোগ্যতাকে উপেক্ষা ও ভজননিষ্ঠার প্রতি আদর ... ১৬১

গুর্বভিমান খর্বীকরণ ... ১৬২

শাস্ত্রসম্মত আচরণ ... ১৬২

অপ্রকট-লীলা ... ১৬৩

অনন্যসাধারণ উপদেশ ও আচরণ ... ১৬৬

কে তাঁহাকে কিরূপে দেখিয়াছেন ... ১৭৩

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ... ১৭৩

শ্রীল নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু ... ১৮০

শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ... ১৮১

শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ... ১৮৪

নিষ্কপট সাধকগণ ... ১৮৮

তাঁহার অনুসরণের চরম ফল ... ১৯০

তাঁহার সম্বন্ধে আরও কতিপয় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী ... ১৯১

শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ ডোগ্রা ... ১৯১

শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ পাল ... ১৯৪

শ্রীজগবন্ধু দাস ... ১৯৫

আর্তিকুসুমাঞ্জলি ... ১৯৯

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সিতানাথের শ্রীপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি ... ১৯৯

শ্রীসদাশিবের শ্রীপাদপদ্মে সকাকু প্রার্থনা ... ২০১

নিখিল শ্রীগৌরানুগ বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে আর্তি-নিবেদন ... ২০১

শ্রীগুরুদেবতাত্ম বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে মিনতি ... ২০১

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাশ্রু নিবেদন ... ২০৩

শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর

আবির্ভাবের কারণ

আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীহরিনামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহাই সুদুর্লভ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির সর্বাপেক্ষা সহজ সাধনরূপে শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। সেই প্রেম (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমত্ববোধ) দান করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীহরিনামসংকীর্তনবন্যায় এই জগতকে প্লাবিত করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার প্রবর্তিত শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ে সকলেই শ্রীহরিনামকীর্তনকে সাধনের মুখ্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগ আচার্যগণের শিক্ষার অনুশীলনের অভাবে তাহা আজ বিস্মৃতির অতলগর্ভে চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীহরিনামকীর্তনের বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে সত্য, কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেহই অবহিত নহেন। উদ্দেশ্য অনুসারেই ফললাভ হইয়া থাকে। অনুষ্ঠান এই উদ্দেশ্যপূরণের চেষ্টামাত্র।

অনুক্ষণ স্বসুখচিন্তামগ্ন বিমুখ জীবকুলের উপরোক্ত ত্রুটি প্রদর্শনপূর্বক তাহাদিগকে ভক্তিসাধনের উপযুক্ত মার্গে পরিচালিত করাইবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং শ্রীগৌরহরি তাঁহার নিজজন শ্রীজীবাভিন্নবিগ্রহ অদ্বিতীয় সিদ্ধান্তবিৎ শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরকে এ জগতে পাঠাইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া শ্রীহরিনামগ্রহণের উপযুক্ত পদ্ধতি নিজে আচরণপূর্বক শিক্ষাদানকেই তাঁহার জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব পরিচয়

অধুনাতন বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার সন্দীপহাতীয়া গ্রামে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাদ্র শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব হয়। অত্যন্ত উদারহৃদয় সরল ও ধর্মনিষ্ঠ শ্রীরজনীকান্ত বসু মহাশয় ছিলেন তাঁহার পিতা ও পরমভক্তিমতী শ্রীমতী বিধুমুখী দেবী ছিলেন তাঁহার মাতা।

তাঁহার পিতৃমাতৃপ্রদত্ত নাম ছিল শ্রীঅনন্তবাস। শ্রীবসু মহাশয়ের পাঁচটি পুত্র ছিলেন। শ্রীযোগেন্দ্র, শ্রীশ্রীনিবাস, শ্রীসুদর্শন, শ্রীহৃষীকেশ ও শ্রীঅনন্তবাস। শ্রীযোগেন্দ্র হইলেন সর্বজ্যেষ্ঠ এবং শ্রীঅনন্ত সর্বকনিষ্ঠ। শ্রীযোগেন্দ্র পরবর্তিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীঅনন্ত যখন মঠবাস করিতেন তাঁহার মাতাঠাকুরাণী সেই সময়ে শ্রীধাম মায়াপুরে থাকিয়া ভজন করিতেছিলেন। অনেক সময় শ্রীঅনন্তের বিভিন্ন বাল্যলীলার কথা তিনি বলিতেন—“শ্রীঅনন্ত বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণানুরাগী ছিলেন। আট বৎসর বয়সে তিনি শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বহু অংশ মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তিনি একবার যাহা পড়িয়া যাইতেন, তাহা সবদিনের জন্য তাঁহার স্মৃতিপটে বিরাজিত থাকিত। তিনি যে অদ্বিতীয় শ্রুতিধর, বাল্যকাল হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বাল্যকাল হইতেই তিনি একজন সুগায়ক ও উত্তম মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। তিনি মৃদঙ্গ-বাদনপূর্বক অতি সুললিত স্বরে মহাজন-পদাবলী গান করিতেন। বাল্যবয়স হইতেই তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বহু শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি যে একজন নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবত, তাঁহার এইসব অলৌকিক গুণের দ্বারা বাল্যকাল হইতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছিল। বাল্যকালে তাঁহার মস্তক কুঞ্চিত কেশে আবৃত ছিল। তাঁহাকে গোপাল বেশে সাজাইয়া দিলে তিনি খুব নাচিতেন। শ্রীগোপালের ফটো রাখিয়া পূজা করা তাঁহার একটি প্রধান খেলা ছিল। ঠাকুরঘরের সামনে তিনি অনেক সময় আপনা হইতেই নৃত্য করিতেন।”

একদিন শ্রীগোদ্রুমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বসিয়াছেন, এই সময়ে শ্রীঅনন্ত তথায় পৌঁছাইয়া সকলকে প্রণাম করিলেন। তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছিলেন— “এ বালকটি সাধারণ বালক নহে। এ একজন মহাপুরুষ।”

তিনি বহরমপুর ‘কৃষ্ণনাথ’ কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত আই. এ. পাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করিয়া বি. এ. পাশ করিলেন। তিনি খুব মেধাবী থাকায় অত্যল্প সময়ের মধ্যেই কলেজের পড়া শেষ করিয়া দিতেন। অবশিষ্ট সময় যুবসুলভ আমোদপ্রমোদের পরিবর্তে ধর্মচর্চা ও গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃতভাষার প্রতি তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল এবং তাহাতে তিনি বিশেষ পারদর্শিতাও লাভ করিয়াছিলেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত সাক্ষাৎকার

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তদনুগ গোস্বামিগণের প্রচারের ফলে সারাভারত এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশ বৈষ্ণবধর্মের নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। পরবর্তিকালে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রমুখ গৌড়ীয়াচার্যবৃন্দ শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনীর স্রোতে বঙ্গদেশ ও ওড়িশার পুরপল্লীকে প্লাবিত করিয়াছিলেন। কালক্রমে উক্ত শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনীর প্রবাহ শুষ্ক হইতে লাগিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নামে বহু অর্বাচীন ভক্তিবিরুদ্ধ মতবাদের সৃষ্টি হওয়ায় সমাজ কলুষিত হইতে লাগিল। জগতের এই দুরবস্থা দেখিয়া তৎকালীন কতিপয় বৈষ্ণবমহাজনের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই বৈষ্ণবমহাজনগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি শ্রীচৈতন্যাভিন্ন শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত নামহট্টের ঝাড়ুদার বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। কারণ শ্রীনামহট্টে যেসমস্ত অন্তরায়রূপ আবর্জনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার পরিষ্করণরূপ কার্যকে তিনি নিজের কর্তব্যরূপে বাছিয়া লইয়াছিলেন। এইসব কুমতবাদখণ্ডন ও শুদ্ধভক্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি অনেক পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাবধি বৈষ্ণবসমাজে তাহা আদৃত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীঅনন্তের ছাত্রাবস্থায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কলিকাতার মাণিকতলা নামক অঞ্চল হইতে ও নবদ্বীপান্তর্গত গোদ্রুমদ্বীপ (অধুনা স্বরূপগঞ্জ) হইতে শ্রীহরিনাম প্রচারকার্য চালাইতে ছিলেন। স্বরূপগঞ্জে তাঁহার স্থাপিত প্রচার-কেন্দ্রের নাম ছিল স্বানন্দসুখদ কুঞ্জ। এই স্থানে তিনি অবস্থান করিতেন এবং শ্রীবিষ্ণুর ও শ্রীবৈষ্ণবগণের আবির্ভাবাদি তিথিতে এই স্থানে উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইত। বিভিন্ন স্থান হইতে শুদ্ধভক্তগণ আসিয়া অহোরাত্র শ্রীনামসংকীর্তনসহকারে এইসব উৎসব পালন করিতেন। সেই সময়ের খ্যাতিসম্পন্ন নিরপেক্ষ বৈষ্ণব শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজও এইসব উৎসবে যোগ দিতেন।

একদিন কোন একটি উৎসব উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট বৈষ্ণব তথায় একত্রিত হইয়াছিলেন। দৈবক্রমে শ্রীঅনন্তও তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র সতর বৎসর। তাঁহার দর্শনমাত্রেই তাঁহার শরীরের মহাপুরুষ লক্ষণগুলি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া সকলের নিকট তাঁহার গুণাবলী প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে কয়েকটি মহাজনপদাবলী গান করিতে আদেশ করেন। শ্রীঅনন্তও তাহা গান করিয়া তাঁহার স্বরের যুগপৎ লালিত্য, গাম্ভীর্য ও সর্বোপরি তাঁহার ভাবাবেশদ্বারা উপস্থিত বৈষ্ণবসমাজকে

বিমুগ্ধ করিয়া দিলেন। তখন হইতেই তত্রত্য বৈষ্ণববৃন্দ জানিতে পারিলেন যে শ্রীঅনন্ত সামান্য বালক নহেন। তিনি কোন বিশেষ কার্যোপলক্ষ্যে শ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক এ জগতে প্রেরিত হইয়াছেন।

গৃহত্যাগ

খ্রী: ১৯১৮ মার্চ্চ ২৯ তারিখে শ্রীঅনন্ত তদানীন্তন শ্রীগৌড়ীয় মিশনের আচার্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার পর তাঁহার নাম হইল শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী। তিনি দীক্ষালাভ করিবার পর হইতে শ্রীগুরুগৃহেই বাস করিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি তাঁহার সুদৃঢ়া নিষ্ঠা এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সর্বদা তাঁহার নিকটেই রাখিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের বহু সন্ন্যাসী, বয়স্ক ও বিদ্বান্ শিষ্য থাকিলেও শ্রীঅনন্তবাসুদেবকেই তিনি তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছিলেন।

অতি অল্প বয়স হইতেই অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান

শ্রীল প্রভুপাদ যখন কোন স্থানে ভক্তিকথা প্রচার করিতে যাইতেন, শ্রীবাসুদেবকে সর্বদা সঙ্গে লইতেন। শ্রীহরিকথা কীর্তন করিতে করিতে কোন সময়ে কোন শাস্ত্রপ্রমাণ দিতে যাইয়া উদ্দিষ্ট শ্লোক তাঁহার স্মৃতিপথগত না হইলে তিনি কেবল শ্রীবাসুদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন। শ্রীবাসুদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার উদ্দিষ্ট শ্লোক উচ্চারণ করিয়া দিতেন কিম্বা কোন শ্লোকের পাদপূরণ করিয়া দিতেন। এত অল্প বয়সে তাঁহার এইরূপ অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তিনি যখন যাহার নিকটে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতেন, তখন বলিতেন—**"বর্তমান যুগে বাসুদেবের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের পণ্ডিত আর দ্বিতীয় কেহ নাই।"** কেবল তাহাই নহে, তিনি যখন শ্রীমদ্ভাগবতের 'গৌড়ীয়ভাষ্য' প্রণয়ন করিলেন, তখন সেই ভাষ্যের "অনন্তগোপাল তথ্যে"র মঙ্গলাচরণে **"বাসুদেবানন্তদাস্যে থাকিয়াতো সদা লহ নাম"**—এই উক্তিটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ লেখার দ্বারা শ্রীঅনন্তবাসুদেব যে অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত ও শ্রীহ্লাদিনী শক্তির দূত নিত্যসিদ্ধ আচার্য, ইহা তিনি জগৎকে স্পষ্টরূপে জানাইয়া দিয়া গেলেন। শ্রীল প্রভুপাদের তাঁহার প্রতি এইপ্রকার আকর্ষণ দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে 'শ্রীল প্রভুপাদের গণেশ' ও 'সার্বভৌম' বলিতেন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে অনেক সময় তাঁহার সঙ্গে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের সিদ্ধান্তগত মতভেদ হইত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আলোচনার পর সব ক্ষেত্রেই **শ্রীবাসুদেবের সিদ্ধান্তই শ্রীল প্রভুপাদ গ্রহণ করিতেন।**

নিরপেক্ষতা

শ্রীঅনন্তবাসুদেব বাল্যকাল হইতেই একান্ত নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। যাহা আচরণীয় বলিয়া একবার তাঁহার হৃদ্‌বোধ হইত, তিনি জীবন পণ করিয়া তাহা আচরণ করিতেন। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি ছিল না যাহা তাঁহাকে তাঁহার উক্ত আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিত। অনেক সময় শ্রীল প্রভুপাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন কোন বিষয়ী ধনী ব্যক্তির বাটীতে যাইতেন এবং কৃপা করিয়া তাহাদের প্রদত্ত বহুবিধ উপায়ন ভগবৎপ্রসাদসূত্রে গ্রহণ করিতেন। তাঁহার অনুগামী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সকলেই আগ্রহের সহিত তথায় ভোজন করিতেন। কিন্তু শ্রীবাসুদেব কেবল শ্রীল প্রভুপাদের উচ্ছিষ্ট হইতে এক কণিকা মাত্র সেবা করিয়া সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিতেন। অন্যসকলে যখন এইরূপ উপবাসের কারণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহার উত্তরে তিনি বলিতেন, "প্রভুপাদ নিত্যানন্দ। তিনি বিষয়ীকে কৃপা করিবার জন্য তাহার অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীব জিহ্বালালসার বশবর্তী হইয়া প্রসাদের নামে বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে তাহাকে ভজন হইতে চ্যুত হইতে হইবে। সেই কারণে আমি বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিতে ভয় করি।" তাঁহার আচরণে এইরূপ সুদৃঢ় নিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহা হইতে বয়স্ক মঠবাসী ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণও তাঁহাকে ভয় করিতেন।

তিনি উত্তম মৃদঙ্গবাদক ও সুগায়ক ছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত পদাবলী তিনি অতি সুললিত স্বরে গান করিতেন। তাঁহার কীর্তন শুনিলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। যদি কোন ব্যক্তি নিজের কর্ণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে কীর্তন করিতে অনুরোধ করিতেন তবে উক্ত ব্যক্তি যতই খ্যাতিসম্পন্ন হউন না কেন, তিনি তাঁহার অনুরোধ তৎক্ষণাৎই প্রত্যাখ্যান করিতেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ যে কোন মুহূর্তে তাঁহাকে কীর্তন করিতে আদেশ করা মাত্রই তিনি বিনা দ্বিধায় তাঁহার আদেশ পালন করিতেন। এমন কি নিজের শারীরিক অসুস্থতার সময়েও তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছানুরূপ পদাবলী কীর্তন করিয়া তাঁহার সন্তোষবিধান করিতেন। এইরূপ আচরণদ্বারা তিনি বহির্মুখলোকরঞ্জনের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রয়াস হইতে বহু দূরে

থাকিয়া কেবলমাত্র শ্রীগুরু-কৃষ্ণের সন্তোষবিধানে তাঁহার দৃঢ় নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইরূপ অনন্যসাধারণ নিরপেক্ষতা যে তাঁহার মহত্ত্বের নিদর্শন, ইহা সহজেই অনুমেয়।

আচার্যরূপে শ্রীঅনন্তবাসুদেব

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর ৩১ তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিলেন। তাঁহার অপ্রকটের অব্যবহিত পূর্বে তিনি নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন—"আমার অন্তে অনন্তবাসুদেব শ্রীরূপরঘুনাথের কথা কীর্তন করিবে।" এইরূপ উক্তির দ্বারা তিনি তাঁহাকে ভাবী আচার্যরূপে স্থির করিয়া দিয়া গেলেন। তখন তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং তাঁহার বয়স মাত্র ৪২ বৎসর হইয়াছিল। অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সন্ন্যাসী সতীর্থ থাকিতে এত অল্পবয়সের একজন ব্রহ্মচারী আচার্যের আসনে অধিষ্ঠিত হইবেন, ইহা কয়েকজনের পক্ষে অসহ্য হইল। তাঁহারা প্রথমে তাঁহার আচার্যত্ব স্বীকার করিলেও অল্প কিছুদিনের পর তাঁহার আনুগত্য স্বীকারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া মিশন ত্যাগ করেন। অবশ্য অনেকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার নির্দেশ অনুসারে চলিলেন। তিনি আচার্য হওয়ার দিন হইতেই সকলের দ্বারা 'আচার্যদেব' বলিয়া সম্বোধিত হইলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণ

শ্রীল আচার্যদেব আচার্যপদে অভিষিক্ত হইলেও উক্ত পদের প্রতি একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি প্রচারাদির প্রতি প্রাধান্য না দিয়া নিজ-ভজনে ব্রতী হইলেন এবং অজ্ঞাতভাবে একাকী শ্রীব্রজধামে বিচরণ করিয়া লীলাস্থান দর্শন ও ভজন করিতে লাগিলেন। মিশনের আচার্যোচিত কার্যকলাপের প্রতি তাঁহার কোনও আগ্রহ ছিল না। তিনি সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যথিত হইয়া স্বভজনে ব্রতী হইলেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় কৃষ্ণপঞ্চমী দিন শ্রীশ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরহ তিথিতে তিনি শ্রীগয়াধামে সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম 'শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী' হইল। কিছুদিন পরে মঠবাসী সতীর্থ ভ্রাতাগণের অনুরোধে তিনি মিশনের ভার গ্রহণের উদ্দেশ্যে শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আভ্যন্তরীণ সংস্কার

শ্রীল আচার্যদেব মঠে ফিরিয়া আসিয়া অনেক আভ্যন্তরীণ সংস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। উদাহরণস্বরূপ, সেই সময়ে গৌড়ীয় মিশনের বিভিন্ন মঠে শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব মহাসমারোহে পালিত হইত। কলিকাতা বাগবাজারস্থিত

গৌড়ীয় মঠের নাটমন্দিরে এতদুপলক্ষে বিপুল সাজসজ্জা হইত। অন্নের পাহাড়, রুটির পাহাড়, বিরাট বিরাট রসগোল্লা, পান্‌তোয়া ও বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন ভক্তগণের দ্বারা আনীত বহুবিধ সামগ্রী ভোগের উদ্দেশ্যে তথায় সজ্জিত হইয়া থাকিত এবং ভোগ শেষ হওয়ার পর সহস্র সহস্র দর্শনার্থী তাহা দর্শন করিতে আসিতেন। শ্রীল আচার্যদেব দেখিলেন যে, অন্নকূট উৎসব বা শ্রীগোবর্ধনপূজা উৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া শ্রীগোবর্ধন-পূজার নামে কেবল বহির্মুখ লোকের মনোরঞ্জনই সার হইতেছে। তজ্জন্য তিনি সর্বপ্রথমে এইরূপ রাজসিকী ভক্তিপ্রথার বিলোপ সাধন করিতে ব্রতী হইলেন। সেসময়ে অধিকাংশ মঠবাসী নিজের ব্যক্তিগত আচরণের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া শুদ্ধভক্তিপ্রচারের ছলনায় অর্থ ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ব্যাকুল ছিল। 'আচরণহীন ও অনুভূতিহীন প্রচারের দ্বারা লোকের মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই অধিক হইবে'—শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা ইহা বুঝাইয়া প্রচার ও পত্রিকাপ্রকাশন সম্পূর্ণ বন্ধ করাইয়া সকলকে অধিকারোচিত আচরণ অর্থাৎ কর্মার্পণে ব্রতী হইতে উপদেশ দিলেন। তখন মঠে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র অসংখ্যাত কীর্তন করা হইত। শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা তাহাও তিনি নিষিদ্ধ করিলেন। এতদ্ব্যতীত নিজে আচরণপূর্বক বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য অনুষ্ঠান করিতে শিক্ষা দিলেন।

প্রচারকের স্বরূপনির্ণয়

ভক্তি হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি। ইহা একমাত্র মহৎকৃপাসাপেক্ষ। সুতরাং রজস্তমোগুণাক্রান্ত কর্মাধিকারীর শ্রীহরিকথা কীর্তনদ্বারা শ্রোতার হৃদয়ে ভক্তিবাসনার উদয়ের পরিবর্তে অর্থ ও প্রতিষ্ঠাদি আকারে ভক্তির ফল আত্মসাৎ করিবার পিপাসাই প্রবল হইবে। কারণ বক্তার হৃদয়ের ভাব তাহার উচ্চারিত শব্দমাধ্যমেই শ্রোতার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সুতরাং মহৎকৃপায় যাহার হৃদয়ে ভক্তিবাসনা জাত হয় নাই, সে কিরূপে অপরের হৃদয়ে তাহা সঞ্চার করিতে পারিবে? ধনী ব্যক্তিই যাচককে ধন দিতে পারে, নির্ধন তাহা পারে না। সুতরাং কর্মফল-আত্মসাৎকারীর ভক্তিকথা প্রচার যে একটি জগন্নাশকর কার্য, নিম্ন শাস্ত্রোক্তিদ্বারা তাহা জানাইয়া তিনি শুদ্ধভক্তিপ্রচার-সম্পর্কে সকলের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিলেন।

"বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ পরিকীর্তিতঃ।
সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃন্ন সংস্পৃশেৎ ॥
উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্‌ভবেৎ ॥"

(শ্রীভ: স: ২০৩ অনু: ধৃত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণবচন)

অর্থাৎ বক্তা দুইপ্রকার; যথা—সরাগ ও নীরাগ। সরাগ বক্তার কথা শ্রোতার অপরাধকঠিন হৃদয়কে বিগলিত করিতে পারে না। সরাগবক্তা বিষয়লোলুপ ও কামী হওয়ায় তাহার কথায় শ্রোতার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করার শক্তি থাকে না। তজ্জন্য উহা শ্রোতার হৃদয়স্পর্শী হয় না। শ্রোতার কথা দূরে থাকুক, যে আচরণহীন প্রচারক, সে যে কথা প্রচার করে, তাহার গুরুত্ব সে নিজেও বুঝে না। ফলে তাহার প্রচার্য বিষয়ের আচরণে তাহার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। এতদ্ব্যতীত সে শ্রোতার অধিকার বিচার না করিয়া কেবল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশায়ই হরিকথা কীর্তন করিয়া থাকে। এইরূপ হরিকথা-কীর্তনের সময় তাহার হৃদয় ভগবদাবেশে আবিষ্ট না হইয়া অর্থসংগ্রহ, জনসংগ্রহ ও প্রতিষ্ঠাদি স্বার্থচিন্তায়ই আবিষ্ট থাকে। সুতরাং এইরূপ কীর্তনের দ্বারা শ্রোতার হৃদয়ে ভগবদাবেশের পরিবর্তে ধন-জন-প্রতিষ্ঠার প্রতিই আবেশ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। যে শ্রবণ-কীর্তনরূপ ভক্তিযাজনের দ্বারা হৃদয়ে ভগবদাবেশ জাত হয় না, উহা বাহ্যতঃ ভক্তির ন্যায় দেখা গেলেও ভক্তিপদবাচ্য নহে। জোনাকির আলো বাহিরে অগ্নির ন্যায় প্রতিভাত হইলেও যেরূপ কোন পদার্থ দহন করিতে পারে না, সেইরূপ সরাগবক্তার কীর্তন বাহিরে ভক্তির ন্যায় দেখা গেলেও তাহা শ্রোতার হৃদয়ে ভগবদাবেশ সঞ্চার করিতে পারে না। অপরপক্ষে ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গও দাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে আসিলে যেরূপ সব কিছু দহন করিতে পারে, তদ্রূপ নীরাগ বক্তার উক্তি-শ্রবণমাত্রেই শ্রোতার হৃদয়ে অপ্রাকৃত দৈন্যের উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি জাত হয়।

নীরাগ বক্তার সম্পর্কে শ্রীল জীবপাদ শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভে নিম্নমতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"কামক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্।
শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমো গুরুঃ ॥

(শ্রীভ: স: ২০৩ অনু:)

অর্থাৎ নীরাগবক্তার অনুভবসিদ্ধ উক্তি এমনই বীর্যবতী যে, তাহা কামক্রোধাদিযুক্ত, অত্যন্ত বিহ্বল, মোহগ্রস্ত, ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর, মৃতপ্রায় ব্যক্তির হৃদয়েও জীবনীশক্তির সঞ্চার করিতে পারে এবং সেই কথা শ্রবণদ্বারা সে নবজীবন লাভ করিয়া শ্রীহরিসেবায় নিজের সমগ্র সত্তা বলি দিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া থাকে। নীরাগবক্তা যাহা বলেন, তাহা নিজ আচরণে প্রতিফলিত করেন। তিনি প্রচার না করিলেও তাঁহার আচরণ দেখিয়া লোকের তাঁহার উক্তির প্রতি স্বতঃ আগ্রহ জাত হয়। তিনি যাহা বলেন তাহা তাঁহার অনুভবসিদ্ধ বাণী। সেইরূপ বক্তাই 'পরমগুরু'পদবাচ্য।

সুতরাং যে প্রচারক আচরণশীল নহে, অধিকন্তু যাহার চিত্ত শ্রীবিষ্ণুর সুখচিন্তার পরিবর্তে নিজ সুখচিন্তায় সর্বদা আবিষ্ট, তাহার সেইরূপ রাজসিক প্রচারদ্বারা জগতের মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই সার হয়। তদ্দ্বারা ভক্তিসম্বন্ধে লোকের মনে কতকগুলি বিকৃত ধারণা সৃষ্টি হয়, ফলে তাহারা বিপথগামী হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীল আচার্যদেব সমস্ত প্রচারকার্য বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার এতাদৃশ কার্যের ফলে অনেক ধন-জন-প্রতিষ্ঠাকামী সতীর্থ মঠবাসী ও গৃহস্থভক্ত তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হন নাই।

শ্রীনামকীর্তনের প্রণালী শিক্ষা

শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনই সাক্ষাৎ ভক্তি, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন। “এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ (শ্রীভা: ৬।৩।২২)। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবপাদ শ্রীক্রমসন্দর্ভে নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—“তন্নামগ্রহণাদিভিরিতি তৃতীয়া ‘প্রকৃত্যাভিরূপঃ’ ইতিবৎ। পুংসাং জীবমাত্রাণাং পরো ধর্মঃ সার্বভৌমো ধর্ম এতাবান্ স্মৃতঃ, নৈতদধিকঃ। এতাবত্ত্বমেবাহ—তন্নামগ্রহণাদিভির্যো ভক্তিযোগঃ সাক্ষাদ্ভক্তি-রিতি। এব-কারেণান্যব্যাবৃত্তত্বং স্পষ্টয়তি,—ভগবতীতি। নামগ্রহণাদীন্যপি যদি কর্মাদৌ তৎসাদ্গুণ্যাদ্যর্থং প্রযুজ্যন্তে, তদা তস্য ধর্মস্য পরত্বং নাস্তি,—তুচ্ছফলার্থং প্রযুক্তত্বেন তদপরাধাদিত্যর্থঃ; তথৈব ক্ষয়িষ্ণুফলদাতৃত্বঞ্চ ভবতীতি ভাবঃ ॥”

অর্থাৎ কেবল নামগ্রহণই প্রাণিগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। এতদ্ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহা বলার তাৎপর্য এই যে শ্রীভগবন্নামগ্রহণই সাক্ষাদ্ভক্তি। ‘নৈতদধিকঃ’ শব্দ প্রয়োগদ্বারা সাধনের অন্যমার্গ যে নিবারিত হইয়াছে ইহা সুস্পষ্ট। অধিকন্তু এই ভক্তি একমাত্র শ্রীভগবানের সন্তোষবিধানের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। নামগ্রহণাদি যদি স্বসুখার্থ কাম্য কর্মের ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহা পরমধর্ম হইবে না। কারণ তুচ্ছ ফল(অর্থাৎ কাম্যকর্মের নশ্বর ফল)লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহা নামাপরাধবিশেষ হইয়া থাকে এবং ক্ষয়শীল পুণ্যফললাভেই এই নামগ্রহণের পরিসমাপ্তি ঘটে। এস্থানে ‘প্রকৃত্যাদিভ্যঃ তৃতীয়া’—প্রকৃতিপ্রভৃতিভ্যঃ তৃতীয়া স্যাৎ অভেদে। অর্থাৎ ‘প্রকৃতি’ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ হইতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়; যথা—‘মধু প্রকৃত্যা মধুরম্’ অর্থাৎ মধু স্বভাবতঃ মধুর। এস্থানে মধু এবং মধুরতা পরস্পর অভিন্ন। অতএব শ্রীভগবানের নামগ্রহণই সাক্ষাৎ ভক্তি। নামকীর্তন করিলে ভক্তি হইবে এইরূপ বলিলে নামগ্রহণের

সার্বভৌমধর্মতন্ত্রের হানি হইবে। উপরোক্ত প্রমাণ হইতে শ্রীভগবন্নামগ্রহণই যে জীবমাত্রের পরমধর্ম, ইহা জানা গেল।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীল আচার্যদেব শ্রীহরিনামকীর্তনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অনুক্ষণ কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে এই শ্রীনামকীর্তন করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার সমস্ত আচরণ ও শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। "নিরন্তর ভগবৎসুখানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে যে নবধা ভক্তি করা হয়, তাহার স্বভাব এই যে, তাহা ভগবৎসাক্ষাৎকারপূর্বক শ্রীভগবানের প্রতি গাঢ় মমতা জন্মায়, তাঁহাকে সুখী করিবার প্রেরণা দেয় এবং তাঁহাকে নিজের সর্বস্ব বলিয়া বোধ করায়।" এই কথাটি অধিকাংশ সময় শ্রীল আচার্যদেবকে খুব দৃঢ়তাসহকারে অত্যন্ত আবেগভরা কণ্ঠে বলিতে শুনা গিয়াছে।

খোলকরতাল সহযোগে মহাজনপদাবলী কীর্তনের সময়েও সুর, তাল, মানের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া প্রত্যেক পদের ভাবের সঙ্গে হৃদয়ের ভাবকে যেরূপ যুক্ত করা যাইতে পারে তৎপ্রতি তিনি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। কীর্তনের সময় তিনি যখন লক্ষ্য করেন যে কীর্তনকারীর ভগবদাবেশের পরিবর্তে সুর, তাল, মানের প্রতি আবেশ আসিয়া যাইতেছে, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিকট আসিয়া "ছুঁচোর গান হইয়া যাইতেছে" বলিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতেন। এইরূপ বলার অর্থ হইল—ছুঁচোর স্বরটি শ্রুতিমধুর হইলেও উক্ত স্বরের সঙ্গে ইহার হৃদয়ের কোন সম্পর্ক থাকে না। সেইরূপ কীর্তনের প্রত্যেক শব্দকে নিজ-হৃদয়ের ভাবের সঙ্গে না মিশাইয়া কেবল লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে মধুর স্বরে গান করিলে উহা শুদ্ধভক্তি হইবে না। হৃদয়ে ভগবদাবেশ না রাখিয়া কেবল স্বরের পরিপাটির প্রতি আবেশ রাখিয়া কীর্তন করিলে তাহা ভজনোন্নতিতে সহায়ক হইবে না, বরং প্রতিষ্ঠাশারূপ অন্যাভিলাষিতাকে বলবত্তর করাইয়া সাধককে ভক্তিপথ হইতে চ্যুত করিয়া দিবে।

সেসময়ে যেসব মহাজনপদাবলী খোলকরতাল সহযোগে কীর্তন করা হইত, সেসকলের সুর শ্রীল আচার্যদেব নিজে উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্ভাবিত সুরগুলি অত্যন্ত মধুর ও দৈন্যপূর্ণ। অদ্যাবধি সেইসব সুরেই উক্ত পদাবলীসকল গান করা হইতেছে। তাঁহার ভজনকুটীরে অনেক সময় তাঁহাকে অতি সুললিত ও আর্তস্বরে কীর্তন করিতে শুনা যাইত।

তিনি সর্বদা আবেশ ও অভিনিবেশ সহকারে কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চৈঃস্বরে ও স্পষ্টাক্ষরে সংখ্যাপূর্বক মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেন।

অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গযাজনপ্রণালী শিক্ষা

কীর্তন ব্যতীত অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজনের সময়েও হৃদয়ে কিরূপ ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানাবেশ পোষণ করিতে হইবে, তাহা তিনি নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। নিম্নবর্ণিত উদাহরণগুলি হইতে তাঁহার আচরণের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

১। **শ্রীভগবানের সুখান্বেষণ-চেষ্টা**—অত্যন্ত গরমের সময় দ্বিপ্রহরে মঠবাসিগণের মধ্যে কেহ বিশ্রাম করিতে থাকেন, কেহ বা অন্য কোনও কার্যে নিযুক্ত থাকেন, কিন্তু শ্রীল আচার্যদেব নাটমন্দিরে বসিয়া গুণ্ গুণ্ স্বরে কীর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবিগ্রহগণের উপর ঝোলানো টানাপাখার দড়ি টানিতে থাকেন। এইরূপে তিনি শ্রীবিগ্রহের সুখবিধান করিতেন। এতদ্ব্যতীত গরমের দিনে শ্রীবিগ্রহগণকে ডাবের জল ও সরবৎ ইত্যাদি এবং শীতের দিনে প্রাতঃকালে গরম খিচুড়ি ইত্যাদি ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থাও তিনি মঠে প্রচলন করিয়াছিলেন।

২। **আরতিদর্শন**—মঠবাসিগণের মধ্যে অনেকে শীতের দিনে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করিয়া শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারতি দর্শন করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন। কিন্তু শ্রীল আচার্যদেব সেসময় নিজে শয্যা ত্যাগ করিয়া মঙ্গলারতি দর্শন করিবার আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আচরণে অনুপ্রাণিত হইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া মঙ্গলারতি দর্শন করিতে লাগিলেন।

আরতিদর্শনের আবশ্যকতা কি তাহা শিক্ষা দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—আরতিদর্শন ও তদনুষ্ঠানের দ্বারা দেহাভিমান বিনষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। শ্রীপুরুষোত্তম ভগবানের নীরাজনাদি বিলাসোৎসব দর্শনে তাঁহার শ্রবণ-নয়নাদি সর্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান হইতেছে বলিয়া অনুভব করাই আরতিদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদ্দ্বারা অনাদি ভগবদ্‌বিমুখতা হেতু শ্রীভগবানের প্রতি জীবের যে মৎসরতা জাত হইয়াছে, তাহা দূর হইয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি জাত হয়।

আরতিদর্শন যে চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম, ইহা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে' ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে নিম্নমতে বর্ণিত হইয়াছে—

"পঠিত্বাথ প্রিয়ান্ শ্লোকান্ মহাবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ।
প্রভোর্নীরাজনং কুর্যান্মঙ্গলাখ্যং জগদ্ধিতম্ ॥
নীরাজনন্ত্বিদং সর্বৈঃ কর্তব্যং শুচিবিগ্রহৈঃ ।
পরমশ্রদ্ধয়োত্থায় দ্রষ্টব্যঞ্চ সদা নরৈঃ ॥
স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ সর্বেষামেতৎ সর্বেষ্টপূরকম্ ॥"

(শ্রীহ: ভ: বি: ৩।১৫০-১৫২)

শ্রীভগবানের প্রিয় শ্লোকসমূহ পাঠ করিয়া তুমুল বাদ্যধ্বনিসহকারে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের 'মঙ্গল' নামক নীরাজন (মঙ্গলারতি) সম্পাদন করিবে। পবিত্র দেহে সকলেরই এই মঙ্গলারতি করা উচিত। নরমাত্রেরই শয্যা ত্যাগ করিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত সর্বদা আরতি দর্শন করা উচিত। ইহা স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই সর্ব অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকে।

এসম্পর্কে 'শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়' হইতে উদ্ধৃত হইয়া 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' বর্ণিত হইয়াছে—

"কৃত্বা নীরাজনং বিষ্ণোর্দীপাবল্যা সুদৃশ্যয়া ।
তমোবিকারং জয়তি জিতে তস্মিংশ্চ কো ভবঃ ॥"

(শ্রীহ: ভ: বি: ৮।৩০৩)

সুদৃশ্য দীপাবলীর দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর নীরাজন করিয়া তমোগুণের বিকার অজ্ঞান বা তাহার বিকার কামক্রোধাদিকে জয় করা যায়। অজ্ঞানকে জয় করিলে আর সংসার কোথায় ?

এইসব শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া দেহারামপরিপোষক শয়নসুখ ত্যাগ করিয়া প্রত্যহ নিয়মপূর্বক আরতিদর্শন করিতে তিনি নিজে আচরণমুখে উপদেশ দিয়াছেন।

৩। **শ্রীহরিবাসরতিথি পালন**—শ্রীহরিবাসরতিথি পালন সম্পর্কেও তিনি নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। একাদশীর দিন তিনি নির্জল উপবাস করিয়া অহোরাত্র শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতেন এবং দ্বাদশীর দিন দিবানিদ্রা ত্যাগ করিতেন। তাঁহার এই আদর্শে অনেকেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

৪। **শ্রীতুলসীসেবা**—শ্রীতুলসী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া। তাঁহার কৃপা হইলে শ্রীব্রজ-বাসের ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় অধিকার পাওয়া যায়। এই বিচারে তিনি পরম যত্ন ও আগ্রহসহকারে শ্রীতুলসী সেবা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বৈশাখ মাসে ছায়াদান, প্রত্যহ জলদান ও পরিক্রমা করিতে তিনি নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন।

৫। **শ্রীগঙ্গাস্নান** — শ্রীল আচার্যদেব শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থানকালে অধিকাংশ দিবস ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া কীর্তনসহযোগে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। ভক্তিস্বরূপিণী গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনপূর্বক গঙ্গাস্নান করিলে যে ভক্তিবৃদ্ধি হইবে, ইহা তিনি সকলকে শিক্ষা দিতেন। গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় তৈলমর্দন ও গঙ্গাজলে দন্তধাবন বা শৌচাদি কর্ম করিতে তিনি নিষেধ করিতেন। গঙ্গা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের পদসলিল। এই দৃষ্টিতে তিনি প্রথমে গঙ্গাকে দণ্ডবন্নতিপূর্বক তাহার পর স্নান করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীনামকীর্তনের মর্যাদাস্থাপন

কোন স্থানে সংকীর্তন শোভাযাত্রাকালে সাধারণতঃ মুখ্যব্যক্তিগণ সম্মুখে থাকেন এবং তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া সংকীর্তন-শোভাযাত্রা যায়। শ্রীল আচার্যদেবের নিকট ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, শ্রীনাম ও শ্রীনামী অভিন্ন। শ্রীবিগ্রহ কোন স্থানে গেলে যেরূপ তাঁহার অনুগমন করিতে হয়, সেইরূপ নামকীর্তন-শোভাযাত্রায় অগ্রণী না হইয়া অনুগামী হওয়াই বৈষ্ণবশিষ্টাচার। তদনুসারে তিনি সর্বদা নামকীর্তনের সম্মুখে না গিয়া পশ্চাতে যাইতেন। নিজের বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের কীর্তনশোভাযাত্রা যাইতে দেখিলে তিনি ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎপ্রণামপূর্বক শ্রীনামপ্রভুকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। আরতি-দর্শনের সময় তিনি সর্বদা কীর্তনের পশ্চাৎভাগে দাঁড়াইতেন।

পূর্বে গৌড়ীয় মিশনের তরফ হইতে বড় বড় সহরে নগরসংকীর্তন করা হইত। একবার তিনি খবর পাইলেন যে, কলিকাতায় নগরসংকীর্তন যাইবার সময় একদল লোক তৎপ্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছে। সেইদিন হইতে তিনি কেবল শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবন ধাম ব্যতীত অন্য সমস্ত সহরে নগরসংকীর্তন বন্ধ করিয়া দিলেন। যাঁহারা শ্রীনামের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিয়া ঘোর অপরাধ অর্জন করিতেছিলেন, তাঁহারা এতদ্দ্বারা সেই অপরাধের সম্ভাবনা হইতে রক্ষা পাইলেন।

শ্রীমহামন্ত্র-গ্রহণরীতি শিক্ষা

শ্রীল আচার্যদেব সর্বদা অভিনিবেশসহকারে সংখ্যা রাখিয়া স্পষ্টভাবে উচ্চৈঃস্বরে আর্তিযুক্ত হইয়া শ্রীমহামন্ত্র কীর্তন করিতে উপদেশ দিতেন। সেসময়ে মিশনে এবং অন্যত্রও খোলকরতালসহযোগে অসংখ্যাত শ্রীমহামন্ত্র কীর্তন করা হইত। তিনি ইহার তীব্র বিরোধ করিলেন এবং বহু শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার সমসাময়িক বা পরবর্তী গোস্বামিগণের মধ্যে

কোন একজনও খোলকরতালসহযোগে অসংখ্যাত মহামন্ত্র কীর্তন করেন নাই। মহামন্ত্র 'মন্ত্র' হওয়ায় ইহাকে মন্ত্রের মর্যাদা দিয়া সংখ্যা রাখিয়া জপ বা কীর্তন করিতে হইবে। অন্যান্য মন্ত্রের ন্যায় মহামন্ত্রেরও দীক্ষা আছে। অর্থাৎ গুরু শিষ্যকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই প্রণালী গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে চলিয়া আসিতেছে। যদি মহামন্ত্র কেবল ভগবন্নাম হইত তাহা হইলে অন্যান্য নামের ন্যায় ইহা গুরুর নিকট হইতে গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা থাকিত না। তবে ইহাতে এই বৈশিষ্ট্য যে, ইহা সাধারণ মন্ত্রের বিধি, যথা—ত্রিকাল, একাসনে উপবিষ্ট হইয়া ও শুচি অবস্থায় জপ করা ইত্যাদি ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে অবস্থিত। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগ গোস্বামিগণ যে আচরণ করিয়া গিয়াছেন তাহা পালন না করিয়া অসংখ্যাত মহামন্ত্র কীর্তন করিলে অপরাধ না হইলেও ফললাভে বিলম্ব ঘটিবে। সংখ্যা রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্তনের বহু প্রমাণ রহিয়াছে। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সংখ্যা রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্তন করিতেন।

ইহা হইল মহামন্ত্র সম্পর্কে তাঁহার শিক্ষা। মহামন্ত্র ব্যতীত অন্যান্য নামের বিভিন্ন সুর তিনি নিজে উদ্ভাবন করিয়া খোলকরতাল সহযোগে কিরূপে কীর্তন করা যাইতে পারিবে, তাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

ভূতাদর সম্পর্কে শিক্ষা

ভাগবতধর্মে প্রবেশের প্রথম সোপান হইতেছে 'ভূতাদর'। ইহা শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন। ভূতাদর বলিতে শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিরূপে প্রত্যেক জীবহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, এই বিচারে প্রত্যেক জীবকে সম্মানদান। শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে বলিয়াছেন—

"মৃগোষ্ট্রখরমর্কাখুসরীসৃপ্খগমক্ষিকাঃ।
আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেৎ তৈরেষামন্তরং কিয়ৎ॥
আশ্বাঘান্তেঽবসায়িভ্যঃ কামান্ সংবিভজেদ্যথা।
অপ্যেকামাত্মনো দারাং নৃণাং স্বত্বগ্রহো যতঃ॥
জহ্যাদ্যদর্থে স্বান্ প্রাণান্ হন্যাদ্বা পিতরং গুরুম্।
তস্যাং স্বত্বং স্ত্রিয়াং জহ্যাদ্যস্তেন হ্যজিতো জিতঃ॥
তস্মাদ্ব্রাহ্মণদেবেষু মর্ত্যাদিষু যথার্হতঃ।
তৈস্তৈঃ কামৈর্যজস্বৈনং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রাহ্মণাননু॥"

(শ্রীভা: ৭।১৪।৯, ১১, ১২, ১৮)

অর্থাৎ মৃগ, উষ্ট্র, গর্দভ, বানর, মূষিক, সর্প, পক্ষী ও মক্ষিকা প্রভৃতিকে নিজের পুত্রতুল্য দেখিবে। নিজের পুত্রদিগকে যেরূপ ভোজ্যবস্তু ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, ইঁহাদিগকেও সেইরূপ যথোচিত বস্তু ভাগ করিয়া দিবে। কারণ পুত্রাদি হইতে এইসব প্রাণীর কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। কুক্কুর, পতিত ও চণ্ডালাদিকেও যথাযোগ্য ভোজ্যবস্তু বিভাগ করিয়া দিবে। মমতাস্পদ একমাত্র ভার্যাকে নিজের সেবায় উপেক্ষা করিয়াও অতিথিসেবায় নিযুক্ত করিবে। যাহার জন্য পুরুষ নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করে এবং পিতা ও গুরুকেও হত্যা করে, সেই স্ত্রীতে যিনি স্বত্ব পরিত্যাগ করেন, তাঁহার দ্বারা অজিত ভগবানও জিত হইয়া যান। অতএব ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণের পরে মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি প্রাণীকে যথাযোগ্য দ্রব্যাদি দিয়া সর্বান্তর্যামীর অর্চন করিবে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও ভূতাদরসম্পর্কে নিম্নমতে বর্ণিত হইয়াছে—

"সর্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু না জানিয়া।
বিষ্ণুপূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া ॥
এক হস্তে যেন বিপ্রচরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায়, কপালে ॥
এসব লোকের কি কুশল কোনক্ষণে ?
হইয়াছে, হইবেক ? বুঝ ভাবি মনে ॥"

(শ্রীচৈ: ভা: মধ্য ৪।১৪৩-১৪৫)

"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥"

(শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ২০।২০)

এইসব নজীর দিয়া ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে প্রত্যেক জীবকে সম্মান করিতে তিনি নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন।

একদা শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিবার সময় বৈশাখ মাসের মধ্যাহ্ন কালে কয়েকজন যাত্রী শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তখন মন্দির বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা অত্যন্ত তৃষাতুর হইয়া বারান্দায় দণ্ডায়মান জনৈক ব্রহ্মচারীর নিকট জল চাহিলেন। তিনি তাহাদিগকে ইশারায় শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধির নিকট অবস্থিত টিউবওয়েল দেখাইয়া দিলেন। নিদাঘ সময়, উত্তপ্ত ভূমি, এদিকে তাহাদের নগ্ন পদ। এই অবস্থায় তাহারা টিউবওয়েলের দিকে ছুটিয়া যাইতেছিলেন। শ্রীল আচার্যদেব তাঁহার ভজনকুটীরের বারান্দায় বসিয়া এইসব দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ব্রহ্মচারীকে ডাকাইয়া

তাহারা কে এবং কি চাহিতেছিলেন জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে ব্রহ্মচারী হেয়জ্ঞানে বলিলেন—তাহারা পল্লীগ্রামের লোক, দর্শন করিতে আসিয়াছে, জল খাইবার জন্য চাহিতেছিল।

শ্রীল আচার্যদেব—তুমি কি বলিলে ?

ব্রহ্মচারী—আমি তাহাদিগকে টিউবওয়েল দেখাইয়া দিলাম।

শ্রীল আচার্যদেব—(অতীব ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া) ইহাই কি তোমার ভক্তি ? তোমাকে কি ইহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ? জান, প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিরূপে আছেন, এই বিচারে আব্রহ্মস্তম্ব প্রত্যেক জীবকে সম্মান না করিলে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অধিকার হইবে না। অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে ভূতাদর করিতে না শিখিয়া কেবল ত্যাগিবেশ লইলে কি লাভ হইবে ? তুমি এই মুহূর্তে মঠ ত্যাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া যাও। তোমার মুখ দর্শন করিলে সচেল গঙ্গাস্নান করা উচিত।

ব্রহ্মচারী—আজ্ঞে, আমার ভুল হইয়াছে। কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন। আমি আর কখনও এইরূপ ভুল করিব না।

শ্রীল আচার্যদেব—শীঘ্র যাও, তাহাদিগকে ডাকিয়া ক্ষমা চাহিয়া সরবৎ করিয়া খাইতে দাও।

শ্রীল আচার্যদেবের আদেশ পাইয়া ব্রহ্মচারীজী দৌড়াইয়া গেলেন, তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া আসন দিয়া বসাইলেন এবং ক্ষমা চাহিয়া সরবৎ করিয়া দিলেন। তাহারা এই ঘটনার রহস্য কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া সেসম্পর্কে জানিতে চাহিলে ব্রহ্মচারীজী সমস্ত কথা জানাইলেন। তাহারা শ্রীল আচার্যদেবের এইরূপ অসাধারণ বিচারের কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া শ্রীল আচার্যদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

ভূতাদরসম্পর্কে শ্রীল জীবপাদের উক্তিও নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্ ॥ (শ্রীভা: ৩।২৯।২১)

ভূতেষু বক্ষ্যমাণরীত্যা অপ্রাণভৃজ্জীবমারভ্য ভগবদর্পিতাত্মজীবপর্যন্তেষু; ভূতাত্মা তদন্তর্যামী, তং মামবজ্ঞায়, তেষামবজ্ঞয়া তদধিষ্ঠানকস্য মমৈবাবজ্ঞাং কৃত্বেত্যর্থঃ। ততস্তাং কৃত্বা যোঽর্চ্চাং মৎপ্রতিমাং কুরুতে, স তদ্বিড়ম্বনং তস্যা অবজ্ঞামেব কুরুত ইত্যর্থঃ। যতঃ (শ্রীভা: ৩।২৯।২২)—

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥
অর্চাদাবর্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥ (শ্রীভা: ৩।২৯।২৫)

তাবদেব স্বকর্মকৃৎ সন্নর্চাদাবর্চয়েদ্যাবৎ সর্বভূতেষ্ববস্থিতমীশ্বরং মাং ন বেদ, ন জানাতি; অত্র স্বকর্ম-সহায়ত্বমজাতশ্রদ্ধস্য, শুদ্ধভক্তাবনধিকারাৎ।"

(শ্রীভ: স: ১০৬ অনু:)

ভূতাত্মা আমি সমস্ত ভূতগণের মধ্যে সর্বদা অবস্থিত রহিয়াছি, এইরূপ সর্বভূতাত্মরূপী আমাকে মানুষ অবজ্ঞা করিয়া (আমার) অর্চার বিড়ম্বনা করে।

'ভূতগণের মধ্যে' অর্থাৎ আচ্ছাদিতচেতন বৃক্ষাদিরূপ অপ্রাণী জীব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণকারী জীবপর্যন্ত সকলের মধ্যে 'ভূতাত্মা' অর্থাৎ প্রাণিগণের অন্তর্যামিরূপে আমি বিদ্যমান। অতএব আমার অধিষ্ঠানরূপী সেই জীবগণকে অবজ্ঞা করিলে তাহাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত আমারই অবজ্ঞা হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। অতএব সেইরূপ অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তি 'অর্চা' অর্থাৎ আমার প্রতিমার পূজা করে, সে ব্যক্তি সেই অর্চার 'বিড়ম্বনা' অর্থাৎ অবজ্ঞাই করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি সর্বভূতে বিদ্যমান আত্মা ও ঈশ্বরস্বরূপ আমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়তাবশতঃ অর্চার ভজন করে, সে ভস্মে ঘৃতাহুতি দান করে। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুই অন্তর্যামিরূপে সকল জীবহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, এই বিচারে সকল জীবকে আদর না করিয়া কেবল শ্রীবিষ্ণুর অর্চাপূজার অভিনয় ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিরর্থক।

যেপর্যন্ত মনুষ্য সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে নিজ হৃদয়ে জানিতে না পারে, সে পর্যন্ত সে বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করিয়া আমার অর্চাদিতে ঈশ্বরস্বরূপ আমাকে পূজা করিবে।

তাৎপর্য এই যে, যেপর্যন্ত সাধক সর্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরস্বরূপ আমাকে অনুভব করিতে না পারিয়াছে সেপর্যন্ত বর্ণাশ্রমধর্ম পালনপূর্বক আমার মূর্তি প্রভৃতিতে আমার পূজা কর্তব্য। এস্থানে শুদ্ধভক্তিতে অনধিকারী (কর্মাধিকারী) অজাতশ্রদ্ধ ব্যক্তির পক্ষেই বর্ণাশ্রমোচিত বিবিধ কর্তব্য কর্মের কথা উক্ত হইয়াছে।

শ্রীল জীবপাদের উপর্যুক্ত বাক্য হইতে স্পষ্ট জানা গেল যে, শুদ্ধভক্তিতে অনধিকারী (কর্মাধিকারী) অজাতশ্রদ্ধ সাধকের পক্ষে ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে ভূতাদর

করাই ভাগবতধর্মের প্রথম সোপান। কর্মার্পণরূপ প্রাথমিক ভাগবতধর্মে ভৃতাদর অপরিহার্য। কারণ ভৃতাদর ব্যতীত কর্মার্পণই সিদ্ধ হইবে না। আবার কর্মার্পণ সিদ্ধ না হইলে কর্মাধিকার হইতে ভক্ত্যধিকারে উন্নীত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব শুদ্ধভক্তিকামী কর্মাধিকারী সাধকের পক্ষে ভৃতাদর অবশ্য করণীয়।

গোসেবা-শিক্ষা

শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান কালে তিনি গোসেবা বিষয়ে নিজে খুব যত্নবান্ হইতেন এবং সকলকে উপদেশ দিতেন—"গোধন শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়। যত্নসহকারে গোসেবা করিলে শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।" তিনি প্রত্যহ গোশালায় গিয়া গাভীদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন, নিজের হাতে খাইতে দিতেন ও তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিতেন। সাধারণতঃ লোকে গাভীদিগকে উচ্ছিষ্টাদি দিয়া থাকে। কিন্তু তিনি তাহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কোন লোকের উচ্ছিষ্ট যেন গোশালায় না যায়, তজ্জন্য তিনি কড়া তাগিদ করিতেন। আবার গরু বিক্রিরও তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। কোন মঠে কেহ গরু বিক্রি করিয়াছে জানিতে পারিলে তিনি ভীষণ অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ যত্নের ফলে শ্রীধাম মায়াপুরে ও কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে গরুগুলি হৃষ্টপুষ্ট হইয়া দর্শনীয় হইয়াছিল।

শ্রীবৈষ্ণবসেবা-শিক্ষা

এই সময় শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপে গঙ্গাকূলে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণবোচিত বেশ বা আচার কিছুই ছিল না। তিনি শ্রীতুলসীমালা পরিতেন না কিম্বা তিলক করিতেন না। সব সময় তামাক টানিতেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শ্মশ্রুতে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার এইসব বাহ্য আচরণ দেখিয়া তাঁহার বৈষ্ণবত্ব বিষয়ে কাহারও ধারণা ছিল না। শ্রীল আচার্যদেবই সর্বপ্রথমে জানাইলেন—"শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ একজন মহাভাগবত, বাৎসল্যরসে তাঁহার সিদ্ধি হইয়াছে। যে তাঁহার সেবা করিবে তাহার জীবন ধন্য হইবে।" তিনি তাঁহার সেবার জন্য মিশনের দুইজন ব্রহ্মচারীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁহার সেবা করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেবার জন্য যে যে সামগ্রী আবশ্যক, তিনি সেসব সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এমন কি তামাক খাইবার জন্য টিকা ক্রয়ের ব্যবস্থাও করিতেন। তাঁহার থাকার জন্য দুইটি তাঁবু যোগাইয়া দিয়াছিলেন। একটিতে শ্রীল বাবাজী মহারাজ ও অন্যটিতে তাঁহার সেবকগণ থাকিতেন। তাঁহার নির্দেশে শ্রীধাম

মায়াপুর হইতে প্রত্যহ দুধ ও অন্যান্য উপকরণ শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবার জন্য পাঠান হইত এবং তিনি মাঝে মাঝে নিজে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিতেন এবং কখনও কখনও তাঁহার নিকট রাত্রিযাপনও করিতেন। ব্রজমণ্ডল হইতেও তিনি তারবার্তা প্রেরণ করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীঅঙ্গের কুশলাদি সংবাদ লইতেন।

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার আবেশ। তিনি অনুক্ষণ তাঁহার পূজিত শ্রীবিগ্রহগণের সঙ্গেই কথোপকথন করিতেন। কখনও বা তাঁহাদিগকে ঠাট্টা করিয়া হাসিতেন, কখন কাঁদিতেন, কখনও বা অতি আর্তস্বরে ডাকিতেন—"ভকতবৎসল হরি! প্রাণবল্লভ হরি! গোপাল! নন্দলাল!" তাঁহার দর্শনের জন্য বহু লোক তথায় উপস্থিত হইত, কিন্তু তিনি কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া অনুক্ষণ ভাবাবেশে সেই শ্রীবিগ্রহগণের সঙ্গেই কথা বলিতেন। পিতা যেরূপ পুত্রকে শাসন করে, সেইরূপ অনেক সময় তিনি তাঁহার প্রাণধন শ্রীবিগ্রহগণকে শাসনও করিতেন। তিনি ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথযাত্রা দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় এ দীন লেখক তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

তিনি অন্তর্যামিসূত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিতেন এবং যাহার সম্পর্কে যাহা বলার কথা তাহা সোজাসুজি না বলিয়া শ্রীবিগ্রহগণকেই কথাছলে বলিয়া দিতেন। অতি বৃদ্ধ হইলেও তিনি নিজের হাতে রান্না করিয়া শ্রীবিগ্রহগণকে ভোগ দিতেন। সময় সময় দুই তিন দিন এইরূপ আবেশে থাকিতেন যে শ্রীবিগ্রহগণকে ভোগ দেওয়ার বা নিজে প্রসাদ পাইবার কথা একেবারেই ভুলিয়া যাইতেন।

এইরূপ প্রেমিক ভক্তের সেবা যে জীবগণের ভববন্ধমোচনের এবং প্রেমলাভের একমাত্র উপায়, তাহা শ্রীল আচার্যদেব বারম্বার বলিয়াছেন এবং নিজেও আচরণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

কর্মমিশ্র অধিকার হইতে আরম্ভ করিয়া শুদ্ধভক্তিভূমিকা পর্যন্ত সর্বত্র মহৎসেবার প্রাধান্যের বিষয় শ্রীল আচার্যদেব গুরুগম্ভীরস্বরে শিক্ষা দিয়াছেন। মহৎসেবা করিলেই শ্রীহরিকথা শ্রবণের যোগ্যতা লাভ হইবে। "তদেবং মহদাদিসেবা দর্শিতা। অস্যাশ্চ শ্রবণাদিতঃ পূর্বত্বম্।" (শ্রীভ: স: ২৪৭ অনু:) অর্থাৎ এইরূপে মহৎ প্রভৃতির সেবা প্রদর্শিত হইল। শ্রবণাদির পূর্বেই এই মহৎসেবার বিধান দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীল জীবপাদের এই উক্তিকে ভিত্তি করিয়া শ্রীল আচার্যদেব প্রত্যেক কর্মাধিকারী ভক্তিপিপাসুকে শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুষ্ঠানের পূর্বে কর্মার্পণের অঙ্গস্বরূপ কায়িক মহৎসেবার উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

মাধুকরী ভিক্ষা

তিনি সর্বদা স্থূল ভিক্ষা ও মাসিক চাঁদার বিরোধী এবং মাধুকরী ভিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ মাধুকরী ভিক্ষায় দাতার অস্মিতা (দাতা বলিয়া অহংকার) থাকে না। সুতরাং উহা ভজনের অনুকূল হয়। স্থূলভিক্ষা ও মাসিক চাঁদায় দাতার অহমিকা থাকে। এইজন্য তাহা গ্রহণ করিলে বিষয়ীর বিষয়াবেশ সেই দানের মাধ্যমে সাধকহৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। পরিণামে সাধকের চিত্তচাঞ্চল্য জাত হইয়া ভজনে একাগ্রতা নষ্ট হয়।

বিষয়ীর অন্ন

বিষয়ীর অন্নের উপর তিনি সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। কোন মঠবাসী প্রসাদের নামে যেন কোন বিষয়ীর প্রদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ না করে সেইজন্য তিনি খুব কড়া শাসন করিতেন। তাঁহার নির্দেশে বিষয়িগণের প্রদত্ত বহু উপাদেয় ফল, মিষ্টি, ডাল, সরু চাল ইত্যাদি গরুকে দেওয়া হইত। এইরূপ করিবার কারণ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—"সংসারী লোকমাত্রে সাধারণতঃ কামী। কামনাপূরণের উদ্দেশ্যেই তাহারা শ্রীভগবানের সেবার অভিনয় করিয়া থাকে। তাহারা নানাপ্রকার অসদুপায় অবলম্বনে অর্থ উপার্জন করিয়া থাকে ও শ্রীহরিসেবার উদ্দেশ্যে উক্ত অসদুপার্জিত বিত্ত বা অশুক্লবিত্ত ব্যয় করিয়া নিজ কামনাপূরণের আশা পোষণ করিয়া থাকে। উক্ত বিত্তে তাহাদের বাসনা সঞ্চারিত থাকে। উহা গ্রহণ করিলে সেই বাসনা তাহাদের প্রদত্ত বস্তুর মাধ্যমে সাধকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া তাহার চিত্তচাঞ্চল্য জাত করায়। পরিণামে সে ভজনপথ হইতে চ্যুত হয়।" এ সম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিম্নলিখিত শিক্ষা আমাদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিবে।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু গৃহত্যাগের পর শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদরজায় ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইতেন। দর্শনার্থী ভক্ত ও শ্রীজগন্নাথের সেবকগণের মধ্যে যিনি যাহা দিতেন, তাহাতেই তাঁহার উদর পূরণ করিতেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা খুব দুঃখিত হইয়া চারিশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া দুইজন সেবক

ও একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। শ্রীল রঘুনাথ তাহা হইতে নিজের জন্য কিছুই গ্রহণ করিলেন না। কেবল প্রতি পনরদিনে একবার চার গণ্ডা (২ পয়সারও কম) আনিয়া তাহাতে মহাপ্রসাদ ক্রয় করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভোজন করাইতেন। এইরূপ দুই বৎসর করিবার পর ইহা বন্ধ করিয়া দিলেন। দুইমাস যাবৎ নিমন্ত্রণ না করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামিপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রঘু কেন আমার নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া দিল ?" তাহার উত্তরে শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামিপ্রভু বলিলেন—"বোধ হয় রঘু মনে কিছু বিচার করিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথের কার্যের প্রশংসা করিয়া বিষয়ীর অন্নগ্রহণের কুফল বিষয়ে বলিলেন—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মন মলিন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন ॥"

(শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ৬।২৭৩-৭৪)

এস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'বিষয়ীর অন্ন' বলিবার অভিপ্রায় কী ? তিনি কাহাকে লক্ষ্য করিয়া 'বিষয়ী' বলিলেন ? আজন্ম বৈরাগী শ্রীরঘুনাথকে ত কখনও বিষয়ী বলা যাইতে পারে না। তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্দিষ্ট বিষয়ী এস্থানে কে ? তিনি হইলেন শ্রীরঘুনাথের পিতা। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

"ইঁহার বাপ-জ্যেঠা বিষয়-বিষ্ঠাগর্তের কীড়া।
'সুখ' করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥"

(শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ৬।১৯৫)

অর্থাৎ ইঁহার (শ্রীরঘুনাথের) বাবা ও জ্যেঠা ঘোর বিষয়ী এবং বিষয়-বিষের মহাপীড়াকে তাঁহারা সুখ বলিয়া মনে করেন। তাই তাঁহার পিতার প্রদত্ত অর্থদ্বারা শ্রীল রঘুনাথ শ্রীমহাপ্রসাদ ক্রয় করায় উহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষয়ীর অন্ন বলিয়াছেন। এস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীমহাপ্রসাদ ত অপ্রাকৃত বস্তু ও শ্রীজগন্নাথ হইতে অভিন্ন। তাহাকে কি বিষয়ীর অন্নজ্ঞানে ত্যাগ করা যাইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, শ্রীমহাপ্রসাদ অপ্রাকৃত সত্য, কিন্তু বিষয়ীর প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে উহা ক্রীত হওয়ায় তাহাতে বিষয়ীর ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। তাহা স্বরূপে অবিকৃত থাকিলেও তাহার শক্তি মেঘাবৃত সূর্যের ন্যায় অর্থদাতার রাজসিক ভাবের দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে।

তজ্জন্য তাহাকে রাজস নিমন্ত্রণ বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন। সেই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে উক্ত বিষয়ীর রাজস ভাব সাধক-হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে বাধা সৃষ্টি করিবে। শ্রীহরিকথা প্রচার সম্পর্কেও এই সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়। প্রচারকের হৃদয়ে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা থাকিলে সেই রাজসিকভাব তাহার নামকীর্তনরূপ ভক্তিসাধনকে আবৃত করিয়া তাহাকে রাজসী ভক্তিতে পরিণত করিয়া দেয়। ফলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের মন মলিন হওয়ায় উভয়ে ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হন। ইহা এক কঠিন সিদ্ধান্ত। যাঁহারা ভাগ্যবান্ অর্থাৎ মহৎকৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অন্যের পক্ষে ইহা দুর্বোধ্য। শ্রীল আচার্যদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষায় নিজে দৃঢ় থাকিয়া সকলকে ইহা অনুসরণ করিতে কড়াকড়ি নির্দেশ দিতেন। যাঁহারা উক্ত নির্দেশ পালন করিয়াছেন, তাঁহারা যে সুফল পাইয়াছেন, ইহা ভুক্তভোগিমাত্রেই জানেন।

অভিনন্দনাদিতে বাধাদান

শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্যদেবই প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথিতে তাঁহার গুণাবলী বর্ণন করিয়া অভিনন্দনপত্রাদি দিবার ব্যবস্থা প্রচলন করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহা একটি প্রাণহীন অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়া গেল। তজ্জন্য শ্রীল আচার্যদেব গতানুগতিক প্রথায় এইরূপ অভিনন্দনাদি দিতে নিষেধ করিলেন এবং উহা ভক্তি ত' নহে, বরং অভক্তিরই প্রতীক বলিয়া তিনি মত ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার এইপ্রকার মন্তব্য শুনিয়া অন্যাভিলাষিগণ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। কারণ তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অভিনন্দনাদি দিয়া পরে মিশন হইতে প্রকাশিত 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়' আদি পত্রিকায় নিজের নাম দিয়া উক্ত অভিনন্দন ছাপাইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেন। এতদ্দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দন দিবার মূলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিজের দুর্দৈবের কথা জানাইয়া তাঁহার কৃপালাভের জন্য আর্তিযুক্ত হওয়ার পরিবর্তে জনসমাজে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করিয়া প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষাই প্রবল ছিল।

এইপ্রকার চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট অন্যাভিলাষিগণ শ্রীল আচার্যদেবের এইরূপ বাধাদানে আপত্তি উঠাইয়া বরাবর বলিত—"শ্রীল প্রভুপাদের সময় যাহাকে ভক্তি বলা হইত, এখন তাহাকে অভক্তি আখ্যা দেওয়া হইতেছে। মিশনের পারমার্থিক পত্র মিশনের শিষ্যগণের সম্পত্তি। সাধারণ সংবাদপত্রে যেরূপ সর্বসাধারণের নিজমত প্রকাশ করিবার অধিকার আছে, সেইরূপ মিশনের পারমার্থিক পত্রেও শ্রীল প্রভুপাদের পূজার নৈবেদ্যরূপ অভিনন্দনাদি প্রকাশ করিবার অধিকারও আমাদের আছে।"

তাহাদের এই অন্যাভিলাষের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া নিত্যমঙ্গলের উদ্দেশ্যে শ্রীল আচার্যদেব নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন—

"শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব বা তিরোভাব তিথি আসিয়া উপস্থিত; একটি অভিনন্দন না লিখিলে গতানুগতিক প্রথা রক্ষিত হইবে না। ইহা মনে করিয়া আমরা যখন কলম ধরিয়া বসি তখন আর কি লিখিব, মনের মধ্যে ত কোন ভাব আসিতেছে না,—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কষ্টকল্পনা করিয়া "শ্রীগুরুদেবের ন্যায় পরম দয়ালু কেহ নাই, তিনি কত মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেশ-বিদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম কত প্রচার করিয়াছেন, পারমার্থিক পত্রিকাদি ছাপাইয়া লোকের কত মঙ্গল করিয়াছেন"—এইরূপ অনুভূতিহীন শুষ্কবাক্যবিন্যাসপূর্ণ কয়েকটি শব্দ ছাপাইয়া তাহাতে 'অনুগত ভৃত্য' ইত্যাদি আখ্যা দিয়া নিজের নামপ্রচারের অভিসন্ধি কি শুদ্ধভক্তিপদবাচ্য ? ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেব সন্তুষ্ট হইবেন ত ? গতানুগতিকতার দ্বারা চালিত হইয়া যে প্রাণহীন অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা কস্মিন্‌কালে ভক্তিপদবাচ্য হইতে পারে না। এইরূপ অনুষ্ঠান কোটি জন্ম করিলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে না।

শ্রীগুরুদেবের উপদেশানুসারে যে আচরণ, সমগ্র জীবন নিয়মনের যে চেষ্টা, সমগ্র প্রাণ বলিদানের জন্য যে অকপট আর্তি, তাহার দ্বারাই শ্রীগুরুদেব ঠিক ঠিক অভিনন্দিত হইবেন। শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব বা তিরোভাব তিথিতে তাঁহার উপদেশ পালনে নিজের অযোগ্যতা তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়া উক্ত অযোগ্যতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে অনুক্ষণ ক্রন্দন করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আর্তিকুসুমাঞ্জলি অর্পণ করাই প্রকৃত অভিনন্দন। এই অভিনন্দনের দ্বারা শ্রীগুরুদেবের হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইবে এবং তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার হৃদয়স্থিত শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানাবেশ আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দিবেন। তখন আমাদের অজ্ঞাতসারেও বিনা চেষ্টায় আমাদের হৃদয় হইতে স্বসুখবাঞ্ছা দূর হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে স্বতঃ স্পৃহা জাত হইবে।

অবশ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অভিনন্দন প্রদানকে অভক্তি বলা হইতেছে না। সদা সচেতন থাকিয়া, অভাববোধে অভিনিবিষ্ট ও অন্তর্দাহে দগ্ধীভূত হইয়া আত্মনিবেদনসহকারে আচরণময় জীবনযাপনে ব্রতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জীবনীশক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে বলি দেওয়ার জন্য প্রবল আর্তিযুক্ত হইয়া তাঁহার অনুসরণের যে চেষ্টা, তাহাই প্রকৃত অভিনন্দন। ইহা না করিয়া আমার ন্যায় আচরণহীন, অন্তঃসারশূন্য, চেতনাহীন, নিশ্চিন্ত, নিশ্চল, কাঠপাথরের

অভিনন্দন কি অভিনন্দন না আত্মবঞ্চনা ? ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের অভিনন্দন ত হয়ই না, বরং তাঁহাকে নিজের ন্যায় প্রতিষ্ঠালোলুপ জ্ঞান করিয়া (অর্থাৎ আমাকে অভিনন্দন করিলে আমি যেরূপ প্রতিষ্ঠায় ফুলিয়া উঠি, শ্রীগুরুদেবও সেইরূপ হইতে থাকিবেন, এইরূপ জ্ঞান করিয়া) নিজের পশুত্বধর্ম তাঁহাতে আরোপ করিবার যে অপরাধময়ী চিত্তবৃত্তি তদ্দ্বারা নরকগমনের পথ পরিষ্কার করা হইতেছে।"

শ্রীগুরুপূজা-বিষয়ে শিক্ষা

শ্রীগুরুপূজা কি, তাহা শ্রীল আচার্যদেব তাঁহার আবির্ভাবতিথিতে উপস্থিত ভক্তগণকে নিজ-আচরণের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর ১০ তারিখ। ঐদিন শ্রীল আচার্যদেবের আবির্ভাব তিথি। গৌড়ীয় মিশনের সকল শাখামঠ হইতে আগত অগণিত মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্ত কলিকাতাস্থ বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে একত্রিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আনীত শ্রীগুরুপূজার নানা উপায়ন, স্তূপীকৃত পুষ্পসম্ভার ও পুষ্পমালিকার সহিত তাঁহারা নাটমন্দিরে শ্রীগুরুপূজার জন্য উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল আচার্যদেবের উপবেশনের জন্য নাটমন্দিরের একটি উচ্চ বেদীতে শ্রীব্যাসাসন রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি উক্ত শ্রীব্যাসাসনে না বসিয়া শ্রীমন্দিরে গিয়া প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যের শ্রীপাদপদ্মে ও তাহার পর শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে এক একটি পুষ্পমালিকা প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পূজা করিলেন। এদিকে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও সংকীর্তনে নাটমন্দির প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। শ্রীল আচার্যদেব জানাইলেন যে, যাঁহারা আজ শ্রীগুরুপূজার জন্য সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের অঞ্জলি তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া শ্রীগুরুপূজা করিবেন। আজ তাঁহারও শ্রীগুরুপূজার দিন। বৈষ্ণবগণ আজ তাঁহাকে শ্রীগুরুপূজার পরম সুযোগ দান করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া তিনি সকলকে নিজ নিজ হস্তে শ্রীগুরুপূজার অঞ্জলি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইলেন।

প্রথমে ত্রিদণ্ডীপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীল আচার্যদেবকে ফুলের মালা দিতে উদ্যত হইলে শ্রীল আচার্যদেব উক্ত মালাকে প্রণাম করিয়া হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তাহার পর প্রত্যেক সন্ন্যাসী এক একটি ফুলের মালা শ্রীল আচার্যদেবের হস্তে অর্পণ করিলেন। শ্রীল আচার্যদেব তাহাকে প্রণামপূর্বক গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলিরূপে প্রদান করিলেন এবং

প্রত্যেক বার শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যের নিকট পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিতে থাকিলেন। সকলের প্রদত্ত ফুলের মালা এইরূপভাবে নিজে গ্রহণ না করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যে তিনি অর্পণ করিলেন। পুরুষগণের অঞ্জলিপ্রদান শেষ হইয়া যাইবার পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত মহিলাভক্তগণ তাঁহাদের পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানে উদ্যত হইলে শ্রীল আচার্যদেব বিনীতভাবে বলিলেন—"মাতৃমণ্ডলী একটু দূরে থাকিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের হস্তে তাঁহাদের অঞ্জলি প্রদান করিলে তিনি আমার হস্তে উহা প্রদান করিবেন এবং আমি সেইগুলিকে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া শ্রীগুরুপূজা করিব।" তদনুসারে শ্রীল আচার্যদেব সমস্ত অঞ্জলি প্রত্যেকবার প্রণামপূর্বক গ্রহণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণান্তে তথায় পঞ্চাঙ্গ প্রণামদ্বারা শ্রীগুরুপূজার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই অঞ্জলিপ্রদান সেবা তিনঘণ্টারও অধিক সময় চলিতেছিল।

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে আগত শ্রীল আচার্যদেবের জনৈক শিষ্য তাঁহার পদযুগলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার আশায় সারাদিন উপবাসী ছিলেন এবং শ্রীল আচার্যদেবের পদযুগলে পুষ্পাঞ্জলি না দেওয়া পর্যন্ত তিনি কিছুতেই জলগ্রহণ করিবেন না বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল আচার্যদেব তাঁহাকে বলিলেন—"শ্রীগুরুপূজার উপায়ন হস্তে গ্রহণ করিবার অধিকার মাত্র আমার আছে। আমি মধ্যপথে শ্রীগুরুসেবার উপায়ন নিজে আত্মসাৎ করিতে পারি না। আপনারা সকলে আমার শ্রীগুরুপূজার উপায়ন।" সেই ভক্তের চিত্ত তাঁহার এই কথাতে তৃপ্ত হইল না। দীক্ষাগুরুর পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়া নিজের সংকল্প রক্ষা করিবেনই, সেই উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদজী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের দ্বারা শ্রীল আচার্যদেবের নিকট তাঁহার প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত অনুরোধ শ্রীল আচার্যদেব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে উক্ত শিষ্য নিজ-সংকল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (গৌড়ীয় ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা)।

এইরূপে তিনি নিজেকে গুরু বলিয়া অভিমান না করিয়া তাঁহার পূজার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলি নিজে গ্রহণ করিবার পরিবর্তে নিজ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রদানের দ্বারা যে মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই জগতে বিরল।

শ্রীগুরুবর্গের প্রতি অভিনিবেশ-বিষয়ে উপদেশ

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে উর্জব্রতের সময় শ্রীমথুরায় শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদজী নিজের স্থায়ী মঙ্গললাভ কিরূপে হইবে, সেই বিষয়ে শ্রীল আচার্যদেবকে পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে শ্রীল আচার্যদেব নিম্নোক্ত উপদেশ দিয়াছিলেন—

"অভিনিবেশ না হইলে স্থায়ী মঙ্গল হইবে না। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীনাম-গুণ-লীলা-চরিতাদিতে অভিনিবেশ আবশ্যক। এই অভিনিবেশ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে বাস্তব (positive) মঙ্গল লাভ হইবে। অভিনিবেশই অর্থপ্রবৃত্তি। অর্থপ্রবৃত্তি হইলে আনুষঙ্গিকভাবে অনর্থনিবৃত্তি হইয়া যাইবে।"

শ্রীল আচার্যদেবের উপরোক্ত উপদেশ হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, শ্রীগুরুবর্গের সেবাদর্শের প্রতি অভিনিবেশ হইলেই তাঁহাদের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিনিবেশ স্বতঃ উদিত হইবে। সেই হেতু সমস্তপ্রকার চেষ্টা করিয়া শ্রীগুরুদেবকে সন্তুষ্ট করা ভক্তিসাধকের সর্বাদৌ বিধেয় বলিয়া শ্রীল জীবপাদ বলিয়াছেন—

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥"

(শ্রীভ: স: ২৩৭ অনু:)

অর্থাৎ শ্রীহরি অসন্তুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব রক্ষা করিবেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেব অসন্তুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। তজ্জন্য সর্ববিধ প্রযত্নদ্বারা শ্রীগুরুদেবকে সন্তুষ্ট করা উচিত। অতএব ভক্তিসাধকের নিজের জীবননির্বাহ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধনাঙ্গ পর্য্যন্ত যাবতীয় কার্য শ্রীগুরুদেবের উপদেশের অনুসরণে তাঁহার সন্তোষবিধানের উদ্দেশ্যেই করা উচিত।

অনুক্ষণ অভীষ্টদেবের নাম-গুণ-চরিতাদির অনুশীলনে চিত্তকে নিযুক্ত রাখিয়া ও **তাঁহার অনুরাগী জনের অনুগামী হইয়া** জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই সমস্ত উপদেশের সার। অভীষ্টদেবের অনুরাগী জন হইলেন শ্রীগুরুবর্গ। অভীষ্টদেবের সেবায় তাঁহাদের অভিনিবেশের কথা সর্বদা আলোচনা করা প্রয়োজন। অনুক্ষণ অকপট হৃদয়ে ইষ্টসেবাবেশিত চিত্তে শ্রীগুরুবর্গের নাম-গুণ-চরিতাদির আলোচনার ফলে তাঁহাদের প্রতি অভিনিবেশ স্বতঃই উদিত হইবে। তাঁহাদের মহিমার আলোচনার দ্বারা তাঁহাদের সঙ্গ হইবে এবং সঙ্গ হইতে অভিনিবেশ হইবে। যেখানে অনুক্ষণ শ্রীগুরুবর্গের নাম-গুণ-চরিতাদির আলোচনা নাই, সেখানে তাঁহাদের প্রতি অভিনিবেশ আসা অসম্ভব।

জীবের প্রতি শ্রীগুরুদেবের অযাচিত কৃপার কথা অকপট হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে তাঁহার প্রতি চিত্ত স্বতঃ আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহার সেবাদর্শের অনুসরণে লোভ জাত হইবে। তবেই তাঁহার প্রতি অভিনিবেশ স্থায়ী হইতে পারিবে। নিজের শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও যে অকপট ও সেবোন্মুখ হইবে অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে আচরণে প্রতিফলিত করিতে যত্নবান্ হইবে, পরমকরুণাময় হীনার্থাধিকসাধক শ্রীগুরুদেব (এই মর্ত্যে প্রকট না থাকিলেও) কোন না কোন ছলে তাহাকে সঙ্গদান করিবেন। তাঁহার এই সঙ্গদানদ্বারা তাঁহার প্রতি অভিনিবেশ গাঢ়তর হইবে।

শ্রীগুরুবর্গের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথিসমূহও তাঁহাদের প্রতি অভিনিবেশের জনক। অন্যাভিলাষরহিত বৈষ্ণবগণের সঙ্গে শ্রীগুরুবর্গের নাম-গুণ-চরিতাদি আলোচনাপূর্বক উক্ত তিথিসমূহ আগ্রহসহকারে পালন করিলে তাঁহাদের প্রতি অভিনিবেশ অধিক সহজ ও তীব্র হয়। কারণ তাঁহাদের গুণকীর্তনের দ্বারা তাঁহাদের বিরহবোধ হৃদয়ে জাগ্রত হয়। ফলে তাঁহাদের সঙ্গলাভের জন্য আর্তিজনিত প্রার্থনা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া তাঁহাদের প্রতি গাঢ় অভিনিবেশযুক্ত করায়। সুতরাং খুব আদর ও যত্নসহকারে শ্রীগুরুবর্গের গুণাবলী আলোচনাপূর্বক তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি পালন করা ভক্তিসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ।

মন্দিরাদিতে নিজ-নামাঙ্কন

সেই সময় যাঁহারা অর্থাদি দান করিয়া মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিতেন কিম্বা যাঁহারা ভিক্ষাদ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া মন্দিরাদি নির্মাণ করিতেন, প্রস্তরফলকে তাঁহাদের নাম অঙ্কিত করিয়া সেই মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন করা হইত। শ্রীল আচার্যদেব ইহা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া বলিলেন—"লোকটি তাহার উপার্জিত সমস্ত অর্থ দিয়া বা বহু শ্রমস্বীকারপূর্বক ভিক্ষা করিয়া মন্দিরটি নির্মাণ করাইল, অথচ তাহার ফল শ্রীবিষ্ণুকে অর্পিত হইল না। সে নিজেরই প্রতিষ্ঠা আকারে তাহা আত্মসাৎ করায় উহা ভক্তির পরিবর্তে পুণ্যকর্মই হইয়া গেল। ইহার ফলে তাহার সংসারবন্ধন বাড়িল। সে যদি প্রতিষ্ঠালাভের আশায় নামফলক না লাগাইয়া কেবল শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে স্বীয় মন্দির নির্মাণের ফল অর্পণ করিত, তাহা হইলে সে রজস্তমোগুণমুক্ত হইয়া মহৎকৃপাবরণের যোগ্য হইত এবং মহৎকৃপার ফলেই সে কর্মাধিকার হইতে ভক্ত্যধিকারে উন্নীত হইত। কিন্তু ইহার পরিবর্তে সে এত উদ্যম করিয়া ভক্তি-বিচারে যাহা কিছু করিল তাহা কেবল পুণ্যকর্মেই পরিণত হইয়া গেল। পুণ্যকর্ম ত ভক্তির পরিপন্থী।

কারণ ইহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধির পরিবর্তে সংসারবন্ধনই বৃদ্ধি হইবে।" এইরূপ প্রতিষ্ঠালাভের আশা পোষণ না করিয়া কেবল শ্রীবিষ্ণুর প্রীতি উদ্দেশ্যেই কর্মার্পণ করিতে তিনি সর্বক্ষণ সকলকে উপদেশ দিতেন।

এসম্পর্কে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল ২৪ তারিখে শ্রীজগবন্ধু দাসের নিকট প্রেরিত তাঁহার পত্রের বিষয়বস্তু নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"শ্রীল সাগর মহারাজের সমাধির উপরে একটি ঘর তৈয়ারী করিয়াছ জানিলাম। কিন্তু তাহাতে নিজের নাম লিখিয়া যে প্রস্তরফলক লাগাইয়াছ, এই পত্র পাওয়া মাত্রই উহা খুলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিবে।

শ্রীপাট ভগবদ্ধাম। তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে চেষ্টা করিলে সর্বনাশ হইবে। শ্রীগোপীনাথের সেবকভাবে রহিবার আর্তি থাকিলে সেই শ্রীগোপীনাথই রক্ষা করিবেন, নচেৎ বিষয়িগণের পরামর্শে বা নিজের বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া ফলক লাগাইয়া শ্রীপাটের স্বত্বাধিকার নিজের জন্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলে সেই শ্রীগোপীনাথই অনতিবিলম্বে তাঁহার ধাম হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবেন। তাই সাবধান! বিষয়বুদ্ধি ও প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত হইয়া শ্রীগোপীনাথের কৃপারূপ নিজের পারমার্থিক যোগ্যতা হারাইতে চেষ্টা করিবে না। তোমাকে তোমার নাম লিখিয়া ফলক লাগাইতে যে পরামর্শ দিয়াছে, সে তোমার পরম শত্রু—এই বুদ্ধি যদি হয়, তবে বাঁচিতে পারিবে। সেই কুপরামর্শদাতা হইতে সর্বদা দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে।" *

কর্মার্পণের জন্য উপদেশের তাৎপর্য

শ্রীল আচার্যদেব সবসময় সকলকে কর্মার্পণ করিতে বলায় তাহা অনেকের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হইত না। কারণ তাহারা মনে করিত যে, তাহারা ত ভক্তি করিতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে কর্মার্পণের জন্য উপদেশ দেওয়ার যথার্থতা কী? তাই তাঁহার সেই উপদেশ নিম্নাধিকারীর প্রতি প্রযোজ্য, তাহাদের প্রতি নহে, ইহা মনে করিয়া তাহারা উহা গ্রহণ করিতে অন্তরে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল।

---

* শ্রীল সাগর মহারাজ যেসময় শ্রীনবদ্বীপ ধামস্থ মামগাছিতে শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ ও শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালের সেবা করিবার উদ্দেশ্যে মিশন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেসময় শ্রীল আচার্যদেব শ্রীজগবন্ধু দাস নামক জনৈক উৎকলবাসী ব্রহ্মচারীকে সেবায় সহায়তা করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। মামগাছিতে ৩।৪ বৎসর উক্ত শ্রীবিগ্রহগণের সেবা করিবার পর শ্রীল মহারাজ অপ্রকট হইয়া গেলেন। তাহার পর শ্রীজগবন্ধু দাসজী তথায় তাঁহার সমাধি দিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় যাহারা তাঁহার উপদেশের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, কর্মার্পণই যে তাহাদের অধিকারোচিত সাধন, তাহা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাতে ব্রতী হইয়াছিল।

স্ব-স্ব অধিকারসম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা না থাকায় তিনি শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার অনুগত কি মঠবাসী, কি গৃহস্থ,—সকলকেই নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি কখনও তাঁহার নিজের কোন মতবাদ প্রচার করেন নাই কিম্বা সেইরূপ করিবার অভিপ্রায়ও তাঁহার ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গোস্বামিগণ যাহা আচরণ করিয়া গিয়াছেন ও যেসমস্ত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের কিঙ্করসূত্রে কেবল তাহারই অনুকীর্তন করিয়াছেন মাত্র। বিশেষভাবে শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর শিক্ষাকেই নিজে আচরণ করিয়া তিনি সকলকে উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৬৯তম অনুচ্ছেদ হইতে "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ.... তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।" শ্লোকের টীকা হইতে—"ইতি নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা ভগবতি তদ্‌বিষয়িকা অদ্ধা সাক্ষাদ্রূপা, ন তু কর্মাদ্যর্পণরূপা পারম্পরিকী ভক্তিরিয়ম্, তত্রাপি শ্রীবিষ্ণাবেবার্পিতা তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা, ন তু ধর্মার্থাদিষ্বর্পিতা, এবংভূতা চেৎ ক্রিয়তে তদা তেন কর্ত্রা যদধীতং তদুত্তমং মন্য ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিঃ (পৃঃ ১৮)—'ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্যম্' ইতি।" এই উক্তি উদ্ধার করিয়া তিনি ইহার মর্ম নিম্নমতে বুঝাইয়াছেন—"শ্রবণকীর্তনাদি নবধা ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম-অর্থাদিলাভরূপ নিজ-স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহাকে শ্রীভগবানে অর্পণ করা সকাম বা সকৈতব কর্মার্পণ। শুদ্ধভক্তি কিন্তু এইরূপ সকৈতব কর্মার্পণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। 'এই নবধা ভক্তি শ্রীভগবানেরই সুখকর কার্য এবং ইহার অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি সাক্ষাদ্ভাবে সুখী হইবেন'—প্রথমে হৃদয়ে এইরূপ চিন্তা পোষণ করিয়া পরে যে ভক্তি করা যায় তাহাই শুদ্ধভক্তিপদবাচ্য। এস্থানে শ্রীভগবানের সুখবিধানবাসনাই ভক্তির প্রেরক। নিজসুখবাসনার লেশমাত্র এস্থানে নাই। এই নিঃস্বার্থ বা নিষ্কাম ভক্ত্যনুষ্ঠানই 'শ্রবণং কীর্তনং....' (ভা: ৭।৫।২৩-২৪) শ্লোকের তাৎপর্য্য। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি(পৃঃ ১৮)তে উক্ত হইয়াছে—শ্রীভগবানের ভজনই ভক্তি। ভক্তীতর ঐহিক ও পারলৌকিক সুখবাসনা না রাখিয়া শ্রীভগবানে মনোনিবেশই এই ভজন এবং ইহাই নৈষ্কর্ম্য।"

ইহা হইতে স্পষ্ট জানা গেল যে, ভক্ত্যনুষ্ঠানের সময় 'ইহা শ্রীভগবানের সুখাবহ কার্য্য এবং ইহার দ্বারা তিনি খুব সুখী হইবেন'—প্রথমে এই বাসনাদ্বারা

চালিত হইয়া পরে যে ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই শুদ্ধভক্তিপদবাচ্য। এই ইষ্টপ্রীতিবাঞ্ছা যেস্থানে ভক্তির প্রেরক নহে, তথায় নিশ্চিতরূপে নিজ-স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভক্তি করা হইতেছে জানিতে হইবে। এইপ্রকার ইষ্টপ্রীতিবাঞ্ছাহীন ভক্তির অনুষ্ঠান যে শুদ্ধভক্তি নহে, পুণ্যকর্মবিশেষ—ইহা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীল জীবপাদ এখানে "ন তু **কর্মাদ্যর্পণরূপা** পারম্পরিকী ভক্তিরিয়ং, তত্রাপি **শ্রীবিষ্ণাবেবার্পিতা** তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা, ন তু **ধর্মার্থাদিষ্বর্পিতা**" কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা তিনি ভক্তির অনুষ্ঠান অপেক্ষা ভক্তিযাজীর উদ্দেশ্যের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কারণ বাহিরে ভক্তির আকার থাকিলেও উদ্দেশ্যভেদে ইহা কোন সময়ে ভক্তি ও কোন সময়ে কর্ম হইয়া যায়।

শ্রীল জীবপাদের এই উক্তিকে পুনঃ পুনঃ উদ্ধার করিয়া প্রত্যেক ভক্তিসাধকের হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির যথার্থ ধারণা সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁহার যে কিরূপ ব্যাকুলতা ছিল, তাহা তাঁহার হরিকথা-শ্রবণকারী ব্যক্তিমাত্রে অবশ্যই অনুভব করিয়াছেন। কেবল কথায় নহে, ব্যক্তিগত আচরণের মধ্যেও তিনি তাঁহার এই উপদেশকে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক ভক্তিসাধকের আচরণে ইহা প্রতিফলিত হউক, ইহাই তাঁহার সমস্ত উপদেশ ও আচরণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

তাঁহার এইসব উপদেশ শুনিয়া অনেকে মনে মনে ভাবিলেন—"শ্রীল আচার্যদেব ভক্তিসম্বন্ধে যেসমস্ত উপদেশ দিতেছেন আমাদের ত সেসব ঠিকভাবে পালিত হইতেছে। কারণ ভজনের সময় আমরা শ্রীভগবানের সুখবাসনা ব্যতীত অন্য কোন বাসনা পোষণ করিতেছি না; শ্রীহরিনামের প্রতিও আমাদের যথেষ্ট রুচি আছে। অতএব আমরা শুদ্ধভক্ত।" তাঁহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য শ্রীল আচার্যদেব বলিতেন যে, প্রাকৃত ভূমিকায় জীব শ্রীভগবানকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে ভক্তি করিতেছে বলিয়া ভাবিলেও তাহার এই ভগবৎসুখচিন্তা শুদ্ধ নহে। কারণ তাহার ইন্দ্রিয় প্রাকৃত, কিন্তু ভক্তি হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি হওয়ায় উহা অপ্রাকৃত। প্রাকৃত মনে যে ভগবৎসুখচিন্তা তাহা সগুণা বা প্রাকৃত। এই সগুণা চিন্তা নির্গুণা ভক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে। এসম্পর্কে শ্রীল জীবপাদের নিম্নোক্তি আলোচনীয়—"তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমাণা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি।" (শ্রীপ্রী: স: ৬৫) অর্থাৎ শ্রীভগবানের দ্বারা তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির কোন এক সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি কেবল ভক্তগণের প্রতি অহরহ নিক্ষিপ্ত হইয়া ভগবৎপ্রীতিরূপে অবস্থান করিতেছে।

অতএব ইহা অনুভব করিয়া শ্রীভগবান্‌ও ভক্তগণের প্রতি অতিশয় প্রীতিমান্ হন। ইহার দ্বারা ভগবৎপ্রীতিরূপা ভক্তি যে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি, তাহা শ্রীল জীবপাদ এস্থানে স্পষ্টরূপে নির্ধারণ করিলেন। জীব 'পরমাত্মবৈভব' অর্থাৎ পরমাত্মার দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায় তাহার হৃদয়ে স্বরূপশক্তির অবস্থিতি নাই। তজ্জন্য তাহার হৃদয়ে স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী-বৃত্তির অভাব। যেপর্যন্ত জীবহৃদয়ে এই হ্লাদিনী-বৃত্তি প্রবেশ করে নাই, সেপর্যন্ত তাহার ভক্তি করিবার অধিকার হইবে না। তজ্জন্য শ্রীভগবান্ স্বীয় হ্লাদিনীশক্তিকে প্রত্যেক জীবহৃদয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু জীবহৃদয় রজস্তমোগুণদ্বারা আবৃত হওয়ায় হ্লাদিনীশক্তি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। এই রজস্তমোগুণতাড়িত কর্মাধিকারী জীবগণকে ভক্ত্যধিকারে উন্নীত করাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রীভগবান্ হ্লাদিনীশক্তির দূত—সাধুগণকে এই জগতে পাঠাইয়া থাকেন। তাঁহাদের সংসর্গ হইতে ও তাঁহাদের শ্রীমুখে ভগবৎকথা শ্রবণের ফলে কর্মাধিকারী জীব ভক্তির প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এই কর্মাধিকারে সাধকের অনুষ্ঠিত তথাকথিত ভক্তি বাহিরে ভক্তির ন্যায় দেখা গেলেও তাহা শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তি নহে, সগুণা কর্মমিশ্রা ভক্তিমাত্র। কারণ এস্থলে হ্লাদিনীশক্তির পরিবর্তে জীবের রজস্তমোগুণাক্রান্ত প্রাকৃত মনই এই ভক্তির প্রবর্তক হইয়া থাকে। তজ্জন্য ইহাতে জীবের কর্তৃত্বাভিমান নিহিত থাকে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ইহা তমোগুণপ্রধান প্রবৃত্তি হইতে জাত হইয়া থাকিলে ইহাকে 'তামসী' রজোগুণপ্রধান প্রবৃত্তি হইতে জাত হইয়া থাকিলে 'রাজসী' ও সত্ত্বগুণপ্রধান প্রবৃত্তি হইতে জাত হইয়া থাকিলে 'সাত্ত্বিকী' ভক্তি বলা হয়। এই গুণীভূতা কর্মমিশ্রা ভক্তিকে শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে 'ভক্ত্যাভাস' আখ্যা দিয়াছেন।

এই কর্মমিশ্রা ভক্তি বা কর্মার্পণ তিনপ্রকার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; যথা—(১) কাম্য কর্মের ফললাভ, (২) কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ এবং (৩) শ্রীভগবানের অহৈতুকী সেবালাভ। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর মতে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার ভক্তি 'সকৈতবা' এবং কেবল তৃতীয় প্রকার ভক্তিই 'অকৈতবা'। যাহাদের পূর্ব যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপারূপ ভাগ্য আছে তাহারা ভগবদিচ্ছায় যখন দ্বিতীয়বার সাধুসঙ্গ লাভ করে তখন সেই সাধুর কৃপায়ই অকৈতবা কর্মমিশ্রা ভক্তি বা ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণের যোগ্য হয়। মহতের সংসর্গ ও তাঁহাদের কৃপাপ্রভাবে তাহাদের হৃদয়ে শ্রীভগবানের সুখবিধানবাসনার উদ্রেক হইলেও এই বাসনা তাহার হৃদয়স্থ রজস্তমোগুণমিশ্রা হওয়ায় প্রীণনাভাসে পরিণত হইয়া যায়। পূর্ব মহৎকৃপারূপ ভাগ্যের উদয় হেতু তাহার এই অযোগ্যতা সে উপলব্ধি করিয়া মহৎকৃপাবলে কিরূপে এই রজস্তমোগুণরূপ ভক্তিলাভের অন্তরায়কে হৃদয়

হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করিবে তজ্জন্য ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক এইরূপ কর্মার্পণ করিতে থাকে। এই কর্মার্পণ বা অকৈতবা কর্মমিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠানদ্বারা চিত্ত হইতে রজস্তমোগুণ ক্রমশঃ দূর হইলে তাহাতে হ্লাদিনীশক্তি প্রবেশ করেন এবং জীবের ইন্দ্রিয়কে স্বীয় তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাইয়া তাহাকে ভক্তি করিবার প্রেরণা দেন। অর্থাৎ **হ্লাদিনীশক্তি জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করা মাত্রই শ্রীভগবানের প্রতি তাহার মমতা জাত হয় এবং সেই মমতাই তাহাকে শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে ভক্তি করিতে অনুপ্রাণিত করায়।** ইহাকেই জাতরতি ভূমিকা বলা যায়। এই ভূমিকা হইতেই 'সাধন ভক্তি'র আরম্ভ।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে শ্রীভগবানের ইচ্ছাই যে সাধনভক্তির মূল, ইহা স্পষ্টরূপে জানা গেল। তজ্জন্য বলা যায়, "শ্রীভগবানই শ্রীভগবানকে ভক্তি করেন। জীব কেবল নিমিত্ত মাত্র।" জীব কখনও নিজচেষ্টায় ভক্তি করিতে পারে না।

এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ হয় ত' মনে করিতে পারেন যে, যদি জীবের চেষ্টায় ভক্তি হইবে না, তবে জীব নিশ্চিন্তে সংসারভোগ করুক। যখন হ্লাদিনী শক্তির কৃপা হইবে, তখন ভক্তি লাভ হইবে। এইরূপ বিচার নিপট নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কারণ কৃপালাভের জন্য তীব্র অভাববোধ হইতে যাহার হৃদয় দৈন্যে বিগলিত হয়, সেইই কৃপালাভের অধিকারী। সুতরাং প্রাকৃত ভূমিকায় বা কর্মমিশ্র অধিকারে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্মার্পণ করিতে করিতে মহৎকৃপা লাভের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করা আবশ্যক। এই প্রার্থনার ফলে হৃদয় অপরাধমুক্ত হইয়া দৈন্যবিগলিত হয় এবং চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হয়। এই অশ্রুই ইষ্টদেবের কৃপাদৃষ্টি-আকর্ষণের পরম সহায়ক হইয়া থাকে। **সুতরাং কর্মার্পণ ভক্তিলাভের সাক্ষাৎ কারণ নহে। ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণদ্বারা হৃদয় দৈন্যবিগলিত হইলে চক্ষু হইতে যে অশ্রু নির্গত হয়, তাহাই হ্লাদিনীশক্তির কৃপাদৃষ্টি-আকর্ষণের সহায়ক হইয়া থাকে। এই হ্লাদিনীশক্তির কৃপাই ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ।**

শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্মার্পণ না করিয়া সকৈতবা (তামসী ও রাজসী) ভক্তিদ্বারা যেখানে কর্মফল আত্মসাৎ করিবার কপট চেষ্টা চলিতে থাকে, তথায় দৈন্যের পরিবর্তে নিজের ভক্তি হইতেছে বলিয়া দম্ভই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই দম্ভের ফলে সাধক নিজেকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করিয়া পরের নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়। পরনিন্দা করিতে করিতে বৈষ্ণবনিন্দাও হইয়া যায়। এই

বৈষ্ণবনিন্দারূপ দুরন্ত অপরাধ তাহাকে ভক্তিপথ হইতে চ্যুত করিয়া দেয়। অতএব হৃদয়ে কোন স্বার্থসিদ্ধির বাসনা না রাখিয়া কেবল ইষ্টদেবের কৃপালাভের আশায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া কর্মাপর্ণ করাই প্রাকৃত ভূমিকায় ভক্তিকামী সাধকের একমাত্র অধিকারোচিত সাধন। **কর্মার্পণের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যদি হৃদয় বিগলিত না হইল, চক্ষুতে অশ্রুর উদ্‌গম না হইল, তবে জানিতে হইবে যে কর্মার্পণ যথারীতি হইতেছে না, কর্মফলকে আত্মসাৎই করা হইতেছে।** সুতরাং সাধক ভজনপথে অগ্রগতি করিতেছে কি না, তাহা অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজেই নিজেকে সমীক্ষা করিলে জানিতে পারিবে। এইসব তথ্য প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিয়া শ্রীল আচার্যদেব মাদৃশ কর্মাধিকারী তথা রজস্তমোগুণাক্রান্ত সাধককে মহৎকৃপা লাভার্থ কর্মার্পণ করিতে আদেশ দিলেন। ইহা আমাদের প্রতি তাঁহার বিশেষ কৃপা। তিনি এইরূপ অধিকারোচিত উপদেশ না দিলে আমাদের শুদ্ধভক্তি হইতেছে মনে করিয়া আমরা বৃথা অহংকারে মজিয়া নিশ্চিতরূপে বিপথগামী হইতাম। সুতরাং কর্মার্পণ করিতে আমাদের প্রতি তাঁহার যে উপদেশ, তাহা যে আমাদের অধিকারোচিত এবং যথার্থ, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

অকপট অশ্রুর প্রতি গুরুত্ব আরোপ

"শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহাবদান্যতার ও সাধকের পরম শোচ্যতমতার কথা স্মৃতিপটে উদিত হইয়া যেপর্যন্ত হৃদয়কে বিগলিত না করিয়াছে, সেপর্যন্ত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তির প্রকাশ একান্ত অসম্ভব।"—এই কথা শ্রীল আচার্যদেব সর্বদা গুরুগম্ভীর স্বরে প্রত্যেক সাধনানুরাগী ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে শুনা গিয়াছে। ভগবদ্‌বিমুখ জীব মায়ার কোলে মোহনিদ্রায় সুপ্ত থাকিয়া সতত স্বসুখ-স্বপ্নাবিষ্ট থাকে। সেই অবস্থায় তাহার দেহসুখের প্রতি শত ধিক্কার-প্রবৃত্তির উদয় করাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ে দীনতাদেবীর অতিমর্ত্য আবির্ভাবের দ্বারা তথা হইতে দম্ভদৈত্যের বিতাড়ন-কৌশল-শিক্ষা এবং সর্বদা আর্তির জন্য অন্তর্দাহ উদ্রেক করাইবার প্রেরণাদান তাঁহার আচার্যত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। "পূর্বাচার্য্যবৃন্দের যাবতীয় শিক্ষা ও আচরণে দৈন্যের যে সমবেত ঝঙ্কার বিদ্যমান তাহা বাহিরে কেবল আচরণহীন পরোপদেশে পাণ্ডিত্য জাহিরপূর্বক অন্তরে ও কার্য্যে দম্ভদৈত্যের দাসত্ববরণের জন্য উদ্দিষ্ট নহে"—শ্রীল আচার্যদেব শতজিহ্ব হইয়া প্রত্যেক সাধকের কর্ণে এই জাগরণের মন্ত্র ঝঙ্কৃত করিয়াছিলেন। "বাস্তব দৈন্যের অবিরাম উত্তপ্ত অশ্রুধারায় জন্মজন্মান্তরের অপরাধকঠিন হৃদয়-পাষাণকে ক্ষয় করিয়া দিতে হইবে, গলাইয়া দিতে হইবে"—এই বিচারের অগ্নিমন্ত্রে

অকপট সাধকসমাজকে দীক্ষিত করাইবার সুদৃঢ় সংকল্প লইয়া সত্য সত্যই যেন তিনি এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বাস্তবক্ষেত্রে অকপট অশ্রুই যে ইষ্টদেবের কৃপালাভের একমাত্র উপায়, ইহা তিনি বহু উদাহরণ দিয়া সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেস্থানে দৈন্যের আধিক্য সেই স্থানেই কৃপা অধিক উচ্ছলিতা। শ্রীল জীবপাদের এই উক্তি তিনি পুনঃ পুনঃ উদ্ধার করিয়া সকলকে দৈন্যযুক্ত হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"নিজের দুর্দৈবের কথা চিন্তা করিতে করিতে নিরন্তর শ্রীহরিনাম কীর্তন করিয়া ক্রন্দন করিতে হইবে।" নিজ দুর্দৈবচিন্তায় হৃদয় বিগলিত হইলে চক্ষু হইতে যে অশ্রু নির্গত হয়, তাহাই অকপট অশ্রু। চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছে, অথচ হৃদয় বিগলিত হয় নাই, তবে সেই অশ্রু অকপট-অশ্রু-পদবাচ্য নহে। অর্পণ ঠিকভাবে হইলে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিতরূপে চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইবে। যেখানে অর্পণ না করিয়া কর্মফল আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা থাকিবে, সেখানে দৈন্যের পরিবর্তে দম্ভই প্রবল হইবে। সেইরূপ অবস্থায় ক্রন্দনের প্রশ্নই উঠে না। অর্পণপ্রভাবে হৃদয় হইতে রজস্তমোগুণ যতই দূর হইবে, ততই দৈন্য জাত হইয়া হৃদয়কে বিগলিত করিবে এবং চক্ষু হইতে অকপট অশ্রু নির্গত হইবে। কি সাধন, কি সিদ্ধি সব ভূমিকায় অশ্রুর মূল্য অনির্বচনীয়। **নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিরও নিজ-অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি হেতু হৃদয় মথিত হইয়া চক্ষু হইতে যে অশ্রুগঙ্গার প্রবাহ নির্গত হয়, তাহার একটি কণা যেরূপ শ্রীহরির প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে, শত-সহস্র সাধন, বৈরাগ্য ও সদাচারাদি পালন সেরূপ করিতে পারে না**। সুতরাং কাহার সাধনে কত অগ্রগতি হইয়াছে, তাহা জানিবার একমাত্র কষ্টিপাথর হইতেছে তাহার অযোগ্যতার অনুভূতি হইতে জাত একবিন্দু অশ্রু। নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও যাহার তাদৃশ অনুভূতি নাই, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি নাই, তাহার চক্ষু হইতে কখনও অশ্রু নির্গত হইবে না। হয় ত' সে খুব নির্বেদগ্রস্ত হইয়া ম্লানমুখে অবস্থান করিতে পারে কিংবা নিজের দুর্দশা-দর্শনে শুভেচ্ছামাত্র পোষণ করিয়া দুই-একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে পারে, কিন্তু **অর্পণ-প্রভাবে হৃদয় অপরাধমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই অকপট অশ্রুর উদগম হইবে না**। হৃদয় হইতে অপরাধ যতই দূর হইতে থাকিবে, ততই ইষ্টদেবের পরমোদারতা ও নিজের অযোগ্যতমতা অনুভূত হইয়া চক্ষু হইতে অশ্রুপ্রবাহ নির্গত হইবে। এই তিনটি (ইষ্টদেবের পরমোদারতা ও সেবকের

অযোগ্যতার অনুভূতি এবং তাঁহার সেবার একমাত্র উপকরণ অশ্রু)র যেস্থানে সংযোগ, সেই স্থানেই মহাবদান্য শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজন সম্ভব। পরমকরুণ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ দেখিলেন যে, কলিহত জীবের পক্ষে জড়াভিমান, জড়াভিনিবেশ ও জন্মজন্মান্তরের অপরাধপুঞ্জ হইতে মুক্ত হইয়া হরিভজন করিবার আশা নাই। এইজন্য নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিও যাহা সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবে, সেই অযোগ্যতার অনুভূতিকে তথা অভীষ্টদেবের ঔদার্য্যগুণের স্মৃতিজনিত পুলক ও অশ্রুকেই পরম উদার দুই প্রভু মঙ্গললাভের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিলেন। অতএব অশ্রুবিন্দুই দুইপ্রভুর শ্রীচরণার্চনের অদ্বিতীয় অনবদ্য উপকরণ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করিয়া আর্ত বিষয়ীর বিষয়বাসনা দূর না করিলে শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত বিমলভজনের অধিকার পাওয়া যাইবে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগ সম্প্রদায়ের ভজনে এই অশ্রুরই প্রাধান্য সর্বত্র দেখা যায়। তাই শ্রীল আচার্যদেব এই অশ্রুর উপরে সর্বদা প্রাধান্য আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অনেক বার বলিতে শুনা গিয়াছে—"যদি অপরাধকঠিন হৃদয়ে ক্রন্দন না আসিতেছে, তবে ক্রন্দন আসিতেছে না কেন, এই বলিয়া ব্যথিত হইয়া ক্রন্দন কর। ক্রন্দন ছাড়া গতি নাই—কৃপালাভের অন্য পন্থাও নাই।"

ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিউদ্রেককারী

সাধনের অতি প্রাথমিক অবস্থা হইতে প্রত্যেক ভক্তিসাধকের হৃদয়ে আরাধ্যদেবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি কিরূপে জাগ্রত করা যাইতে পারে, তাহাই ছিল শ্রীল আচার্যদেবের শিক্ষার মূলমন্ত্র। শ্রীল জীবপাদের "ভক্তৌ পুনঃ প্রীণনমেব ভক্তেস্তদেকজীবনত্বাৎ (শ্রীভ: স: ২২৩ অনু:)। অর্থাৎ ভক্তিতে ভগবৎ-সুখানুসন্ধানই মুখ্য উদ্দেশ্য যেহেতু তাহাই ভক্তির জীবনস্বরূপ। এই উক্তিকে ভিত্তি করিয়া তিনি প্রত্যেক সাধককে ইষ্টসুখানুসন্ধানের জন্য সর্বাধিক প্রযত্ন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অন্যাভিলাষিতা হইতে সর্বদা নিজেকে দূরে রাখিয়া হৃদয়ে কিভাবে ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি জাগ্রত করা যাইতে পারিবে, তাহা তিনি নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ আচরণ দেখামাত্রই নিতান্ত অযোগ্য রজস্তমোগুণাক্রান্ত জীবের হৃদয়েও ইষ্টদেবের সুখানু-সন্ধানের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভগবদ্‌বিমুখ জীবের হৃদয়ে ইষ্টসুখানুসন্ধানস্মৃতি জাগ্রত করানোই তাঁহার আচার্যত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানে তাঁহার যে অবিচলিত আবেশ ও অভিনিবেশ ছিল,

তাহা প্রত্যেক নিষ্কপট সাধকের হৃদয়ে যে গভীর রেখাপাত করিয়াছে, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে কোন সাধক অন্যাভিলাষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গেলে তিনি ব্যথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে সতর্ক করাইয়া ইষ্টদেবের সুখচিন্তা যেরূপে সর্বদা তাহার হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ শিক্ষা দিতেন। তিনি কখনও পরিমাণের পক্ষপাতী ছিলেন না, সর্বদা গুণের পক্ষপাতীই ছিলেন। কম হউক না কেন ভক্তির যতটুকু অনুষ্ঠান করা যাইবে, তাহা ইষ্টদেবের প্রীতির জন্য উদ্দিষ্ট হউক, ইহা তিনি বারবার শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন—"আমার বহু শিষ্যের প্রয়োজন নাই; ইষ্টদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যে যে নিজের সমস্ত স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে বলি দিতে পারিবে, সেইরূপ একটি শিষ্যই আমার যথেষ্ট।"

এই কথা হইতে শ্রীল আচার্যদেবের ইষ্টদেবের প্রতি কিরূপ অবিচলিত আবেশ ছিল, তাহা প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। তিনি নিজে যেরূপ সর্বদা শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানে আবিষ্ট থাকিতেন, অন্যসকলকেও তৎপ্রতি অনুপ্রাণিত করিতে সেইরূপ সর্বতোমুখী চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এতাদৃশ আচরণ হইতে তিনি যে হ্লাদিনীশক্তির দূত তাহা পরিস্ফুট হইতেছে। নিত্যসিদ্ধ শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণজন ব্যতীত সাধারণ জীবের হৃদয়ে এইরূপ ইষ্টসুখানুসন্ধানাবেশ স্থান পাওয়া অসম্ভব।

'ভক্তিলতাবীজ' বিষয়ে স্পষ্টীকরণ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুকে শিক্ষা দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় **'ভক্তিলতাবীজ'**॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ১৯।১৩৩)

অর্থাৎ ভগবদ্‌বিমুখ জীব মায়াগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবক্রমে মহৎ-সংসর্গে আসিয়া যায় এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ভগবৎকথা শ্রবণের ফলে ও তাঁহাকে কোন উপহারাদি দেওয়ার দ্বারা তাহার একটি ভক্ত্যুন্মুখ সংস্কার জাত হয়। এই সংস্কারফলে তাহার সাধুসঙ্গ করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি জাগে ও ভগবদিচ্ছায় তাহার অভীষ্ট সাধুসঙ্গও পাওয়া যায়। তখন সে সাধুসঙ্গে থাকিয়া সাধুর উপদেশ পালন করিতে আগ্রহী হয় এবং তাহার হৃদয়ের ভক্ত্যুন্মুখী প্রবৃত্তি দেখিয়া সাধু কৃপাপূর্বক তাহাকে **'ভক্তিলতাবীজ'** দান করেন।

এই ভক্তিলতাবীজ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন—ইহা শ্রদ্ধা, কেহ বলেন—ইহা ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি

ও কেহ কেহ ইহাকে কর্মার্পণও বলিয়া থাকেন। এইরূপ বিভিন্ন মতবাদ নিম্ন যুক্তিদ্বারা নিরাস করিয়া শ্রীল আচার্যদেব শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিকেই ভক্তিলতাবীজ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সিদ্ধান্ত-স্থাপনই তাঁহার আচার্যত্বের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত আচার্যবৃন্দ বিশেষতঃ শ্রীল জীবপাদ শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানকেই ভক্তির প্রাণরূপে স্থাপন করিয়া থাকিলেও শ্রীল আচার্যদেবের ন্যায় অন্য কোন আচার্য ইহার উপরে এতটা গুরুত্ব দিয়া বলেন নাই। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে তাঁহাকে তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি তাহা হইতে বিরত না হইয়া সিংহের ন্যায় নির্ভীকভাবে বজ্রগম্ভীরস্বরে এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন এবং শেষনিঃশ্বাসপর্যন্ত সেই সিদ্ধান্তে অচল ও অটল রহিয়াছিলেন। মনে হয় এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক তিনি এই ধরাধামে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ শ্রীল রূপপাদের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর (১।৪।১৫) "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া" শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাহাতে ভক্তিসাধনের সর্বপ্রথমে শ্রদ্ধার উল্লেখ থাকায় এই শ্রদ্ধাকেই ভক্তিলতাবীজ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এসম্পর্কে শাস্ত্র ও মহাজনগণ শ্রদ্ধা বিনাও ভক্তি ফল দিতে পারে বলিয়া সমস্বরে বলিয়াছেন। শ্রীল জীবপাদ শাস্ত্রপ্রমাণ উল্লেখ করিয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভে দেখাইয়াছেন—

"ভক্তিমাত্রস্তু তাং বিনাপি সিধ্যতি (স্কান্দে প্রভাস খণ্ডে)

'সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর ! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।' ইত্যাদৌ ***

তৎপূর্বতোঽপি তস্যাঃ ফলদাতৃত্বশ্রবণাৎ (শ্রীভা: ৬।২।৪৯)

'ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥'

ইত্যাদৌ তথা ফলদাতৃত্ব-সৌষ্ঠবশ্রবণাচ্চ। সা চ শ্রদ্ধা শাস্ত্রাভিধেয়াবধারণস্যৈবাঙ্গম্, তদ্বিশ্বাসরূপত্বাৎ। ততো নানুষ্ঠানাঙ্গত্বে প্রবিশতি। ভক্তিশ্চ ফলোৎপাদনে বিধিসাপেক্ষাপি ন স্যাৎ, দাহাদিকর্মণি বহ্ন্যাদিবৎ, ভগবচ্ছ্রবণ-কীর্তনাদীনাং স্বরূপস্তুতাদৃশশক্তিত্বাৎ। ততস্তস্যাঃ শ্রদ্ধাদ্যপেক্ষা কুতঃ স্যাৎ ? অতঃ শ্রদ্ধাং বিনা ক্বচিন্মূঢ়াদাবপি সিদ্ধির্দৃশ্যতে 'শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা' ইত্যাদৌ।" (শ্রীভ: স: ১৭২ অনু:)।

অর্থাৎ শ্রদ্ধা ব্যতীতও ভক্তি স্বীয় ফলদানে সমর্থ। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে ভৃগুবর! একবারমাত্র শ্রদ্ধায় অথবা হেলায় যদি শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় তবে তাহা মানবমাত্রকে উদ্ধার করে।" শ্রদ্ধার উদয়ের পূর্বেই ভক্তি যে ফল দান করে, অজামিল তাহার উদাহরণ। তিনি পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণের নাম উচ্চারণের দ্বারা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার শ্রীনারায়ণের প্রতি বা তাঁহার নামের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না কিম্বা তাঁহার স্মৃতিও ছিল না। শ্রীহরিনাম উচ্চারণরূপ ভক্তির এতই প্রভাব যে শ্রদ্ধা ও স্মৃতি বিনাও তাহা বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি করাইল। শ্রদ্ধা বা আদর মানসিক গুণবিশেষ; 'শ্রদ্ধা'র অর্থ শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। ইহা ক্রিয়াময়ী ভক্তির অঙ্গ নহে। দাহাদি কার্য্যে অগ্নি যেরূপ তাহার স্বভাববশতঃ কোন বিধির অপেক্ষা করে না, ভক্তি সেইরূপ স্বীয় ফলদান বিষয়ে কোন বিধির অপেক্ষা করে না। শ্রীভগবানের নাম-শ্রবণ-কীর্তনাদির স্বরূপতঃ এই শক্তি আছে। তাই ইহা শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না। এই হেতু শ্রদ্ধা ব্যতীতও কোন কোন মূঢ় প্রাণীর সিদ্ধিলাভের কথা শুনা যায়। হেলা যদি ইচ্ছাকৃত না হয় এবং কোনও অপরাধ না থাকে, তবে শ্রদ্ধা না থাকিলেও ভক্তি ফল দিয়া থাকে।

শ্রীল জীবপাদের এই উক্তি হইতে জানাগেল যে, শ্রদ্ধা ভক্তির কোন অঙ্গ নহে, ইহা মানসিক গুণবিশেষ। এইরূপ অবস্থায় শ্রদ্ধাকে ভক্তিলতাবীজ বলা সমীচীন হইবে কি ?

ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিকেও ভক্তিলতাবীজ বলা সমীচীন হইবে না। কারণ সুকৃতি বলিলে ভাগ্যকে বুঝায়। "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তিতে ভাগ্যবান্ বা সুকৃতিমান্ জীবই ভক্তিলতাবীজ লাভ করে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিলতাবীজ যদি সুকৃতি হয় তবে সুকৃতিমান্ জীব সুকৃতি লাভ করে—এইরূপ বলা পিষ্টপেষণন্যায় নিরর্থক হইবে। নির্ধন ব্যক্তিকে ধন দিলে দাতার মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। ধনিব্যক্তিকে ধনদানের দ্বারা দাতার মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় না। অতএব সুকৃতি ভক্তিলতাবীজ নহে।

পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে কর্মার্পণ ভক্তিলাভের সাক্ষাৎ কারণ নহে। ভক্তি হ্লাদিনীশক্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাহা অপ্রাকৃত, কিন্তু কর্মার্পণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা সম্পাদিত হওয়ায় তাহা প্রাকৃত। অতএব কর্মার্পণ ও ভক্তি পরস্পর বিজাতীয়। এইরূপ অবস্থায় কর্মার্পণকেই বা কিরূপে ভক্তিলতাবীজ বলা যাইবে ? এসম্পর্কে শ্রীল জীবপাদ বলিলেন—

"সাম্মুখ্যদ্বারভূতস্য কর্মণঃ সাক্ষাৎ-সাম্মুখ্য-রূপ-জ্ঞানভক্ত্যুদয়পর্যন্তত্বাৎ স্বয়মেব তাভ্যাং ন্যক্কারঃ ॥ (শ্রীভ: স: ১৭৬ অনু:) অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবৎসাম্মুখ্যরূপ জ্ঞান ও ভক্তির উদয় পর্যন্ত ভগবৎসাম্মুখ্যের দ্বারস্বরূপ কর্মার্পণের সীমা নির্ধারিত হওয়ায় জ্ঞান ও ভক্তি হইতে স্বভাবতঃ কর্মের নিকৃষ্টত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম ও ভক্তি পরস্পর বিজাতীয়। অতএব কর্মার্পণ ভক্তিলতাবীজ হইতে পারে না।

এইরূপে শ্রীল আচার্যদেব শ্রীজীবপাদের উক্তি উদ্ধার করিয়া শ্রদ্ধা, সুকৃতি ও কর্মার্পণ যে ভক্তিলতাবীজ নহে, ইহা প্রদর্শন করিয়া ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিকেই ভক্তিলতাবীজ বলিয়া স্থাপন করিলেন।

বীজে বৃক্ষ বা লতার সমস্ত শক্তি নিহিত থাকে। যেরূপ বীজ রোপণ করা হইবে সেইরূপ ফল ফলিবে। বীজ, বীজ হইতে জাত বৃক্ষ এবং বৃক্ষের ফল—এসমস্তই সজাতীয় বস্তু। এই ন্যায়ে ভক্তিলতাবীজ, ভক্তিলতা ও ভক্তিলতার ফল (প্রেম)—এতিনটি সজাতীয় বস্তু হওয়াই স্বাভাবিক।

ভক্তি বলিতে সেবাকে বুঝায়। তাই বাহিরে ভক্তির অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে সেব্যের সুখচিন্তা থাকা আবশ্যক। কারণ সেব্যের সুখচিন্তা ব্যতীত সেবা হইতে পারে না। শুদ্ধভক্তির দুইটি লক্ষণ শাস্ত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে। একটি হইল ইন্দ্রিয়ে অনুষ্ঠানরূপ ও অন্যটি হইল অপ্রাকৃত মানস-ভাবরূপ। কেবল 'মানসভাবরূপ' না বলিয়া 'অপ্রাকৃত মানসভাবরূপ' বলিবার তাৎপর্য কি তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

সাধারণতঃ কেহ কোন কার্য করিতে যাওয়ার পূর্বে প্রথমে তাহার মনে সেই কার্য করিবার বাসনা জাগ্রত হয় এবং তদনুযায়ী তাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কার্যে রূপায়িত হয়। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, কার্য সর্বদা বাসনার অনুগামী। কোন কার্য সম্বন্ধে প্রথমে মনে বাসনার সৃষ্টি না হইলে ঐ কার্য কখনই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না। ভক্তিও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মনে ভক্তি করিবার বাসনা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। মায়াবদ্ধ জীবের মন প্রাকৃত হওয়ায় অপ্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত শ্রীভগবানের সেবার কথা চিন্তা করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু এই প্রাকৃত ভূমিকায়ও সাধুমুখে ভক্তির মাহাত্ম্য শুনিবার পর তাহার ভক্তিবাসনা জাগে এবং সে ভক্তি করিতে যত্নবান্ হয়। প্রাকৃত ভূমিকায় থাকায় তাহার ভক্তিবাসনা ও ভক্তি-অনুষ্ঠান উভয়ে প্রাকৃতই হইয়া থাকে। তাই ইহা শুদ্ধভক্তিপদবাচ্য নহে। সেই হেতু

শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ইহাকে 'ভক্ত্যাভাস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভক্ত্যাভাসের যে বাসনা জীব-হৃদয়ে জাগে তাহারও তিনপ্রকার উদ্দেশ্য থাকে বলিয়া শ্রীল জীবপাদ দেখাইয়াছেন; যথা— (১) সকাম, (২) নৈষ্কর্ম্যকাম ও (৩) ভক্তিমাত্রকাম।

(১) সকাম—ইহপরজগতের সুখকামনাযুক্ত; (২) নৈষ্কর্ম্যকাম—মোক্ষ-কামনাযুক্ত; পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে বাসনা ব্যতীত কোন কার্যের সম্পাদন অসম্ভব। সুতরাং নৈষ্কর্ম্য শব্দের অর্থ এখানে 'শান্তি বা মুক্তি' এবং নৈষ্কর্ম্যকামের অর্থ শান্তিকামনাযুক্ত বা মুক্তিকামনাযুক্ত। (৩) ভক্তিমাত্রকাম—যাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তি করা হইতেছে, তাঁহাকে সুখী করিবার কামনাযুক্ত।

এই তিনপ্রকার উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথম দুইটিতে সাধকের ভোগ ও মোক্ষরূপ স্বার্থ জড়িত থাকায় তাহাকে 'সকৈতব' এবং তৃতীয়টিতে সাধকের কোন স্বার্থের পরিবর্তে কেবল ইষ্টদেবের সন্তোষচিন্তা থাকায় তাহাকে 'অকৈতব' বলিয়া শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য প্রাকৃত ভূমিকায় ইষ্টদেবের সন্তোষ চিন্তার উদ্ভবস্থল মন প্রাকৃত হওয়ায় ইহাও প্রাকৃত। তজ্জন্য ইহাকে 'সন্তোষাভাস' বা 'প্রীণনাভাস' বলা হইয়াছে।

এই প্রীণনাভাস প্রাকৃত মন হইতে জাত হইলেও ইহার ফল মহৎ। কারণ ইহাতে সাধকের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষচিন্তা থাকায় শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিত্যকাল সর্বজীব হৃদয়ে নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীশক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইহা সহায়ক হইয়া থাকে। এই অকৈতব ভক্ত্যাভাসের বা প্রীণনাভাসের ফলে ক্রমশঃ সাধকের হৃদয় হইতে রজস্তমোগুণ দূর হইয়া দৈন্যবৃদ্ধি হয়। সাধনপ্রভাবে চিত্ত যেপরিমাণে নির্মল হইতে থাকে, দৈন্য সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া হৃদয়কে বিগলিত করিতে থাকে। ফলতঃ সাধকের অন্তরে অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি জাত হইয়া চক্ষু হইতে অশ্রুগঙ্গার প্রবাহ ছুটে। এই অশ্রুই হ্লাদিনীশক্তির কৃপাকর্ষণে পরম সহায়ক হইয়া থাকে। সাধকের ব্যাকুলতায় হ্লাদিনীশক্তি আকৃষ্ট হইয়া তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন। হ্লাদিনীশক্তি প্রবেশ করামাত্রই তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন অপ্রাকৃত হইয়া যায় এবং হ্লাদিনীশক্তির কৃপাপ্রভাবে তাহার সেই অপ্রাকৃত মনে শ্রীভগবানের প্রতি স্বতঃ প্রীতি জাত হয়। সেই অবস্থায় শ্রীভগবানের সুখবিধাননিমিত্ত তাহার যে বাসনা জন্মে তাহাকে বলা হয় **'অপ্রাকৃত মানসভাবরূপা'**। এইখানেই ভক্ত্যাভাসভূমিকার অবসান এবং **'সাধনভক্তি-ভূমিকা'**র আরম্ভ।

সাধনভক্তিসম্পর্কে শ্রীল রূপপাদের উক্তি—

"উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্‌নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ২।১।২৭৬)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহাদের প্রীতি জাত হইয়াছে, পরন্তু সর্বতোভাবে অনর্থ বা বিঘ্ন দূর হয় নাই অথচ শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা হইয়াছে, তাঁহারাই সাধকরূপে পরিকীর্তিত।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতি বা প্রীতি জাত হওয়াই ভক্তিসাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সাধনপ্রভাবে সেই রতি গাঢ় হইলে প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে—'প্রেম' অভিধান।"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২৩।৩)

ইহা হইতে দেখা গেল যে, সাধনের আরম্ভ হইতে ভক্তিসাধক শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে কর্মার্পণ বা ভক্ত্যাভাস করে। সাধনফলে চিত্ত যতই শুদ্ধ হইতে থাকে সাধকের শ্রীকৃষ্ণসুখচিন্তা (প্রীণনাভাস) ততই নির্মল হইতে থাকে। শ্রবণকীর্তনরূপ ভক্ত্যঙ্গ যাজনকালে সাধক এই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছাকে হৃদয়ে স্থান দিতে যত্নবান্ হয়। সাধনপ্রভাবে চিত্ত নির্মল হইলে এই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছা ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া রতি ও প্রেমে পরিণত হয়। 'প্রেম' অর্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাঢ় মমতাযুক্ত হইয়া তাঁহার সেবা করিবার বাসনা। সাধনকালে ভক্তিলতায় ভোগ-মোক্ষবাঞ্ছারূপ উপশাখা উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধিলাভ করিলে সাধক যত্নসহকারে তাহাকে ছেদন করিবে। কারণ ভোগ-মোক্ষবাঞ্ছারূপ নিজসুখচিন্তা জাগিলে শ্রীকৃষ্ণসুখচিন্তা হৃদয়ে স্থান পাইবে না।

বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে ফল যেরূপ সজাতীয় বস্তু সেইরূপ ভক্তিলতাবীজ, সাধনভক্তিলতা ও ভক্তিলতার ফল প্রেমও সজাতীয় বস্তু বলিয়া প্রমাণিত হইল। অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবাঞ্ছাই বাস্তবপক্ষে 'ভক্তিলতাবীজ'-পদবাচ্য—শ্রদ্ধা, সুকৃতি কিম্বা কর্মার্পণ নহে। কারণ এই তিনটির ভক্তির সহিত সম্পর্ক বিজাতীয়।

শ্রীল আচার্যদেব বহু উদাহরণ দিয়া ইহা সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তিনি এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রাগমার্গীয় ভজন বিষয়ে শিক্ষাদান যে তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা তাঁহার প্রত্যেক আচার-ব্যবহার, চালচলন ও উপদেশাদি হইতে স্পষ্ট জানা যায়।

অকালভেকের অসারতা প্রতিপাদন

গৃহত্যাগের উপযুক্ত অধিকার অর্জন না করিয়া অপক্ক অবস্থায় গৃহত্যাগের তিনি কোনও দিন পক্ষপাতী ছিলেন না। সংসারভোগস্পৃহা প্রবল থাকা অবস্থায় কোন ক্ষণিক উত্তেজনা(emotion)র বশবর্ত্তী হইয়া গৃহত্যাগ করিবার দ্বারা লাভ ত' হয়ই না বরং ক্ষতিই হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিম্ন উক্তি তাহার প্রমাণ

"কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥" (৩।৬)

যিনি বাহিরে ইন্দ্রিয়সংযমের অভিনয় করিয়া অন্তরে ভোগচিন্তায় ডুবিয়া থাকেন তাঁহাকে 'মিথ্যাচারী' বলা হয়। এই প্রকার মিথ্যাচারী ব্যক্তি অন্যের মঙ্গল করা দূরে থাকুক, নিজের মঙ্গলও করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ না হইলে গৃহত্যাগের অধিকার হয় না। ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখ হইবার একমাত্র উপায় পরা শান্তির মূল উৎস শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রীতির উদয়। এসম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঋষভদেবের উক্তি—

"এবং মনঃ কর্মবশং প্রযুঙ্ক্তে অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।
প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥"
(শ্রীভা: ৫।৫।৬)

অর্থাৎ দেহাত্মবোধ হেতু জীবের আত্মজ্ঞান আচ্ছাদিত হইলে সে কর্মাসক্ত হইয়া পড়ে। আমি সর্বেশ্বর ভগবান্ বাসুদেব। আমার প্রতি প্রীতি না হওয়া পর্যন্ত জীব এই দেহাসক্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

শ্রীঋষভদেবের উপর্যুক্ত উপদেশ হইতে জানা যায় যে, ভগবদাবেশ ব্যতীত শরীরের প্রতি আবেশ বা দেহাত্মবুদ্ধি দূর হইবে না। তাই শান্তিকামী বা মুক্তিকামী ব্যক্তি অপক্ক অবস্থায় গৃহত্যাগ করিয়া বন-জঙ্গলের আশ্রয় লইলেও তথায় শান্তিলাভের পরিবর্তে দেহসুখের উদ্দেশ্যেই নানা বাসনার শিকার হয়। এতদ্দ্বারা সে এক বহির্মুখ গৃহ ত্যাগ করিয়া আরও একটি অধিক অস্বাভাবিক গৃহে প্রবেশ করে বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে (৫।২) বলিয়াছেন—"ভাবোদয়ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বতঃ উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত গৃহত্যাগ করা অবৈধ। ক্ষণিকবৈরাগ্যবশতঃ যাহারা কৌপীন ও বহির্বাসাদি গ্রহণ করিয়া নিজেকে বাবাজী বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের উক্ত বৈরাগ্য খুব শীঘ্রই অন্তর্হিত হয় এবং তাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া অবৈধ সংসার আরম্ভ করে কিম্বা গোপনে কদাচার করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তি চরিতার্থ করে। এইপ্রকার

অবৈধ ভেকের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া না দিলে বৈষ্ণবজগতের কোনওরূপ মঙ্গল হইবে না। বর্ণাশ্রম ধর্ম বিচারের সময় অবৈধ বৈরাগ্যকে জগন্নাশকারী পাপকর্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই অবৈধ বৈরাগ্য বর্ণাশ্রমধর্মগত সন্ন্যাসাশ্রমাশ্রিত পাপকার্য্য। এখানে যে অবৈধ বৈরাগ্যের কথা বলা হইল, ইহা **ভক্তজীবনগত মহান্ অপরাধবিশেষ**।"

স্বাভাবিক বৈরাগ্যের উদয় বিনা বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করিলে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যবশতঃ নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ দৌরাত্ম্যযুক্ত বৈরাগ্যকে শ্রীমন্মহাপ্রভু **'মর্কট বৈরাগ্য'** বলিয়াছেন—

"ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরায়া বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে—'মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন'॥"

(শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ২।১১৮, ১২২)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় এইপ্রকার কৃত্রিমপন্থী বৈরাগিগণের কথা বলা হয় নাই। ভক্তিসাধনের ফলে যে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহাই ভক্তজীবনের সৌন্দর্য। বৈরাগ্য করিয়া ভক্তির যে অন্বেষণ করা যায়, উহা প্রায়শঃ অমঙ্গলজনকই হইয়া থাকে। অতএব অপক্ক অবস্থায় গৃহত্যাগ না করিয়া ক্রমপন্থায় গৃহস্থাশ্রম স্বীকারপূর্বক ভজন করা কর্তব্য। এসম্পর্কে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত নিম্ন উপদেশ অনুসরণীয়।

"স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

(শ্রীচৈ: চ: ম: ১৬।২৩৫-২৩৭)

এসম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—"**স্বচ্ছন্দ-জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে গৃহে স্ত্রীপুত্রের সহিত অনাসক্তভাবে বিষয় স্বীকার করিয়া অন্তরে নিষ্ঠার সহিত ভজন করিতে পারিলে ক্রমে প্রপঞ্চ খসিয়া পড়ে** ও আত্মা ভক্তিবলে বলীয়ান্ হইয়া ভগবৎসম্বন্ধে স্থিত হয়। নচেৎ মুমুক্ষু হইয়া ক্রমত্যাগ করিলে মর্কট বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্য করিয়া ফেলে।

'যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর'—এই আদেশের তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য বিষয় গ্রহণ করা উচিত নহে। **কেবল আত্মার কৃষ্ণসম্বন্ধ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে যতটা বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা কর।** দেহ, গৃহ, শ্রীকৃষ্ণার্চনের উপকরণ, সমাজ—এসকলই যুক্তবৈরাগ্যের উপকরণ হইতে পারে। কেবল সাধকের অন্তরনিষ্ঠা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। বাহ্যনিষ্ঠা কেবল লোকব্যবহারমাত্র। অন্তরনিষ্ঠা নিষ্কপটভাবে হইলে ভববন্ধ ও প্রপঞ্চসম্বন্ধ অতিশীঘ্রই দূর হইয়া যায়।" (চৈ: শি: ১।৭)

"যেপর্যন্ত বহির্মুখী প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, সেপর্যন্ত সাধুসঙ্গবলে কৃষ্ণসংসারের সমস্ত প্রবৃত্তি নিরপরাধভাবে চালিত করা নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ে সেইসকল প্রবৃত্তি স্বল্পকাল-মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া অন্তর্মুখী হইয়া যায়। প্রবৃত্তি পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী হইয়া গেলে গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে।

গৃহত্যাগী ভক্তগণের অধিকার লক্ষণ—আদৌ স্ত্রীসঙ্গস্পৃহাশূন্যতা, সর্বজীবে পূর্ণ দয়া, অর্থব্যবহারে তুচ্ছ জ্ঞান, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহের জন্য অভাব-সময়ে যত্ন, কৃষ্ণে শুদ্ধা রতি, বহির্মুখ সঙ্গের প্রতি তুচ্ছজ্ঞান, মান-অপমানে সমবুদ্ধি, বহ্বারম্ভে স্পৃহাশূন্যতা ও জীবনে-মরণে রাগ-দ্বেষ-রাহিত্য।

এই লক্ষণসকল যে গৃহস্থভক্তের উপস্থিত হয়, সে আর কর্মক্ষম থাকে না। সুতরাং সে গৃহত্যাগী হইয়া পড়ে। এইরূপ নিরপেক্ষ ভক্ত বিরল। জন্মের মধ্যে কোনও সময়ে যদি এইরূপ ভক্তের সঙ্গ হয়, তবে সৌভাগ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

নিরপেক্ষ গৃহত্যাগী ভক্তগণের ন্যায় সম্মানলাভের আশায় অনেকে কৃত্রিম অধিকার প্রকাশ করেন। ইহা নিতান্ত অমঙ্গলজনক। কারণ এইভাবে গৃহত্যাগ করিবামাত্র আর উপরোক্ত কৃত্রিম লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তখন দৌরাত্ম্য আসিয়া উপস্থিত হইয়া যায়।

দৃঢ়রূপে গৃহস্পৃহা দূর হইলে বনেই থাকুন বা গৃহেই থাকুন, নিরপেক্ষ অকিঞ্চন ভক্ত জগৎ পবিত্র করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ভিক্ষাশ্রমলিঙ্গদ্বারা পরিচিত হইবার জন্য কৌপীন ও কন্থা গ্রহণ করেন।" (জৈবধর্মঃ ৭ম অধ্যায়, ১১৯-১২১ পৃ)

এসম্পর্কে স্বয়ং শ্রীনারদ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

"প্রায়ঃ স্বভাববিহিতো নৃণাং ধর্মো যুগে যুগে।
বেদদৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্মকৃৎ ॥

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্তমানঃ স্বকর্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥
উপ্যমানং মুহুঃ ক্ষেত্রং স্বয়ং নির্বীর্যতামিয়াৎ।
ন কল্পতে পুনঃ সূত্যা উপ্তং বীজঞ্চ নশ্যতি॥
এবং কামাশয়ং চিত্তং কামানামতিসেবয়া।
বিরজ্যেত যথা রাজন্নাগ্নিবৎ কামবিন্দুভিঃ॥”

(শ্রীভা: ৭।১১।৩১-৩৪)

হে রাজন্! বেদদৃক্ মহানুভবগণ যুগে যুগে স্বভাববিহিত ধর্মকেই ইহ ও পরলোকে মনুষ্যগণের পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়াছেন। স্বভাবকৃত বৃত্তিযুক্ত স্বধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ধীরে ধীরে অর্থাৎ ক্রমপন্থায় বা বহু জন্মান্তর পরে নিজ স্বভাবজাত কর্মনিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে রাজন্! পুনঃ পুনঃ বীজবপনে ক্ষেত্র নির্বীর্য হইয়া পড়ে এবং পুনরায় শস্য উৎপাদনে অসমর্থ হওয়ায় উপ্ত বীজও নষ্ট হইয়া যায়। প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘৃতবিন্দুর দ্বারা নির্বাপিত হয় না, কিন্তু প্রচুর ঘৃতনিক্ষেপ ফলে নির্বাপিত হইয়া থাকে, সেইরূপ উৎকট ভোগবাসনাযুক্ত পুরুষের পক্ষে হঠাৎ কামত্যাগ অসম্ভব হেতু সে **বেদোক্ত নিয়মে** বহুপ্রকারে কাম ভোগ করিতে করিতে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা যখন বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া কামভোগের দোষসকল উপলব্ধি করে, তখন যযাতি-সৌভরি প্রভৃতি ব্যক্তিগণের ন্যায় ভোগদ্বারা বাসনা ক্ষয় হইলে ধীরে ধীরে বৈরাগ্য লাভ করে।

যাহারা মহতের বিশেষ কৃপা লাভ করেন নাই, অথচ যাহাদের উৎকট ভোগবাসনা আগ্নেয়গিরিগহ্বরস্থ প্রচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় অন্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাদিগকে ক্রমপন্থা ত্যাগ করাইয়া কর্মসন্ন্যাসী বা জ্ঞানসন্ন্যাসী ত দূরের কথা ভক্তিসন্ন্যাসী বা বর্ণাশ্রমত্যাগী বাবাজী সাজাইয়া দিলেও তাহাদের উৎকট ভোগাগ্নির অগ্ন্যুৎপাত নিজেদের ও জগতের প্রভূত অমঙ্গল বিধান করিবে।

মহতের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম প্রাপ্তির অভিনয়, দীক্ষাপ্রাপ্তির অভিনয়, তাঁহার সেবার অভিনয় ও বহুকাল ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী সাজিয়া মঠাদিতে বাসের অভিনয় করিলেই যে লোকে মহতের কৃপা পাইয়াছেন, এইরূপ বলা যায় না। কার্য দেখিয়াই কারণ নিরূপিত হয়। ইহাই বৈজ্ঞানিক নিয়ম। মহতের কৃপা বা সঙ্গ লাভ হইলে তাঁহার হৃদয়ে সতত বিদ্যমান ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি নিশ্চিতরূপে হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবে। যদি চিত্তে মহতের ন্যায় আবেশ ও অভিনিবেশ উদিত হয় নাই, অথচ বাহ্য বেশধারণের অভিনয়ে মহতের

কৃপালাভের সমস্তপ্রকার সমাবেশ দেখা যায়, তাহা হইলে ইহা বায়সের ময়ূরপুচ্ছধারণের ন্যায় বৃথা অভিনয়মাত্র।

এইপ্রকার বহু ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যাহারা ২৫।৩০ বৎসর পর্যন্ত বৈরাগ্যলিঙ্গ ধারণের অভিনয় করিয়াও পরবর্তিকালে বৈরাগ্যলিঙ্গ ও সদাচার ত্যাগ করিয়া ঘোর নাস্তিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোর মাংসাশী ও মদ্যপও হইয়াছে। তাহাদের উক্ত ত্যাগিবেশের অন্তরালে হৃদয়গহ্বরে উৎকট ভোগপিপাসারূপ অগ্নি যে প্রচ্ছন্নরূপে প্রজ্বলিত ছিল, উহা তাহাদের উপরোক্ত আচরণ প্রকাশ করিয়া দেয় না কী? এতদ্ব্যতীত আরও অনেকে মহতের অবৈধ অনুকরণ করিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে গুরু সাজিয়া রাজসিকী ও তামসিকী ভক্তিদ্বারা নিজেকে ও জগৎকে বঞ্চিত করিয়াছেন। উপরোক্ত ব্যক্তিগণের আচরণ দেখিয়া সমাজের ধীর এবং বিচারশীল ব্যক্তিগণ নাসিকা কুঞ্চন করিতেছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, মহতের বিশেষ কৃপায় যাহাদের ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখ হয় নাই, তাহারা শাস্ত্রানুমোদিত ক্রমপন্থায় না চলিয়া অকালভেক ধারণ করিলে নিজের ও জগতের যে নিশ্চিতরূপে অমঙ্গলের কারণ হইবে, ইহাতে দ্বিমত হইবার কিছু নাই।

বর্ণাশ্রমধর্মে অবস্থিত অনধিকারী ব্যক্তি অপক্ক অবস্থায় কৃত্রিম বৈরাগ্যলিঙ্গ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী সাজিলে কি হইবে, তাহাদের হৃদয়ে প্রজ্বলিত উৎকট ভোগবাসনারূপ অগ্নি কোন সুযোগ-রূপ ইন্ধন পাইলেই তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। পূর্বে যে স্ত্রীকে সে নিন্দা করিতেছিল তখন সেই যোষিৎরূপিণী মায়া অগম্যা স্ত্রীরূপে তাহার সর্বনাশ ঘটাইবে। ফলতঃ সে ত্যাগীর বেশ ধারণ করিয়াও ঘোর নরকে পড়িবেই পড়িবে।

তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার স্বরচিত 'বাউল সঙ্গীতে' বলিলেন—

"যতদিন হৃদয় শোধন নয়,
ঘর ছাড়লে পরে 'মর্কট-বৈরাগী' তারে কয়।
হৃদয়দোষে, রিপুর বশে পদে পদে তা'র পতন ॥
ঘরে বসে পাকাও নিজের মন,
আর সকল দিন কর হরির নাম সংকীর্তন;
তবে চাঁদ বাউলের সঙ্গে শেষে কর্‌বি সংসার বিসর্জন ॥

* * * * *

জীবের এই অপরাধ শীঘ্র কর দূর;
যজি' গৃহীর ধর্ম, সু-স্বধর্ম, শুদ্ধকর অন্তঃপুর ॥

ন্যাসি-মান-আশা ত্যজি' দীনভাবে কৃষ্ণ ভজি',
স্বভাবগত ধর্ম যজি', নাশ' দোষাঙ্কুর;
তবে কৃষ্ণ পা'বে, দুঃখ যা'বে, হবে তুমি সুচতুর ॥

*   *   *   *   *

শুক, নারদ, চতুঃসন, ভেকের অধিকারী হন
তাঁদের সমান পার্‌লে হ'তে ভেকে করবে আশ;
বল তেমন বুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, ক'জন ধরায় করছে বাস?"

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে (২।৪) শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উল্লেখ করিয়াছেন—"ব্রাহ্মণস্বভাব ব্যক্তিগণের ব্রহ্মচর্যে অধিকার। গৃহস্থাশ্রমে সর্ববর্ণের অধিকার। মানবজাতি সাধারণতঃ গৃহাশ্রমের অধিকারী। কেহ কেহ বিশেষ অধিকার লাভ করিয়া ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস আশ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম।" অতএব রজস্তমোগুণাক্রান্ত পশুপ্রবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যবস্থা নাই, বর্ণাশ্রমাতীত ভেকগ্রহণ ত দূরের কথা।

ভক্তিপ্রচার-প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ সংরক্ষণের জন্য ত্যাগিগণের প্রয়োজনীয়তা আছে সত্য, কিন্তু কতিপয় কৃত্রিমপন্থী ত্যাগীর অভিনয়কারী ব্যক্তি দ্বারা অথবা অন্তরে রজস্তমোগুণোত্থ পশুপ্রবৃত্তি পোষণপূর্বক প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যে বৈরাগ্যচিহ্নধারী ব্যক্তির দ্বারা যে সংঘ বা প্রতিষ্ঠান রচিত হয় তাহাতে কোন আদর্শ-আচারময়ী শিক্ষাই কেহ লাভ করিতে পারেন না। বরং লোকসমূহ তাহাদের আচরণহীন বাগাড়ম্বরে প্রভাবিত হইয়া অন্তঃসারশূন্য ভক্তিযাজনের অভিনয় করিয়া শেষে অধঃপতিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অনধিকারী ত্যাগী ব্যক্তির দ্বারা রচিত সঙ্ঘে প্রচ্ছন্ন পাপকার্যই প্রশ্রয় পায় এবং এই পাপ ক্রমশঃ অপরাধের দিকে গতি করে। সুতরাং এইরূপ পাপী বা অপরাধীর দ্বারা রচিত প্রতিষ্ঠান কখনই জগতের মঙ্গলকর হইতে পারে না।

একথা শুনিয়া অনেকে হয় ত' মনে করিতে পারেন যে ত্যাগিজীবনে যদি পতনের এতই সম্ভাবনা, তবে গৃহস্থ হইয়া থাকা সব দিক হইতে নিরাপদ। কারণ ইহাতে পতনের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এইরূপ বিচারও ভ্রমাত্মক; কারণ আচরণহীন ত্যাগিজীবন হইতে আচরণহীন গৃহিজীবন অধিক নিন্দনীয়। শাস্ত্রে যে গৃহস্থাশ্রমের কথা বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া ভগবদুন্মুখ হওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাতেও যথেষ্ট বিধিব্যবস্থার সংযোগ করা হইয়াছে। সেই ব্যবস্থার

মূল হইল কর্মার্পণ বা বিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে যাবতীয় ভোগসুখত্যাগ। এই কর্মার্পণের ফলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ সংসারমুক্তি হইতে পারিবে। বেদ বিষ্ণুময়। ভোগকামী জীবের জন্য বেদে যে গৃহস্থাশ্রমের ব্যবস্থা আছে, তাহা ছাগ-মর্কটের ন্যায় যথেচ্ছ ভোগের নিমিত্ত নহে, কিন্তু বেদবিধিচালিত হইয়া সংযমপূর্বক ভোগ করিয়া ভোগস্পৃহা হইতে নিবৃত্ত হইবার নিমিত্তই এই ব্যবস্থা। অতএব গৃহস্থাশ্রমের মধ্যে ভক্তিসাধকের দায়িত্ব কিছু কম নহে। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া বেদবিধি উল্লঙ্ঘন করিলে পতন অনিবার্য। অধুনা শাস্ত্রশাসনরহিত কেবল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণনিষ্ঠ গৃহমেধিগণের যে আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পাপ ও অপরাধের খনি। এজন্যই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—"অকুটিল ব্যক্তিগণই যযাতি-সৌভরি প্রভৃতির ন্যায় শাস্ত্রসম্মত পন্থায় ভোগ স্বীকার করিতে করিতে ক্রমশঃ বৈরাগ্য লাভ করিতে পারেন।"

সুতরাং অনধিকারী ত্যাগিজীবনে পতনের যেরূপ আশঙ্কা, অনধিকারী গৃহিজীবনেও সেইরূপ আশঙ্কা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অকালভেকের যেরূপ নিন্দা করিয়াছেন, শাস্ত্রশাসনরহিত ছাগধর্মপরায়ণ গৃহমেধীরও সেইরূপ নিন্দা করিয়াছেন।

এইসব উদাহরণ দিয়া শ্রীল আচার্যদেব বাহ্যবেশের প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়া, অনুক্ষণ বিষ্ণুতোষণপর কর্মার্পণ করিতেই সকলকে আদেশ দিয়াছেন এবং এই কর্মার্পণের সঙ্গে সঙ্গে মহাবদান্য শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নাম কীর্তনপূর্বক কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থনার জন্যও উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার এই উপদেশ যে মাদৃশ জন্মজন্মান্তরীণ দুরন্ত অপরাধীর ক্রমমঙ্গললাভের একমাত্র শাস্ত্রানুমোদিত উপায়, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

অপক্ক গৃহত্যাগিগণকে গৃহস্থ হইতে উপদেশ

অকালভেকের অসারতা বিষয়ে তিনি নানা শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া প্রাঞ্জলভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেওয়ার পর মাদৃশ বহু অপক্ক গৃহত্যাগীকে গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিতে উপদেশ করেন। তাঁহার এই উপদেশে সর্বতোভাবে অশুক্লবিত্ত ত্যাগ করিয়া সদুপায়ে উপার্জিত অর্থাদি(শুক্লবিত্ত)দ্বারা জীবননির্বাহের উপরে তিনি গুরুত্ব দিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা জীবননির্বাহে উৎকট অভাবের সম্মুখীন হইলেও তাহাতে বিচলিত না হইয়া নিজ কর্মফলজ্ঞানে তাহাকে সহ্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ-উদ্দেশ্যে কর্মার্পণপূর্বক মহৎকৃপালাভের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। গৃহস্থ হইলেও ব্যবহারকে অর্থাৎ অর্থোপার্জনাদি

সাংসারিক কার্যকে গৌণ করিয়া পরমার্থকে সর্বদা মুখ্যস্থান দেওয়ার জন্য তিনি শিক্ষা দিয়াছেন।

এই দীন লেখক তাঁহার কৃপাদেশে গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিবার পর তাঁহার নিকট ১১।৬।১৯৫৪ তারিখে একখানি চিঠি ইংরাজীতে লিখিয়া নিজের বিবাহ-সংবাদ নিম্নমতে জানাইয়াছিল।

"I feel ashamed to let Your Divine Grace know that I have got married on 23.5.54."

ইহার উত্তরে ১৬।৬।৫৪ তারিখে তিনি নিম্নমতে জানাইলেন—

"* * * You have not committed a sin of which you should feel ashamed. But to enter into this world is to have the aim to emerge out of it in the natural way i.e., Karma-marga and the only means for a jiva in Karma-marga to get rid of this world is the contact of a Mahat and his causeless mercy on him and not only proceeding in the vicious circle of this world even in natural way." তাঁহার উক্ত পত্রাংশের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"তুমি বিবাহ করিবার দ্বারা এমন কোন পাপ কর নাই, যেজন্য তোমাকে লজ্জিত হইতে হইবে। কিন্তু এই সংসারে প্রবেশের একমাত্র লক্ষ্য স্বভাববিহিত পন্থায় (কর্মার্পণ করিয়া) তাহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া; কেবল প্রবৃত্তিপরায়ণ হইয়া কর্ম করিয়া ইহাতে আরও অধিক প্রবেশ করিয়া বন্ধনকে দৃঢ়তর করা নহে। মহতের সঙ্গ ও জীবের প্রতি তাঁহার অহৈতুকী কৃপাই এই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায়।"

তাঁহার উপরোক্ত পত্রাংশের মাত্র কয়েকটি পঙ্ক্তিতে তিনি সমস্ত ভাগবত-ধর্মের সারকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রধান কথা হইল সাধক যে আশ্রম স্বীকার করুক বা যাহা কিছুই করুক না কেন প্রথমে তাহার লক্ষ্য স্থির করা উচিত। লক্ষ্যহীন ক্রিয়াকলাপ নিরর্থক। সেই লক্ষ্য বিষয়ে বলিতে গিয়া তিনি লিখিলেন যে, বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবার একমাত্র লক্ষ্য হইবে কর্মার্পণ করিয়া সেই সংসার

হইতে উত্তীর্ণ হওয়া; কর্ম করিয়া তাহাতে আরও অধিক প্রবেশের দ্বারা বন্ধনকে দৃঢ়তর করা নহে। এস্থানে ভক্তি করিতে না বলিয়া কর্মার্পণ করিতে বলিবার অনেক গূঢ় রহস্য আছে। ভক্তি হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি হওয়ায় ইহা অপ্রাকৃত। কিন্তু কর্মাধিকারী জীবের ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ প্রাকৃত। এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত ভক্তিযাজন একেবারেই অসম্ভব। মহৎ হ্লাদিনী শক্তির দূত। তাঁহার কৃপাপ্রভাবে জীবের ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রাকৃত হইয়া যায়। সেই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ই ভক্তিযাজনের অনুকূল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে 'অভিধেয়' সম্পর্কে শিক্ষা দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৩২)

এস্থানে ভক্তিসাধকের পক্ষে মহৎকৃপার অপরিহার্যতাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতে জানা যায়।

তাই **কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল সেই মহৎকৃপালাভের উদ্দেশ্যে কর্মার্পণ করিবার জন্য শ্রীল আচার্যদেব উপদেশ দিলেন। কর্মার্পণপ্রভাবে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া মহৎকৃপালাভের যোগ্য হইবে এবং মহৎকৃপায় জীব শুদ্ধভক্তি-যাজনদ্বারা প্রেমলাভ করিতে পারিবে।**

শ্রীল আচার্যদেব কোন্ উদ্দেশ্যে অপক্ক গৃহত্যাগিগণকে গৃহস্থ হইতে উপদেশ দিতেন, উহা তাঁহার উপরোক্ত পত্র হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে।

রজস্তমোগুণাক্রান্ত সাধকের পক্ষে কায়িক সেবার উপাদেয়তা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় শ্রীহরিনাম-কীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। নিরন্তর শ্রীহরিনামকীর্তনপ্রভাবে জন্মজন্মান্তরের অপরাধ দূর হইবে—ইহা সমস্ত শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাঁহার শিক্ষায় এই কথাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এসম্পর্কে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উল্লেখ করিয়াছেন—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥ (১১।৫২৬)

অর্থাৎ নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের পাপ(অপরাধ)কে নামই হরণ করেন এবং সেই নাম নিরন্তর কীর্তিত হইলে পরমার্থের সাধক হইয়া থাকেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥" (শ্রীচৈ: ভা: মধ্য ২৫।৭৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা হইতে ও উপরোক্ত শাস্ত্রবচন হইতে নামাপরাধীর পক্ষে নিরন্তর নামকীর্তনের ব্যবস্থার কথা স্পষ্ট জানা যায়। কিন্তু এস্থানে বিশেষ সতর্কতাপূর্বক লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শ্রীহরিনামের প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধা না থাকিলে শ্রীহরিনামকীর্তন রাজসী ও তামসীরূপ সকামা ভক্তিতেই পরিণত হইয়া ঈপ্সিত ফললাভ হইতে সাধককে বঞ্চিত করিয়া দিবে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিরন্তর হরিনাম কীর্তনের জন্য যে উপদেশ তাহা রজস্তমোগুণতাড়িত এবং সর্বদা নিজভোগ-চিন্তায় বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির জন্য উদ্দিষ্ট নহে—তাহা কেবল মহৎকৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত্যধিকারী ব্যক্তির জন্যই উদ্দিষ্ট।

এই ভক্ত্যধিকারী-সম্পর্কে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—অথাস্যা অকিঞ্চনাখ্যায়া ভক্তেঃ সর্বোর্দ্ধভূমিকাবস্থিতিমধিকারিবিশেষনিষ্ঠত্বঞ্চ দর্শয়িতুং প্রক্রিয়ান্তরম্, তত্র পরতত্ত্বস্য বৈমুখ্যপরিহারায় যথাকথঞ্চিৎ সাম্মুখ্যমাত্রং কর্তব্যত্বেন লভ্যতে। তচ্চ ত্রিধা;—(১) নির্বিশেষরূপস্য তদীয়ব্রহ্মাখ্যাবির্ভাবস্য জ্ঞানরূপম্, (২) সবিশেষরূপস্য চ তদীয়-ভগবদাদ্যাখ্যাবির্ভাবস্য ভক্তিরূপমিতি দ্বয়ম্, (৩) তৃতীয়ঞ্চ তস্য দ্বয়স্যৈব দ্বারং কর্মার্পণরূপমিতি। তদেতত্রয়ং পুরুষযোগ্যতাভেদেন ব্যবস্থাপয়িতুং লোকে সামান্যতো জ্ঞান-কর্ম-ভক্তীনামেবোপায়ত্বম্, নান্যেষামিত্যনুবদতি (ভা: ১১।২০।৬)—'যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥' যোগা উপায়াঃ, ময়া শাস্ত্রযোনিনা, শ্রেয়াংসি মুক্তি-ত্রিবর্গ-প্রেমাণি। অনেন ভক্তেঃ কর্মত্বঞ্চ ব্যাবৃত্তম্। তেষ্বধিকারিহেতূনাহ দ্বাভ্যাম্ (ভা: ১১।২০।৭-৮)—'নির্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু। তেষ্বনির্বিণ্নচিত্তানাং কর্মযোগশ্চ কামিনাম্। যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥' ইহ এষাং মধ্যে নির্বিণ্নানামৈহিক-পারলৌকিক-বিষয়-প্রতিষ্ঠাসুখেষু বিরক্তচিত্তানামতএব তৎসাধন-ভূতেষু লৌকিক-বৈদিক-কর্মসু ন্যাসিনাং তানি ত্যক্তবতামিত্যর্থঃ। পদদ্বয়েন দৃঢ়জাত-মুমুক্ষূণামিত্যভিপ্রেতম্। তেষাং জ্ঞানযোগঃ সিদ্ধিদ ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কামিনাং তত্তৎসুখেষু রাগিণাম্, অতএব তেষু তৎসাধনভূতেষু কর্মসু অনির্বিণ্নচিত্তানাং তানি ত্যক্তুমসমর্থানাং কর্মযোগঃ সিদ্ধিদস্তত্তৎসংকল্পানুরূপঃ ফলদঃ। *** যদৃচ্ছয়া কেনাপি পরমস্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্তসঙ্গ-তৎকৃপাজাত-মঙ্গলোদয়েন।" (শ্রীভ: স: ১৭০-১৭১ অনু:)।

অর্থাৎ এই অকিঞ্চনা ভক্তি সকল সাধনের মধ্যে সর্বোচ্চ ভূমিকায় অবস্থিত এবং **অধিকারিবিশেষের** জন্যই ইহার ব্যবস্থা। এখন এই দুইটি বিষয় জানাইবার জন্য অপর প্রক্রিয়া উক্ত হইতেছে। তাহার মধ্যে পরতত্ত্ব বিষয়ে বৈমুখ্য পরিহারের জন্য যেকোনরূপ সাম্মুখ্যমাত্রই কর্তব্য বলিয়া জানা যাইতেছে। এই সাম্মুখ্য তিন প্রকার; যথা—(১) ব্রহ্মনামক তদীয় নির্বিশেষ আবির্ভাবের জ্ঞান, (২) ভগবদাদি তদীয় সবিশেষ আবির্ভাবের প্রতি ভক্তি ও (৩) বৈধ কর্মসমূহের সমর্পণই তৃতীয়প্রকার সাম্মুখ্য; ইহা পূর্বোক্ত জ্ঞান ও ভক্তিরূপ দ্বিবিধ সাম্মুখ্যের দ্বারস্বরূপ। পুরুষগণের যোগ্যতার ভেদানুসারে এই তিনপ্রকার সাম্মুখ্যের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ সাধারণভাবে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিকেই উপায়রূপে স্থির করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। 'যোগ'—উপায়। 'শ্রেয়ঃ'—মুক্তি, ধর্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ ও প্রেম (তাহার মধ্যে জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি, কর্মের দ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ এবং ভক্তির দ্বারা প্রেমরূপ শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল লাভ হয়)। এস্থানে কর্ম হইতে পৃথগ্‌ভাবে ভক্তির উল্লেখহেতু ভক্তি যে কর্ম নহে, ইহা জানা যায়।

ইহার পর দুইটি শ্লোকে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি, এই তিনপ্রকার যোগ বিষয়ে অধিকারের হেতু বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে নির্বিণ্ণ (কর্মসমূহের প্রতি অনাসক্ত), অতএব কর্মত্যাগী ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ, কামী অর্থাৎ কর্মসমূহের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্মযোগ আর যদৃচ্ছাক্রমে (অর্থাৎ কোন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও তাঁহার কৃপাহেতু) আমার কথা প্রভৃতিতে জাতশ্রদ্ধ, অথচ বিরক্ত বা অতি আসক্ত নহে ঐরূপ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। এই তিনপ্রকার যোগের মধ্যে যাহারা নির্বিণ্ণ অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয় ও প্রতিষ্ঠামূলক সুখের প্রতি বিরক্ত অর্থাৎ যাহাদের দৃঢ়ভাবে মুক্তিবাঞ্ছা জন্মিয়াছে, তাহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ সিদ্ধিদায়ক। যাহারা কামী অর্থাৎ পূর্বোক্ত সুখসমূহের প্রতি অনুরাগযুক্ত থাকায় কর্ম ত্যাগ করিতে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে কর্মযোগ সিদ্ধিদায়ক অর্থাৎ তাহাদের সংকল্প অনুযায়ী ফলদায়ক।

এস্থানে 'যদৃচ্ছা'র অর্থ পরমস্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ ও তাঁহাদের কৃপা-হেতু যে অনির্বচনীয় মঙ্গলের উদয় হইলে (আমার কথা প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়)।

শ্রীল জীবপাদের উপর্যুক্ত উক্তি হইতে জানা গেল যে আকস্মিক মহৎসঙ্গ ও কৃপায় ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্তনাদিতে শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিই ভক্তিযোগের অধিকারী। এস্থানে **শ্রদ্ধা** অর্থ ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্তনাদিতেই সর্বার্থসিদ্ধি হইবে, এইরূপ সুদৃঢ়নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস। এই বিশ্বাস যাহার হয় নাই তাহার কদাপি কর্মফলভোগের প্রতি বৈরাগ্য জাত হয় নাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং সে ব্যক্তি কামী অর্থাৎ ভোগের প্রতি আসক্ত। উক্ত অধিকারে (কর্মাধিকারে) সে ভক্তি করিলেও তাহা **রাজসী ও তামসীরূপ সকামা ভক্তিতেই** পর্যবসিত হইয়া থাকে। এইপ্রকার ভক্তির ফল সংসারবন্ধন। ইহা বিমুখতাবিশেষ। এই হেতু ইহা উপরোক্ত তিনপ্রকার সাম্মুখ্যের (জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও এই উভয়ের দ্বারস্বরূপ কর্মার্পণ বা কর্মযোগের) মধ্যে কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নহে, বরং ইহা ভক্তির প্রতি প্রচ্ছন্ন অশ্রদ্ধার নিদর্শন। অতএব ভক্তিসাধনেচ্ছুর পক্ষে এইপ্রকার ভক্তি (রাজসী ও তামসী ভক্তি) সর্বথা পরিত্যাজ্য।

রজস্তমোগুণাক্রান্ত কর্মাধিকারীর জন্য শ্রীল জীবপাদ ভক্তির দ্বারস্বরূপ কর্মার্পণের ব্যবস্থাই করিয়াছেন। "তদেবমীশ্বর-জ্ঞানাভাবাদ্ভক্তাবশ্রদ্দধানস্য দোষ উক্তঃ। অথ তচ্ছ্রদ্ধাহেতু-তজ্জ্ঞানস্য স্বধর্মসংযুক্তং তদর্চনমেব কারণমুপদিশংস্তা-দৃশার্চনস্যাপ্যব্যর্থতামঙ্গীকরোতি ॥ (শ্রীভা: ৩।২৯।২৫)—'অর্চাদাবর্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥' তাবদেব স্বকর্মকৃৎ সন্নর্চাদাবর্চয়েদ্যাবৎ সর্বভূতেষ্ববস্থিতমীশ্বরং মাং ন বেদ, ন জানাতি; অত্র স্বকর্মসহায়ত্বমজাতশ্রদ্ধস্য, শুদ্ধভক্তাবনধিকারাৎ। তৎ প্রতিপাদয়িষ্যতে (শ্রীভা: ১১।২০।২৭)—'জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু' ইত্যাদিনা। অতো ভগবজ্জ্ঞানাদূর্দ্ধং জাতশ্রদ্ধস্তু স্বকর্মকৃৎ সন্ ন অর্চয়েৎ, কিন্তু শুদ্ধমর্চাদিকমেব কুর্বীতেত্যায়াতম্ ॥ (শ্রীভ: স: ১০৬ অনু:)।

অর্থাৎ এইপ্রকার ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানের অভাবহেতু ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির দোষ উক্ত হইয়াছে। ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধার কারণস্বরূপ ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিতে হইলে স্বধর্মযুক্ত ভগবদর্চনই যে তাহার একমাত্র সাধন, ইহা উপদেশ দিতে গিয়া সেই অর্চনের অব্যর্থতা স্বীকার করা হইয়াছে। যেপর্যন্ত সর্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরস্বরূপ আমাকে নিজহৃদয়ে জানিতে না পারে, সেপর্যন্তই সাধক স্বকর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক অর্চাদিতে অর্চনা করিবে। এইস্থলে **অজাতশ্রদ্ধ ব্যক্তির** সম্পর্কেই স্বকর্মের (বর্ণাশ্রমোচিত বিবিধ কর্তব্যকর্মের) সহায়তা উক্ত হইয়াছে। 'আমার কথার প্রতি জাতশ্রদ্ধ' ইত্যাদি শ্লোকেই ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এপ্রসঙ্গে শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ—

"তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"

(শ্রীভা: ১১।২০।৯)

অর্থাৎ যেপর্যন্ত ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের প্রতি সম্পূর্ণ বিরক্তির উদয় হয় নাই, সেপর্যন্ত জ্ঞানপিপাসুকে কর্ম করিতে হইবে আর যেপর্যন্ত আমার কথার প্রতি যাদৃচ্ছিক (মহৎকৃপাজনিত) শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই অর্থাৎ **'ভগবৎকথা শ্রবণাদির দ্বারা সর্বার্থসিদ্ধি হইবে'—এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে নাই, সেপর্যন্ত ভক্তিকামীকেও কর্ম করিতে হইবে।** অবশ্য এস্থানে কেবল কর্ম করিবার উপদেশ দেওয়া হয় নাই। এই কর্মের ফল শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ ভগবৎ সন্তোষার্থ কর্মার্পণের দ্বারা ভগবজ্জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। এসম্পর্কে শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল জীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন (শ্রীভা: ১।৫।৩৫)—"যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎপরিতোষণম্। জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্ ॥" ইত্যত্র চ ভক্তিযোগসহচরত্বাৎ জ্ঞানমত্র ভগবজ্জ্ঞানম্। (শ্রীভ: স: ২২৪ অনু:)।

'সংসারে মানবগণ ভগবানের পরিতোষণাত্মক যে কর্ম অনুষ্ঠান করেন, ভক্তিযোগসমন্বিত জ্ঞান তাহার অধীন অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন হয়।' এস্থানে ভক্তিযোগের সহচররূপে উল্লেখ হেতু এই জ্ঞান ভগবজ্জ্ঞান, পরন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান নহে অর্থাৎ এই জ্ঞান ভক্তিলাভের সহায়ক হইয়া থাকে, ইহা জানা যায়।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, শ্রীহরিকথায় শ্রদ্ধাহীন কর্মাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষাৎ সাম্মুখ্যরূপ ভক্তির দ্বারভূত কর্মার্পণই শ্রেয়স্কর। ভক্তমহতের সঙ্গে থাকিয়া ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে প্রত্যেক জীবকে সম্মানদানপূর্বক শ্রীবাসুদেবের সন্তোষার্থ কর্মার্পণ করিলে চিত্তশুদ্ধি ও ভগবজ্জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। কেবল কর্মার্পণ ভক্তিলাভের সাক্ষাৎ কারণ নহে। কর্মার্পণকালীন মহৎসঙ্গই ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে" (শ্রীভা: ১।২।৬) শ্লোকে শ্রীভগবানের সন্তোষার্থ তাঁহাতে সমর্পিত কর্মে (বা শ্রীভগবানে কর্মার্পণরূপ প্রাথমিক ভাগবতধর্মে) **শুদ্ধভক্তির পূর্বাঙ্গরূপ 'সাধুসঙ্গ'কেই 'পরধর্ম' বলা হইয়াছে।** কারণ এই সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রীভগবানের কথা শ্রবণাদিতে রুচির উদয় হইয়া থাকে। মহৎসঙ্গ ও তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেবল বর্ণাশ্রমধর্মপালন বা কর্মার্পণ কোনটিই জীবহৃদয়ে শ্রীভগবানের সন্তোষচিন্তার উদয় করাইতে পারে না।

এই সম্পর্কে শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (১৮৪ অনু:) উল্লেখ করিয়াছেন— "সৎসঙ্গমস্যৈব পরমসংস্কারহেতুত্বাত্তদর্থং ন পুরুষস্য সংস্কারহেত্বন্তরমপেক্ষ্যঞ্চ।" অর্থাৎ **সৎসঙ্গই জীবের চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সংস্কারের শ্রেষ্ঠ কারণ বলিয়া জীবের পক্ষে সেই সংস্কারলাভের জন্য অন্য কোন কারণের অপেক্ষা করিতে হয় না।**

সাধুসঙ্গে এইপ্রকার কর্মার্পণ (অর্থাৎ কায়দ্বারা শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা) পরিত্যাগপূর্বক কেবল অনবধানতাযুক্ত হরিনামের অভিনয়দ্বারা ভক্ত্যুন্মুখ সংস্কারের বৃদ্ধি হওয়ার পরিবর্তে ভক্তিবিরোধী দম্ভ বৃদ্ধি পাইয়া জীবকে অধঃপাতিত করায়। যে হরিনামকীর্তন বা হরিকথাপ্রচার করিয়া ধন, শিষ্য ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে, তাহার ভক্তি হইতেছে বলিয়া বৃথা দম্ভবৃদ্ধি হয় এবং সে উপরোক্ত রাজসী সকামা ভক্তির ফলকে ধন, জন ও প্রতিষ্ঠার আকারে আত্মসাৎ করিয়া তাহার সংসারবন্ধনকেই দৃঢ় করিয়া থাকে। এইরূপ কর্মাধিকারী সাধকের জন্য 'নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥' শ্লোক উপদিষ্ট হয় নাই। কারণ উক্ত শ্লোকের অর্থ হইল নামাপরাধী অবিশ্রান্ত **'হরিনাম'** করিলে, সেই নাম তাহার সমস্ত অপরাধ দূর করেন। কিন্তু কর্মাধিকারী শ্রীহরিনাম করিবার ছলনায় অযত্নশীল ও অনবধান হইয়া হরিনাম করিবার দ্বারা তাহার **'নাম'**-এর পরিবর্তে **'নামাপরাধ'**ই হইয়া থাকে। নামাপরাধের দ্বারা নামাপরাধ খণ্ডনের কথা ত উপরোক্ত শ্লোকে বলা হয় নাই। সুতরাং কর্মাধিকারীর জন্য যে উপরোক্ত শ্লোক উদ্দিষ্ট নহে, তাহা সুস্পষ্ট।

মহতের সেবাদ্বারাই শ্রীহরিকথা-শ্রবণযোগ্যতা লাভ হয়। প্রথমে মহতের বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরিচর্যা বা সেবা, তাহার পর শ্রবণ ও তাহার পর কীর্তন। ইহাই সাধনের ক্রম। অতএব নামকীর্তনের পূর্বে কিরূপে কীর্তন করিতে হইবে, সেসম্পর্কে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রথমে **শ্রবণ করিয়া তাঁহার বাণীকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবার যোগ্যতালাভের জন্য তাঁহার কায়িক পরিচর্যা একান্ত আবশ্যক**। এসম্পর্কে শ্রীল জীবপাদের উক্তি (শ্রীভ: স: ২৪৭ অনু:)—"তদেবং মহদাদিসেবা দর্শিতা। অস্যাশ্চ শ্রবণাদিতঃ পূর্বত্বম্ (শ্রীভা: ৫।৫।২)—'মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্' ইত্যুক্তেঃ। তেভ্যো মহদ্ভ্যস্তন্যদপি পরমমঙ্গলায়নং জায়তে; যথা—(ভা: ১১।২৬।২৮-৩১)—

তেষু নিত্যং মহাভাগ! মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্॥
তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥
ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি॥
যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥"

এইরূপে মহৎ প্রভৃতির সেবার কথা বলা হইল। **শ্রবণাদির পূর্বেই এই মহৎসেবার ব্যবস্থা**। কারণ মহৎসেবাই সংসারমুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গ নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই মহৎব্যক্তিগণের নিকট হইতে পরমমঙ্গলের অন্য পন্থারও সন্ধান পাওয়া যায়; যথা—"হে মহাভাগ! সেই মহাভাগ ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বদা আমার চরিতকথা আলোচিত হয় এবং সেইসব কথা শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা আমার প্রতি আসক্ত ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আগ্রহসহকারে এইসকল কথা শ্রবণ, কীর্তন ও অনুমোদন করেন, তাহারা অবশ্যই আমাতে ভক্তিলাভ করেন। অনন্তগুণশালী চিৎসুখ-অনুভবাত্মক-পরব্রহ্মস্বরূপ আমাতে ভক্তিলাভ হইলে সেই সাধুগণের আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। ভগবান্ অগ্নিদেবকে সেবা করিলে যেরূপ পুরুষের শীত, ভয় ও অন্ধকার দূর হয়, সেইরূপ সাধুগণের সেবা করিলে শীততুল্য কর্মজড়তা, সংসারভয় ও সংসারভয়ের মূল (অন্ধকারস্থানীয়) অজ্ঞান বিনষ্ট হয়।"

"নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥" (শ্রীভা: ১।২।১৮)

সর্বক্ষণ বৈষ্ণবের পরিচর্যা ও ভাগবত শ্রবণকীর্তন করিতে করিতে অভদ্র অর্থাৎ বিষয়বাসনা নষ্টপ্রায় হইলে উত্তমশ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অচলা ও বিক্ষেপরহিতা ভক্তির উদয় হয়।

এসম্পর্কে শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ ভাবার্থদীপিকা ৯ম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভে তাঁহার কৃত চতুর্থ শ্লোকে লিখিয়াছেন—"সদ্ধর্মশুদ্ধসত্ত্বানামন্তরঙ্গেশ-সৎকথা॥" অর্থাৎ সদ্ধর্মাচরণের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে ভগবান্ ও ভক্তগণের কথা অন্তরে প্রবেশ করে। 'সদ্ধর্মাচরণ' অর্থ শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষার্থ বর্ণাশ্রমধর্মপালন। এস্থানে শ্রীল স্বামিপাদ শ্রবণের পূর্বে শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যর্থে বর্ণাশ্রমধর্ম-পালন বা কর্মার্পণের উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীল জীবপাদ ও শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের উপরোক্ত উদাহরণসমূহ হইতে জানিতে পারা যায় যে, বর্ণাশ্রমধর্মে ব্যবস্থিত ভাগবতধর্মের প্রথম সোপানরূপ কর্মার্পণের সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতধর্মের পূর্বাঙ্গরূপা মহৎপরিচর্যার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে মহতের প্রসঙ্গরূপা সেবার (অর্থাৎ বাণী-শ্রবণের) যোগ্যতা লাভ হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীল শ্রীজীবপাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়া শ্রীল আচার্যদেব দেহাসক্ত ও কোমলশ্রদ্ধ ভক্তিসাধকের পক্ষে অনবধানতাযুক্ত শ্রীহরিনামগ্রহণ অপেক্ষা কায়দ্বারা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবার অধিক উপাদেয়তার কথা উপদেশ করিয়াছেন।

অনেকে ৮।১০ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেও তিনি তাহাদিগকে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র প্রদান না করিয়া কায়িক বৈষ্ণবসেবাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার উপরোক্ত উপদেশের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অনেকে তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়াছে। ইহা তাহাদের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? শ্রীহরিনামগ্রহণের প্রথম ফল সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি (চেতোদর্পণমার্জনং) এবং কর্মার্পণের ফল আংশিক চিত্তশুদ্ধি। কিন্তু কায়দ্বারা গুরুবৈষ্ণবের সেবার ফলে শ্রীকৃষ্ণভক্তির জন্মমূল মহৎসঙ্গ হওয়ায়, প্রাথমিক অবস্থায় (কর্মাধিকারীর পক্ষে) ইহা শ্রীঘ্র ও অধিক মঙ্গলদায়ক। এই বিচারে শ্রীল আচার্যদেব আত্মমঙ্গলেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তিকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার্থ প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার এইরূপ উপদেশ যে আমাদের অধিকারোচিত, ইহা নিঃসন্দেহ। এসম্পর্কে এই দীন লেখকের প্রতি তাঁহার কৃপানির্দেশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মঠবাস করিবার সময় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কৃপাদেশে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীভক্তিসন্দর্ভব্যাখ্যা শ্রবণের উদ্দেশ্যে আমি শ্রীধাম মায়াপুরে গিয়াছিলাম। তথায় কিছুদিন শ্রীভক্তিসন্দর্ভব্যাখ্যা শ্রবণের পর আমি আন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত রাজমহেন্দ্রীর নিকট অবস্থিত কভুর মঠের সেবায় নিযুক্ত হইলাম। ভক্তিসন্দর্ভব্যাখ্যায় শ্রীহরিনামকীর্তনের মাহাত্ম্য এবং সাধনবিচারে ইহার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব কথা শ্রবণের পর শ্রীবিগ্রহের সেবার উদ্দেশ্যে শারীরিক শ্রম-বিনিয়োগাদিকে নিম্নাধিকারীর কৃত্য এবং সর্বদা হরিনামকীর্তনই উন্নত অধিকারীর সাধন, এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া আমি তথায় কোন সেবাকার্য না করিয়া সর্বদা শ্রীহরিনাম করিতে লাগিলাম। কিছুদিন এইরূপ করিবার পর মনে প্রশ্ন জাগিল যে, অন্য ব্রহ্মচারিগণ যখন শারীরিক শ্রম করিতেছেন, তখন আমি কেবল বসিয়া বসিয়া শ্রীহরিনাম করিতেছি, ইহা কতদূর সঙ্গত, জানিবার জন্য শ্রীল আচার্যদেবের নিকট পত্র

দিলাম। তাহার উত্তরে তিনি নিম্নমতে লিখিলেন—“তোমার পত্র পাইলাম। রজস্তমোগুণতাড়িত ব্যক্তির পশুবল যদি কোন দিন ভগবৎসেবায় লাগে তবে তাহার মঙ্গল হইবে।”

তাঁহার উক্ত পত্রের মর্ম এই যে, অযত্নসহকারে অনবধানতাযুক্ত শ্রীহরিনাম গ্রহণ অপেক্ষা কীর্তনমুখে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সন্তোষার্থ কায়িক সেবা করা নিম্নাধিকারে অধিক মঙ্গলপ্রদ। কারণ রজস্তমোগুণাক্রান্ত অধিকারে শ্রীহরিনামে অরুচি হেতু তাহাতে যত্নের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই শ্রীহরিনামকীর্তন সময়ে শ্রীনামপ্রভুর স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত না হইয়া দেহাত্মবোধজনিত বিষয়চিন্তায়ই চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে। ইহা অনবধানতা বা প্রমাদরূপ নামাপরাধবিশেষ। নামাপরাধশূন্য হইয়া শ্রীহরিনাম করাই বিধি। এইজন্য শ্রীল আচার্যদেব বলিলেন যে, এইরূপ নামাপরাধ করা অপেক্ষা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সন্তোষার্থ শারীরিক শ্রম বিনিয়োগ করা অধিক মঙ্গলপ্রদ। কারণ ইহার দ্বারা রজস্তমোগুণ দূর হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হইবে এবং শুদ্ধচিত্তে শ্রীহরিনামে রুচি জাত হইবে।

পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা ও শ্রীহরিনাম সম্পর্কে শিক্ষা

গৌড়ীয় মিশনে প্রথমে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ও পরে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র লাভ করিবার পর অনেকে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষালাভের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও এই পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষালাভ করিলে শ্রীবিগ্রহ-অর্চনের অধিকার লাভ করিয়া থাকে। সেইজন্য শ্রীহরিনামপ্রাপ্তি হইতে দীক্ষাপ্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনেকের ভ্রান্তধারণা ছিল। এই ধারণা দূর করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীল আচার্যদেব দীক্ষা ও শ্রীহরিনাম বিষয় প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া উভয়ের মধ্যে যে কোন ভেদ নাই এবং দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রীহরিনামপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা নিতান্ত অভক্তিপর বিচার, ইহা প্রদর্শন করিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভক্তি বলিতে শ্রীহরিনামগ্রহণকেই বুঝায়। “এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥” (শ্রীভা: ৬।৩।২২) শ্লোকের টীকায় শ্রীক্রমসন্দর্ভে শ্রীল জীবপাদ নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—“তন্নামগ্রহণাদিভিরিতি তৃতীয়া ‘প্রকৃত্যাভিরূপঃ’ ইতিবৎ। পুংসাং জীবমাত্রাণাং পরো ধর্মঃ সার্বভৌমো ধর্ম এতাবান্ স্মৃতঃ নৈতদধিকঃ। এতাবত্ত্বমেবাহ—তন্নামগ্রহণাদিভির্যো ভক্তিযোগঃ সাক্ষাদ্ভক্তিরিতি। এবকারেণান্য-ব্যাবৃত্তত্বং স্পষ্টয়তি,—ভগবতীতি। নামগ্রহণাদীন্যপি যদি কর্মাদৌ তৎসাদ্গুণ্যাদ্যর্থং প্রযুজ্যন্তে, তদা তস্য ধর্মস্য পরত্বং নাস্তি,—তুচ্ছফলার্থং প্রযুক্তত্বেন তদপরাধা-দিত্যর্থঃ; তথৈব ক্ষয়িষ্ণুফলদাতৃত্বঞ্চ ভবতীতি ভাবঃ।”

অর্থাৎ **কেবলমাত্র ভগবন্নামগ্রহণই প্রাণিগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম—ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।** ইহা বলিবার তাৎপর্য এই যে, শ্রীভগবন্নামগ্রহণই সাক্ষাদ্ভক্তি। 'এব' শব্দ প্রয়োগদ্বারা সাধনের অন্য মার্গ যে নিবারিত হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট। অধিকন্তু, এই ভক্তি একমাত্র ভগবানের সন্তোষবিধানের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠেয়। নামগ্রহণাদি যদি স্বসুখার্থ কাম্য কর্মের ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহা পরমধর্ম হইবে না। কারণ তুচ্ছফলের (অর্থাৎ কাম্য কর্মের নশ্বর ফলের) উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহা একপ্রকার নামাপরাধ হইয়া থাকে এবং ইহা ক্ষয়িষ্ণু ফল মাত্র দিয়া থাকে।

'প্রকৃত্যাদিভ্যঃ তৃতীয়া'—প্রকৃতি প্রভৃতিভ্যঃ তৃতীয়া স্যাৎ অভেদে। অর্থাৎ 'প্রকৃতি' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়; যথা—'মধু প্রকৃত্যা মধুরম্' অর্থাৎ মধু স্বভাবতঃ মধুর। এস্থানে মধু ও মধুরতা একার্থব্যঞ্জক। সেইরূপ ভগবন্নামগ্রহণই সাক্ষাদ্ভক্তি। নামগ্রহণ করিলে ভক্তি হইবে, এইরূপ বলিলে নামগ্রহণের সার্বভৌমত্বের হানি হয়। অতএব শ্রীভগবন্নামগ্রহণই জীবমাত্রের পরম ধর্ম বা ভাগবতধর্মের পরাকাষ্ঠা, ইহা শ্রীল জীবপাদের উক্তিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এরূপস্থলে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাপ্রাপ্তিকে শ্রীহরিনামপ্রাপ্তি হইতে কোনমতে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করা অযৌক্তিক। যাহারা অত্যন্ত দেহাসক্ত ও বিক্ষিপ্তচিত্ত, তাহাদিগকে চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্মমিশ্র অর্চনের সুযোগ দেওয়ার জন্য দীক্ষার ব্যবস্থা। অতএব ইহা শ্রীহরিনামগ্রহণের নিম্ন সোপান, কোনওমতে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। কর্মমিশ্র অর্চনের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে শ্রীহরিনাম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইবেন।

এইসব উদাহরণদ্বারা শ্রীল আচার্যদেব পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাগ্রহণ যে শ্রীহরিনামগ্রহণ হইতে কোনওমতে শ্রেষ্ঠ নহে তাহা ব্যক্ত করিয়া সকলের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাঁহার অভিলষিত শিষ্যের স্বরূপ

কি মঠবাসী, কি গৃহস্থ, গৌড়ীয় মিশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হইবার পর সকলেই শ্রীল আচার্যদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা গ্রহণের আশা পোষণ করিতেন। কিন্তু তিনি কাহাকেও শ্রীহরিনাম বা দীক্ষা দিতে ইচ্ছা করিতেন না। কারণ শ্রীহরিনামপ্রাপ্তি বা দীক্ষাপ্রাপ্তিরূপ অনুষ্ঠান হইয়া গেলেই যে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যাইবে, একথা নহে। শ্রীগুরুদেবের

সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনপ্রয়াসী প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে সত্য সত্য তাঁহার কৃপালাভের জন্য ব্যাকুলতা জাগা আবশ্যক। ইহার উদাহরণ শ্রীল প্রতাপরুদ্রদেব। এক দিকে শ্রীমন্মহাপ্রভু রাজদর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অন্য দিকে শ্রীপ্রতাপরুদ্রও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা না পাইলে প্রাণত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কৃপালাভের জন্য শ্রীপ্রতাপরুদ্রের এইরূপ ব্যাকুলতা ও অচলা নিষ্ঠা দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। সেইরূপ শিষ্যত্বকামী ব্যক্তিগণকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বহু বৎসর ধরিয়া অপেক্ষায় থাকিলেও শ্রীল আচার্যদেব তাহাদিগকে শ্রীহরিনাম বা দীক্ষা দেন নাই। ফলে অনেকে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। যে কয়েকজন তাঁহার কৃপালাভের উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়া রহিলেন, তিনি তাহাদিগকে কৃপা করিলেন।

মাপিবার বুদ্ধি লইয়া যাহারা তাঁহার নিকট আসিত অর্থাৎ গুরুদেব কত সময় নিদ্রা যান, কি কি আচরণ করেন, কত সময় হরিনাম করেন—এইপ্রকার কৌতূহল লইয়া যাহারা তাঁহার নিকট আসিত তিনি তাহাদিগকে দেখামাত্র গম্ভীর হইয়া যাইতেন, তাহাদের সঙ্গে কোনও কথা বলিতেন না। যে সত্য সত্য কিরূপে শ্রীগুরুকৃপা পাইবে বলিয়া নিষ্কপট হৃদয়ে শ্রীভগবানের নিকট সক্রন্দন প্রার্থনা জানায়, কেবল সেই ব্যক্তিই তাঁহার কৃপা পাইয়া থাকে। সে বহুদূরে থাকিলেও তাহার প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি সতত বিদ্যমান থাকে।

বিদ্যালয়ে একটি শ্রেণী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গেলে যেরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতায় কিছু বৃদ্ধি হইল বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রথমে শ্রীহরিনামগ্রহণদ্বারা প্রথম শ্রেণী, দীক্ষালাভের পর দ্বিতীয় শ্রেণী এবং সন্ন্যাসলাভের পর তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলাম বলিয়া যাহাদের বিচার হয়, তাহারা ভক্তি হইতে বহু দূরে অবস্থিত। তাহাদের গুরুকরণের জন্য যে ব্যাকুলতা, তাহা প্রকৃত শিষ্য হওয়ার উদ্দেশ্যে নহে; পরন্তু বেশাদি গ্রহণ করিয়া গুরু হওয়ার উদ্দেশ্যেই। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিতে বেশাদির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। সুতরাং বেশাদির প্রতি যে আগ্রহ তাহা ভক্তিলাভের জন্য নহে, প্রতিষ্ঠারূপ অন্যাভিলাষ-চরিতার্থের জন্যই উদ্দিষ্ট। এইপ্রকার মনোবৃত্তি ভক্তির পরিপন্থী। এইরূপ অবস্থায় বেশাদির প্রতি বিন্দুমাত্রও আগ্রহ প্রদর্শন না করিয়া শ্রীগুরুদেবের উপদেশ সম্যক্ পালনপূর্বক তাঁহার প্রীতিভাজন হইতে যত্নবান্ হওয়াই ভক্তিসাধকের মুখ্য কর্তব্য।

প্রীতিশূন্য অনুষ্ঠানের বাহ্যাড়ম্বর হইতে ভক্তি বহু দূরে। গুরুকরণরূপ বাহ্য অনুষ্ঠান হইয়া গেলে যে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া গেল,

এই বিচার ভ্রমাত্মক। শিষ্য শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে কিরূপ সম্পর্ক রাখিবে তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ **' (১১।২।৩৭) শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে 'গুরুদেবতাত্মা' বলিয়া একটি পদ আছে। যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবকে দেবতা অর্থাৎ পূজ্য এবং আত্মা অর্থাৎ প্রিয়তম জ্ঞান করে তাহাকেই গুরুদেবতাত্মা বলা হয়। যে শ্রীগুরুদেবকে মাপিতে না গিয়া তাঁহার প্রতি স্বতঃ প্রীতিযুক্ত হইয়া সর্বদা তাঁহার সন্তোষবিধানে ব্রতী হইবে, সেই প্রকৃত শিষ্যপদবাচ্য। সেই হেতু কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না, হৃদয়ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে।

শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ-স্থাপনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণের সম্পর্কে শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীমুখোক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।—"আমার সহিত নিত্যসম্বন্ধ রাখিতে অভিলাষী সকলকে আমার দুষ্ট চিত্ত শোধন-নিমিত্ত সাক্ষাদ্ভাবে শ্রৌতসিদ্ধান্ত কীর্তনপূর্বক শ্রবণ করাইয়া এবং পরীক্ষা দিয়া দুঃখীকে সুখী করিতে হইবে—ইহাই এই অকিঞ্চন শ্রীপুরীদাসের নম্র নিবেদন। এই পরীক্ষার জন্য পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য কিম্বা ঐশ্বর্য প্রভৃতির আবশ্যকতা নাই। এই পরীক্ষার কষ্টিপাথর—**(১) মহতের শ্রীপাদপদ্মে আদরমূলক হৃদয়ভরা দৈন্য, (২) চক্ষুতে অকপট অশ্রু, (৩) শ্রীহরিনামে রুচি ও (৪) শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি।**"

কেবলমাত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্যার্জনদ্বারা কিম্বা নির্জন ভজনের অভিনয়ের দ্বারা আত্মসন্তোষ লাভ করিলেও আচরণদ্বারা শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে উপরোক্ত চারিটি বিষয়ে সাক্ষাৎ অনুমোদন পাইতে না পরিলে কেহই তাঁহার শিষ্যপদবাচ্য হইতে পারিবে না। দেশাতীত ও বেশাতীত শ্রীভগবদাবেশে অভিনিবিষ্ট হইবার জন্য যে আনুকূল্যময় দৈন্য, যে অশ্রু, যে অনুশীলন, যে ধ্যান, তাহাই শিষ্য হইবার একমাত্র যোগ্যতা। সর্বক্ষণ শ্রীগুরুদেবের প্রতি মমতাবোধের জন্য ব্যাকুল হইয়া কর্মার্পণ করিলে এই যোগ্যতা লাভ হয়। এই যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি না দিয়া নিজের প্রাকৃত যোগ্যতাকে সম্বল করিয়া আনুষ্ঠানিক গুরুকরণে প্রয়াসী ব্যক্তি কদাপি শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিবে না। অতএব শ্রীগুরুদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য অভিলাষী প্রত্যেক ব্যক্তির প্রথমে উপরোক্ত যোগ্যতা অর্জন করা একান্ত আবশ্যক। তখন শ্রীগুরুদেব তাহাকে বাহ্যতঃ শিষ্যরূপে অঙ্গীকার না করিলেও সে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইবে না। বৃষ্টি না হইলেও চাতকের মন যেরূপ বৃষ্টিজল ব্যতীত অন্যত্র যায় না, সেইরূপ শ্রীগুরুদেব তাহাকে শিষ্য না করিলেও সে স্থিরচিত্তে

কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার কৃপালাভের জন্যই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়া থাকে। সে মনে করে, "আমার শিষ্য হইবার যোগ্যতা দেখিলে গুরুদেব অবশ্যই আমাকে কৃপা করিবেন। অতএব এক বৎসর বা দুইবৎসর কেন, এই জন্মেও যদি তিনি আমাকে শিষ্য না করেন, তবুও আমি হতোৎসাহ না হইয়া ভাবিব যে, আমার শিষ্য হইবার যোগ্যতা হয় নাই। এই জন্মেই হউক বা অন্য যে কোন জন্মেই হউক আমার শিষ্য হইবার যোগ্যতা দেখিলেই তিনি নিশ্চিতরূপে আমাকে শিষ্যরূপে অঙ্গীকার করিবেন।" যে প্রকৃত শিষ্যত্বপ্রার্থী, তাহার এইরূপ বিচার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

দেখা গিয়াছে, অনেক ব্যক্তি তাঁহার এইরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য গুরু বরণ করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের কথা এই যে, যে কয়েক জন ব্যক্তি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য গুরু বরণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই গুরু সাজিয়া হাজার হাজার শিষ্য করিয়াছে।

এস্থানে মনে রাখিতে হইবে যে, গুরুকরণ ভক্তির একটি অঙ্গ। ভক্তির প্রত্যেকটি অঙ্গ শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষের উদ্দেশ্যেই করণীয়। সেইরূপ গুরুকরণও নিজের মঙ্গল বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে না হইয়া শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষের জন্যই হওয়া বিধেয়। যিনি শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ কামনা করেন, তিনি অবশ্যই তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত ভৌতিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। এতাদৃশ ব্যক্তির গুরুর অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক। গুরুদেব তাহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার নিকট আসিবেন। কারণ তাহার ন্যায় একটি শিষ্য পাইতে তিনিও সর্বদা ব্যাকুল; যেহেতু গুরু পাওয়া গেলেও উপযুক্ত শিষ্য দুর্লভ। একটি সৎশিষ্য যথেষ্ট, কিন্তু অন্যাভিলাষী বহু শিষ্যের কোন প্রয়োজন নাই। তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন— "অবৈষ্ণব সঙ্গ বহু শিষ্য না করিবে।" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৬৪)।

শ্রীল আচার্যদেব প্রায় বলিতেন, "আমার অন্যাভিলাষী এক কোটি শিষ্যের দরকার নাই। ইষ্টদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যে যে সমস্ত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, সেইরূপ একটি শিষ্য হইলেই যথেষ্ট। কিন্তু সেইরূপ একটিও শিষ্য পাইলেন না বলিয়া তিনি কত যে ব্যথিত হইয়াছেন এবং কত যে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত।

ভক্তিযাজনের অধিকারী ও ভক্তভাগবত সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ

শ্রীমন্মহাপ্রভু অভিধেয় প্রসঙ্গে শিক্ষা দিতে গিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন—

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা-অনুসারী॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপূণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যার।
'উত্তম অধিকারী' সেই তরয়ে সংসার॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম অধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান্॥
যাহার কোমলশ্রদ্ধা সে 'কনিষ্ঠ-জন'।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৩৮-৪১)

উপর্যুক্ত পয়ারের অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া 'উত্তম অধিকারী'কে উত্তম ভাগবত, 'মধ্যম অধিকারী'কে মধ্যম ভাগবত ও 'কনিষ্ঠ অধিকারী'কে কনিষ্ঠ ভাগবত বলিয়া অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে। আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কয়েকটি সংস্করণে 'উত্তম অধিকারী সেই **তারয়ে** সংসার' পাঠও রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা **'তরয়ে'** হইবে বলিয়া শ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন। শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া যাঁহার শ্রদ্ধা দৃঢ় হইয়াছে, তিনি ভক্তিযাজন করিবার উত্তম অধিকারী বা উত্তম পাত্র এবং তিনিই সংসার তরিয়া যান অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। ভক্তিশাস্ত্রে দৃঢ়শ্রদ্ধা বা সংসারমুক্তি বা শরণাগতি সমতাৎপর্যপর কথা। যাঁহার দৃঢ় অর্থাৎ শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনি শ্রীভগবানের শরণাগত, অতএব তাঁহার সংসারও ক্ষয়োন্মুখ। দৃঢ়শ্রদ্ধা সম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়॥ (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৩৭)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলেই সমস্ত কর্ম কৃত হইয়া যায়, স্বতন্ত্রভাবে আর কোন কর্ম করিবার আবশ্যকতা থাকে না। এইরূপ দৃঢ় ধারণা হৃদয়ে পোষণপূর্বক যে কর্মকাণ্ডের প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে দৃঢ়শ্রদ্ধালু বলা হয়। এই দৃঢ়শ্রদ্ধালুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিযাজনের উত্তম অধিকারী বা উত্তম পাত্র বলিয়াছেন। এই ভূমিকার পর হইতে যে

ভক্তির সাধন, তাহা 'সাধনভক্তি'পর্যায়ভুক্ত। ইহার পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান 'সাধনক্রিয়া'—সাধনভক্তি নহে।

এসম্পর্কে শ্রীল রূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নিম্নোক্তমতে বর্ণনা করিয়াছেন—

"শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৭)

যিনি শাস্ত্রজ্ঞানে ও শাস্ত্রানুগত যুক্তিতে নিপুণ অর্থাৎ তত্ত্ববিচার, সাধনবিচার এবং পুরুষার্থবিচারাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য ও প্রীতির পাত্র—এই সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ এবং যাঁহার শ্রদ্ধা অত্যন্ত গাঢ়, ভক্তিতে তিনিই উত্তম অধিকারী বলিয়া কথিত হন।

এই ভূমিকার অব্যবহিত পরে ইঁহার শ্রীকৃষ্ণে রত্যঙ্কুর জাত হইবে এবং ইনি শুদ্ধভক্তিসাধক হিসাবে গণ্য হইবেন। ইঁহার এই অবস্থাকে মুখ্য কনিষ্ঠভাগবত ভূমিকা বলা হয়। ইহার পর ইনি কনিষ্ঠসোপানাশ্রিত মধ্যম মহাভাগবত ভূমিকায় যাইবেন। কিন্তু এই মুখ্যকনিষ্ঠভাগবত ভূমিকাকে অনেকে 'উত্তম মহাভাগবত ভূমিকা' মনে করিয়া ভ্রমে নিপতিত হন। শ্রীল আচার্যদেব শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে উদাহরণ দিয়া ইহা যে কনিষ্ঠভাগবত-ভূমিকা, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া আমাদের ভ্রান্তি দূর করিয়াছিলেন এবং **'তারয়ে সংসার'** পাঠ পরিবর্তে **'তরয়ে সংসার'** পাঠকে শুদ্ধ বলিয়াছিলেন।

"শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্॥"

এই পয়ার সম্বন্ধে তিনি শ্রীল রূপপাদের নিম্ন উক্তি উদ্ধার করিয়া বুঝাইয়াছিলেন—

"যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৮)

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রাদিতে নিপুণ নহেন অর্থাৎ শাস্ত্রবিবাদ উপস্থিত হইলে যিনি স্বপক্ষ-সমাধানে অসমর্থ অথচ শ্রদ্ধাবান্, তিনি মধ্যম অধিকারী।

"শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।"—এই পয়ারের অনেক সংস্করণে "দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু শ্রীল আচার্যদেব 'দৃঢ়' পদের পরে ',' (কমা) ও তাহার পরে 'শ্রদ্ধাবান্' পাঠকে ঠিক বলিলেন। তদনুসারে

বুঝা গেল যে মধ্যম অধিকারী শ্রদ্ধালু সত্য, কিন্তু উত্তম অধিকারীর ন্যায় দৃঢ়শ্রদ্ধ নহে।

"যাহার কোমলশ্রদ্ধা সে 'কনিষ্ঠজন'।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥"

এসম্পর্কে তিনি বলিলেন যে, এই কোমলশ্রদ্ধা বা লৌকিকী শ্রদ্ধা থাকা অবস্থায় সাধকের শ্রীভগবান্ ও তজ্জাতীয় বস্তুর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস থাকে না। কোনও সময়ে বিশ্বাস আসে ত' কখন আবার অবিশ্বাসও আসে। সাধুসঙ্গে শ্রীহরিকথার শ্রবণ-কীর্তন প্রভাবে এই সাধকের ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া থাকে। এই ব্যক্তি ভক্তি করিতে আরম্ভ করিতেছে মাত্র।

এইরূপে বুঝাইয়া কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম—এই ত্রিবিধ অধিকারী যে ত্রিবিধ ভাগবত নহেন তাহা সকলকে জানাইলেন। এই ত্রিবিধ অধিকারী যথাক্রমে কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠ, মধ্যম-কনিষ্ঠ ও মুখ্য-কনিষ্ঠ-ভাগবত অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই কনিষ্ঠ ভাগবত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

কনিষ্ঠ ভাগবত কর্মাধিকারী হইলেও মহৎকৃপায় ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার অনুষ্ঠিত ভক্তি কর্মমিশ্রা হওয়ায় 'সগুণা'। এস্থলে অনুষ্ঠিত ভক্তির বাহ্য আকার ঠিক থাকিলেও ইহা সাধকের রজস্তমোগুণ রঞ্জিত হইয়া 'কর্মমিশ্রা ভক্তি' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য ইহাকে সাধনভক্তি না বলিয়া 'সাধনক্রিয়া' বলা হয়। ভক্তমহতের সঙ্গ ও কৃপার প্রভাবে তাহার হৃদয়ে শ্রীভগবানের সন্তোষচিন্তার উদয় হওয়ায় সে শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে এই সাধনক্রিয়া বা কর্মার্পণ করে। ইহার ফলে মুখ্য কনিষ্ঠ ভাগবত-ভূমিকায় তাহার শরণাগতি দৃঢ় হইয়া সংসারমুক্তি হয়। তাহার পরে তাহার শ্রীকৃষ্ণে রত্যঙ্কুর জাত হয়। তখন তাহাকে কনিষ্ঠ সোপানাশ্রিত মধ্যম মহাভাগবত বলা হয়। স্বরূপশক্তির প্রেরণায় শ্রীগুরুদেব তাহার উপযুক্ত অধিকার জানিতে পারিয়া তাহাকে বাহ্যে শ্রীহরিনাম-কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে অষ্টকাল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাচিন্তায় মগ্ন থাকিতে উপদেশ করেন। ইহাই তাহার 'পরাঙ্গরূপ গুরুকরণ'। এই ভূমিকায় তাহার অনুষ্ঠিত ভক্তি 'সাধনভক্তি' ও সে 'ভক্ত-ভাগবত' বা গৌড়ীয়-সাধক-পর্যায়ভুক্ত। রতি ও প্রেমের তারতম্য অনুসারেই ভক্ত-ভাগবতের বা গৌড়ীয় সাধকের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে।

ভক্তভাগবতের তারতম্য বিষয়ে বলিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"রতিপ্রেম-তারতম্যে ভক্ত-তরতম।
একাদশস্কন্ধে তার কহিয়াছে লক্ষণ ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৪২)

শিষ্যত্বপ্রার্থীর অধিকার বিচার না করিয়া অজাতরতি কোমলশ্রদ্ধ সাধককে বাবাজী(পরমহংস)বেশ দিয়া অষ্টকালীয় লীলাস্মরণের উপদেশ দেওয়া যে একটি জগন্নাশকর কার্য ইহাতে দ্বিমত হইবার কিছুই নাই। ইহার দ্বারা সাধকের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রতিলাভ ত' হয়ই না, বরং কর্মার্পণ না করায় ক্রমউল্লঙ্ঘন হেতু তাহার পতন অনিবার্য হইয়া পড়ে।

ভক্তি জীবের চেষ্টাসাধ্য নহে

শ্রীভক্তিসন্দর্ভাদি ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীল আচার্যদেব স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন যে, ভক্তি জীবের চেষ্টাসাধ্য নহে। ইহা হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বা স্বভাব। পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ জগজ্জীবকে তাঁহার সেবা দিয়া কৃতার্থ করিবার মানসে তাঁহার হ্লাদিনীশক্তিকে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে নিত্যকাল নিক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু জীবহৃদয় প্রাকৃত রজস্তমোগুণে পরিপূর্ণ থাকায় অপ্রাকৃত হ্লাদিনীশক্তি তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। মহৎকৃপায় যাঁহারা কর্মার্পণদ্বারা হৃদয়কে রজস্তমোগুণমুক্ত করিয়াছেন, হ্লাদিনীশক্তি তাঁহাদের হৃদয়েই প্রবেশ করিয়া ভগবৎপ্রীতিরূপে অবস্থান করিতেছেন। অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তি রজস্তমোগুণমুক্ত জীবহৃদয়ে প্রবেশ করিবার পর তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিবার প্রবৃত্তি সঞ্চার করেন। সাধনভক্তির প্রভাবে সেই প্রবৃত্তি বর্ধিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম (মমতাধিক্য) উদয় করায়। এই প্রেম বা প্রীতি অনুভব করিয়া শ্রীভগবান্‌ও ভক্তগণের প্রতি অতিশয় প্রীতিমান্ হন।

এইজন্য শ্রীল জীবপাদ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভের ৬৫তম অনুচ্ছেদে বলিলেন—"তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষেব নিক্ষিপ্যমাণা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি।" এস্থানে 'ভক্তবৃন্দেষেব নিক্ষিপ্যমাণা' বলিবার তাৎপর্য এই যে, ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণদ্বারা যাঁহাদের হৃদয় রজস্তমোগুণমুক্ত হইয়াছে, এইরূপ ভক্তগণের হৃদয়েই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি অবস্থান করেন।

শ্রীল জীবপাদের উক্তি হইতে জানা যায় যে, হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তি অপ্রাকৃত। পরমাত্মবৈভব তটস্থাখ্য মায়াবদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয় প্রাকৃত। অতএব প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত ভক্তিযাজন অসম্ভব। সেইজন্য শ্রীল রূপপাদ বলিলেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২৩৪)

শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি (নামী শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন হওয়ায়) প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণীয় হন না। জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় সেবোন্মুখ হইলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান-উদ্দেশ্যে তাঁহার নামাদি গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে, সেই জিহ্বাদিতে শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি স্বতঃ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন। এখানে 'সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়' বলিতে হ্লাদিনীশক্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়কেই বুঝাইতেছে।

এসম্পর্কে কাশীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রকে বলিয়াছিলেন—

"অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ-বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ১৭।১২৯-১৩০)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপর্যুক্ত উক্তি হইতেও জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ-গুণাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের ন্যায় অপ্রাকৃত হওয়ায় ইহা জীবের প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না, অথচ সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

অতএব এস্থানে সাধন বলিতে কেবল ইন্দ্রিয়কে সেবোন্মুখ করিবার চেষ্টাকেই বুঝাইতেছে। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে যে ভক্তি করা যায় তাহা বাহিরে ভক্তির ন্যায় দেখা গেলেও ভক্তি নহে—ভক্ত্যাভাসমাত্র। শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সেই ভক্ত্যাভাসের দ্বারা ক্রমশঃ রজস্তমোগুণ হৃদয় হইতে অপসৃত হইলে তাহাতে হ্লাদিনী শক্তি প্রবেশ করেন। জীবের সাধনচেষ্টার বা সাধনক্রিয়ার এইখানেই পরিসমাপ্তি হইল। ইহার পর হ্লাদিনীশক্তি জীবের ইন্দ্রিয়কে স্বীয় তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাইয়া তাহাকে ভক্তি করিবার প্রেরণা দেন। এই ভূমিকায় ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ায় জীবের চেষ্টার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। যতদিন পর্যন্ত জীবের চেষ্টায় ভক্তি করা হয় ততদিন ইহা গুণীভূতা ভক্তি বা ভক্ত্যাভাস হইতে থাকে, ভক্তি হয় না।

সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে ভক্তি করা হইতেছে, তাহাই শুদ্ধভক্তি এবং এইপ্রকার সাধনের ফলে প্রেমলাভ হইতে পারিবে। এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার ফলে সগুণা ভক্তিকে নির্গুণা ভক্তি জ্ঞান করিয়া দম্ভবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই ধারণা ভক্তিসাধনের পরিপন্থী। শ্রীল আচার্যদেব ভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যাকালে 'ভক্তি প্রাকৃতেন্দ্রিয়সাধ্য নহে'—ইহা বুঝাইয়া সকলের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাঁহারা নিষ্কপট, তাঁহারা

শ্রীল আচার্যদেবের উপদেশে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্মার্পণ (স্বার্থত্যাগ) করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিতে তৎপর হইলেন এবং তাঁহারা যে শুদ্ধভক্ত নহেন, এই ধারণা তাঁহাদের দৃঢ় হইল। ফলে তাঁহারা দৈন্যার্ত্তিযুক্ত হইয়া নিষ্ঠাসহকারে ইষ্টদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্মার্পণে ব্রতী হইলেন। ইহাই প্রকৃতপক্ষে অধিকারোচিত সাধন এবং এইরূপে ক্রমপন্থায় চলিলে মহতের কৃপায় ভক্তি অনায়াসলভ্য হইবে।

ব্রহ্মচারী, যতি ইত্যাদির বেশাদির শাস্ত্রীয় বিধান

যাঁহারা গৌড়ীয় মিশনে প্রবেশ করিতেন, পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষালাভের পর তাঁহারা ত্রিকচ্ছ গৈরিক বসন পরিধান করিতেন। পূর্ব হইতে মিশনে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছিল এবং এখনও অধিকাংশ স্থানে চলিতেছে। ব্রহ্মচারীর এইপ্রকার বেশ যে সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়, বিভিন্ন শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীল আচার্যদেব ইহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি উদ্ধার করিয়া সেসম্পর্কে গৌড়ীয় দ্বাবিংশ বর্ষ ৩০-৩৭ সংখ্যায় (২৬৭ পৃষ্ঠা) "ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতির বেশাদি-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান" শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বহু শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শনপূর্বক ত্যক্তাশ্রমিগণের বেশাদি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া আশ্রমিগণের বেশ ও কৃত্যাদি সম্বন্ধে যেসকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা হইতে আশ্রমিগণের বেশের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

"দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্ব্যাজ্জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ।
বসন্ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহুতঃ॥
মেখলাজিনদণ্ডাক্ষ-ব্রহ্মসূত্রকমণ্ডলূন্॥"

(শ্রীভা: ১১।১৭।২২-২৩)

দ্বিজ অর্থাৎ ত্রৈবর্ণিক পুরুষ গর্ভাধানাদি সংস্কারক্রমে উপনয়নরূপ দ্বিতীয় জন্ম লাভ করত আচার্যের দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীগুরুকুলে বাস করিবে এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বেদপাঠ করিবে। সে মেখলা, অজিন, দণ্ড, অক্ষমালা, যজ্ঞোপবীত ও কমণ্ডলু ধারণ করিবে।

অন্যত্র শ্রীনারদ ব্রহ্মচারিগণের বেশ ও কৃত্যাদি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্ দান্তো গুরোর্হিতম্।
আচরন্ দাসবন্নীচো গুরৌ সুদৃঢ়সৌহৃদঃ॥

মেখলাজিনবাসাংসি জটাদণ্ডকমণ্ডলূন্।
বিভৃয়াদুপবীতঞ্চ দর্ভপাণির্যথোদিতম্ ॥" (শ্রীভা: ৭।১২।১,৪)

জিতেন্দ্রিয়, প্রণত ও শ্রীগুরুদেবে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়া ব্রহ্মচারী দাসবৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের হিতাচরণপূর্বক গুরুকুলে বাস করিবে। সে যথাবিহিত মেখলা, মৃগচর্ম, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু, উপবীত ও হস্তে কুশ ধারণ করিবে।

শ্রীবিষ্ণুসংহিতায় আছে—"অথ ব্রহ্মচারিণাং গুরুকুলবাসঃ গুরৌ প্রিয়হিতাচরণং মেখলাদণ্ডাজিনোপবীতধারণম্; ব্রহ্মচারিণা মুণ্ডেন জটিলেন বা ভাব্যম্।" অর্থাৎ গুরুকুলে বাস, গুরুর প্রিয় ও হিত আচরণ, মেখলা, দণ্ড, অজিন ও উপবীত-ধারণ ব্রহ্মচারীর কর্তব্য। সে মুণ্ডিতমস্তক কিম্বা জটাধারীও হইতে পারে।

শ্রীবিষ্ণুসংহিতায় অন্যত্র আছে—"অথ ত্রিষু আশ্রমেষু পক্বকষায়ঃ **কৌপীনাচ্ছাদনমাত্রমেব বসনমাদদ্যাৎ।**"

ত্রিবিধ আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণের মধ্যে যে বিষয়রাগনির্মুক্ত হইবে, সে **কৌপীনের আচ্ছাদনযোগ্য বস্ত্র মাত্র ধারণ করিবে।**

এই কৌপীনাচ্ছাদন বাস সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর লিখিয়াছেন—

"বিভৃয়াচ্চেন্মুনির্বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্।
ত্যক্তং ন দণ্ডপাত্রাভ্যামন্যৎ কিঞ্চিদনাপদি ॥
(শ্রীভা: ১১।১৮।১৫)

টীকা—পরং কৌপীনাদন্যদ্বাসো ধারয়িতুমিচ্ছতি, তার্হি কৌপীনমাচ্ছাদ্যতে যাবতা তাবন্মাত্রমেব।"

অর্থাৎ যদি কেহ কৌপীন ব্যতীত অন্য বাস পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে যেপরিমাণ বস্ত্রদ্বারা কৌপীনাচ্ছাদন করা যাইতে পারে, সেই পরিমাণমাত্র বস্ত্র পরিধান করিবেন।

এইরূপ সমস্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর মেখলা ও অজিন কিম্বা কষায় বস্ত্রের কৌপীন ও তদাবরক বহির্বাস ধারণের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কোনও স্থানে ত্রিকচ্ছ কষায় বস্ত্র পরিধানের ব্যবস্থা নাই। কেবল গৃহস্থের পক্ষেই ত্রিকচ্ছ বসন পরিধানের ব্যবস্থা।

শৌচাদি-পরায়ণ গৃহস্থ বিপ্রের ত্রিকচ্ছ বসন পরিধান বিষয়ে স্মৃতিবাক্য—

"বামে পৃষ্ঠে তথা নাভৌ কক্ষত্রয়মুদাহৃতম্।
এভিঃ কক্ষৈঃ পরিধত্তে যো বিপ্রঃ স শুচিঃ স্মৃতঃ ॥"

বামভাগ, পৃষ্ঠ ও নাভি এই তিন স্থানকে কক্ষত্রয় বলা হয়। এই তিন কক্ষে যে ব্রাহ্মণ বস্ত্র পরিধান করেন, তিনি শুচি বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হন।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর গৃহস্থলীলায় ত্রিকচ্ছ বসন পরিধানের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন—

"ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
প্রকৃতি, নয়ন-দুই পরম চঞ্চল ॥" (শ্রীচৈ: ভা: মধ্য ৯।১৭০)

উপর্যুক্ত শাস্ত্রপ্রমাণসমূহ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—ইঁহারা সকলেই কৌপীনের আচ্ছাদনযোগ্য বহির্বাসমাত্র ধারণ করিবেন। অবশ্য যাহারা শুদ্ধভক্তিসাধক, তাহাদের পক্ষে কোন বেশগ্রহণের আবশ্যকতা নাই। ভক্তি দেশাতীত ও বেশাতীত। ভক্তিসাধনের ফলে 'যাবন্নির্বাহপ্রতিগ্রহ' বলিয়া একটি বৃত্তি স্বতঃ উদিত হয়। ইহার দ্বারা কি ত্যক্তগৃহ, কি গৃহস্থ প্রত্যেক ভক্তিসাধক অভাবসঙ্কোচের জন্য চেষ্টা করেন। অভাবসঙ্কোচের অর্থ জীবননির্বাহের জন্য নিতান্ত যতটুকু না হইলে না চলে, কেবল ততটুকুই সংগ্রহের চেষ্টা; তাহাও অনায়াসলব্ধ হইলে আরও উত্তম। তাহা না করিয়া বহুদ্রব্য-সংগ্রহে যত্ন ও তাহা লাভ না হইলে তজ্জনিত অভাববোধ ভক্তিসাধনের ব্যাঘাতক।

প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ভক্তিসাধনে কোন যোগ্যতার বা কোন বাহ্য বেশগ্রহণের আবশ্যকতার কথা শাস্ত্রে বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় বর্ণিত হয় নাই। কোনও ভক্তমহতের অনুসরণে কর্মার্পণ করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হইলে হৃদয় দৈন্যভারাক্রান্ত হয়। তখন সাধক শ্রীগুরুকৃষ্ণের কৃপালাভ-আশায় ব্যাকুল হইয়া সক্রন্দন প্রার্থনা করে। তদনন্তর মহৎকৃপায় তাহার বৈরাগ্য (অন্তর্নিষ্ঠা) স্বতঃ উদিত হয়। এই অবস্থা কি গৃহত্যাগী কি গৃহস্থ সকলেরই হইয়া থাকে।

এসম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৌড়ীয়ে (২।২৬।১৪) নিম্নমতে লিখিয়াছেন—"চিহ্নদ্বারা বা বেশ-গ্রহণ-রীতি-দর্শনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নির্দেশ হয় না। হরিভজনে নিষ্কপটতাই বৈষ্ণব-পরিচয়ের একমাত্র নিদর্শন।"

শ্রীল প্রভুপাদ তাৎকালিক আবশ্যকতা দৃষ্টিতে দৈব-বর্ণাশ্রমের বিধান প্রচলন করিয়া থাকিলেও অন্তরে তিনি যে বেশাদিতে কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, উপরোক্ত লেখাই তাহার প্রমাণ।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর নিত্যারাধ্য শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'পদ্যাবলী'তে, শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামী তাঁহার 'স্মরণপদ্ধতি'তে ও শ্রীল ধ্যানচন্দ্র তাঁর 'পদ্ধতি' গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন—

"কাষায়ান্ন চ ভোজনাদিনিয়মান্নো বা বনে বাসতো
ব্যাখ্যানাদথবা মুনিব্রতভরাচ্চিত্তোদ্ভবঃ ক্ষীয়তে।
কিন্তু স্ফীত-কলিন্দশৈলতনয়াতীরেষু বিক্রীড়তো
গোবিন্দস্য পদারবিন্দভজনারম্ভস্য লেশাদপি ॥"

কষায় অর্থাৎ গৈরিক বসন পরিধান, ভোজনাদির সংযমন, বনে বাস, শাস্ত্রব্যাখ্যা কিম্বা মুনিগণের ব্রতধারণদ্বারা কখনই হৃদ্‌রোগ কাম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু কলিন্দনন্দিনী শ্রীযমুনার তটপ্রদেশে বিবিধ ক্রীড়ারত শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম-ভজনারম্ভের লেশমাত্রেই হৃদ্‌রোগ কাম আনুষঙ্গিকভাবে বিদূরিত হয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকাম না হইলে জড়কাম দূর হইবে না। অতএব নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান-উদ্দেশ্যে যে অনুসন্ধান—অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের কামযজ্ঞের সমিধ হইবার জন্য যে প্রবল আর্তি, উৎকণ্ঠা ও অভিনিবেশ, তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইবার একমাত্র যোগ্যতা।

এইসব শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাইয়া শ্রীল আচার্যদেব বাহ্যবেশের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ না করিয়া অন্তর্নিষ্ঠা করিতে অর্থাৎ চিত্তকে রজস্তমোগুণমুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সর্বজীবহৃদয়ে নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীশক্তির অবস্থানযোগ্য করিতে সর্বদা উপদেশ দিয়াছেন।

'পঞ্চতত্ত্ব'-কীর্তন-সম্পর্কে শিক্ষা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যথাক্রমে সন্ধিনীশক্তিমদ্‌বিগ্রহ শ্রীবলদেবের ও শ্রীমহাবিষ্ণুর অবতার। এই তিন জন শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব। আর শ্রীগদাধর শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তগণের অগ্রণী—ভক্তাবতার। শ্রীগৌরহরিই এই পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শুদ্ধভক্তিকামিমাত্রেই এই পঞ্চতত্ত্বের নাম কীর্তন করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিম্নমতে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব কীর্তন করা হয়।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।"

শ্রীল আচার্যদেব নিম্নমতে পঞ্চতত্ত্ব কীর্তন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

"শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।"

এইরূপ কীর্তনের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে প্রথম ও দ্বিতীয়—উভয় পাদে চৌদ্দটি করিয়া অক্ষর রহিয়াছে। সেহেতু ইহা গান করিতে সহজ। তদুপরি ইহাতে প্রথমার্ধে তিন বিষ্ণুতত্ত্ব (শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু) ও দ্বিতীয়ার্ধে দুই ভক্ততত্ত্ব (শ্রীগদাধর ও শ্রীশ্রীবাস) আছেন। এই বিচারে তিনি তিন বিষ্ণুতত্ত্বকে এক পংক্তিতে এবং দুই ভক্ততত্ত্বকে আর এক পংক্তিতে রাখিয়াছেন। তাঁহার অনুগত গোষ্ঠী এখনও এই প্রণালীতে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীধামবাস-সম্পর্কে শিক্ষা

শ্রীধামের প্রতি ভোগবুদ্ধি না করিয়া—ধামরূপ শালগ্রাম দিয়া নিজের ভোগরূপ বাদাম ভাঙ্গিবার চেষ্টা না করিয়া ধামবাস করিলে মঙ্গল হইবে। শ্রীধামে বাস করিয়া ব্যবসায়াদি করা অপরাধ।

শ্রীধাম শ্রীভগবানের অঙ্গ বা বৈভব; তাই তাঁহার সহিত অভিন্ন। শ্রীভগবানের শরণাগত না হইলে শ্রীধামের কৃপা পাওয়া যাইবে না। শ্রীধামকে শ্রীভগবানের বৈভব জানিয়া নিজেকে শ্রীধামের ভোগ্য বা দৃশ্য জ্ঞান করিতে হইবে। তাহা না ভাবিয়া শ্রীধামের ভোক্তা সাজিলে অন্যান্য প্রাকৃত স্থানের ন্যায় সেখানেও জল, মাটি ও বৃক্ষ ইত্যাদির দর্শন হইবে। শ্রীভগবানের সন্ধিনীশক্তির পরিণতিই শ্রীধাম। সন্ধিনীশক্তিমদ্‌বিগ্রহ শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দই শ্রীধামরূপে কায় বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীধামকে ভগবৎসম্বন্ধিবস্তু—শ্রীভগবানের ন্যায় অখণ্ড, স্বতন্ত্র বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। ভগবদভিন্ন শ্রীধাম অখণ্ড, ব্যাপক ও বিভু। এইরূপ বিচারে শ্রীধামের কৃপাপ্রার্থনা করিতে করিতে তথায় বাস করিলে মঙ্গল হইবে। জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে শ্রীধামের ভূমি, জল ও বায়ুর দ্বারা জড়েন্দ্রিয়পোষণের দুর্বুদ্ধি করিয়া তথায় বাস করিলে অপরাধ অনিবার্য। জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে ধামবাস হইতে পারে—এই বিচারে ধামবাস করিলে মায়াতীত বস্তুকে মায়িক জ্ঞান করা হয়। ইহা অপরাধবিশেষ।

শ্রীধামপরিক্রমা করাও শ্রীধামসেবা। শ্রীভগবানের অভিন্ন হইলেও শ্রীধামে পাদস্পর্শদ্বারা দোষ হয় না। পাদদ্বারা সেবা হয়। শ্রীমন্দিরে বাস বা শ্রীধামবাস নবধা ভক্তির অন্যতম অঙ্গ পাদসেবনের অন্তর্গত। শ্রীধাম অধোক্ষজ বা স্বতঃ কর্তৃত্বধর্মবিশিষ্ট বস্তু, তিনি পদতাড়িত হইবার যোগ্য নহেন। শ্রদ্ধা ও রুচির সহিত শ্রীধাম বা শ্রীমন্দিরের প্রতি আরাধ্যজ্ঞানে তাঁহাতে অবস্থান করা উচিত। দৈন্য ও আর্তি সহ তাঁহাতে বাস করিলে ক্রমশঃ নিজের অযোগ্যতার উপলব্ধি হইবে। শ্রীধামের তৃণগুল্মাদিরও দাসত্ব প্রার্থনা করিয়া নিজের অযোগ্যতার জন্য নিজেকে ধিক্কার করিতে হইবে। দীন ও আর্তিযুক্ত হইয়া নিজেকে সর্বাপেক্ষা অধম, অযোগ্য ও সকলের কৃপার ভিখারি বলিয়া উপলব্ধি না করিলে শ্রীধামবাসের ফল পাওয়া যাইবে না। শ্রীধামের কৃপার আভাসেও মঙ্গল হইবে। অর্থাৎ শ্রীধামের চিন্ময়ত্ব উপলব্ধ না হইলেও শাস্ত্র ও মহাজনগণের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এবং শ্রীধামের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও শ্রীধামের সঙ্গাকাঙ্ক্ষা করিয়া কার্যানুরোধে দূরে থাকিলেও মঙ্গল হইবে।

সঙ্গে স্ত্রী থাকিলেও শ্রীধামবাস হইতে পারে। পরস্পর ভোগবুদ্ধি ছাড়িয়া বাস করিতে হইবে। ভোগবুদ্ধিপূর্বক ধামবাস গ্রামবাসের সঙ্গে সমান। যিনি অকিঞ্চন অর্থাৎ যাঁহার ইন্দ্রিয়সুখের জন্য স্পৃহা নাই, তিনি ইন্দ্রিয়কে শ্রীধাম ও শ্রীধামেশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন। সেইরূপ ব্যক্তি গৃহকেও ধামরূপে দর্শন করেন। মোট কথা শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজ জড়েন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধানরূপ স্বার্থকে যিনি বলি দিতে পারিয়াছেন, তাঁহার ধামবাস ও গৃহবাস সমান। কারণ তাঁহার গৃহেতেই ধামদর্শন হয়।

প্রাকৃত ভোগীর দৃষ্টিতে শ্রীধাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ন্যায় মনে হইলেও তাহা ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ বস্তু। শ্রীভগবানের প্রকট লীলার সহায়তার উদ্দেশ্যে অপ্রাকৃত শ্রীধামের এই মর্ত্যমণ্ডলে অবতরণ। ইহা জীবের প্রতি শ্রীধামের অশেষ কৃপা। কারণ শ্রীধাম যদি এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ না হইতেন তবে মায়াগ্রস্ত জীব তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ পাইত না।

এইরূপে শ্রীল আচার্যদেব সর্বদা শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার অভিলাষ লইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাপ্রার্থনামুখে ভোগস্পৃহা পরিত্যাগপূর্বক দীনহীনভাবে শ্রীধামে বাস করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বস্ত্রাবৃত-দেহে দণ্ডবৎপ্রণাম শাস্ত্রনিষিদ্ধ

শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিবার সময় দেহে জামা ইত্যাদি থাকা অনুচিত। বস্ত্রাবৃত-দেহে দণ্ডবৎপ্রণাম করা সেবাপরাধবিশেষ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকালে

শ্রীশিবানন্দ সেন প্রতিবৎসর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধাম পুরীতে আসিতেন। এক বৎসরের ঘটনা এস্থানে বর্ণিত হইতেছে।

একবার শ্রীশিবানন্দ বৈষ্ণবগণকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে আসিবার সময় কোন নদী পার হইবার পর সকলের পথকর হিসাব করিয়া ঘাটিয়ালকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সকলকে আগে পাঠাইয়া নিজে নদীর ঘাটে রহিলেন। অন্যসকলে নিকটস্থ একটি গ্রামের মধ্যে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিলেন। শ্রীশিবানন্দের ঘাট হইতে ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় প্রবল ক্ষুধায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীশিবানন্দকে গালি দিতে লাগিলেন। এই সময় শ্রীশিবানন্দ আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট পৌঁছাইলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে এক লাথি মারিলেন। স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ তাঁহার দেহে লাগিল বলিয়া তিনি মহা আনন্দিত হইলেন এবং শীঘ্র গিয়া বাসস্থান ও ভোজনের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে সুখী করিলেন। এই ঘটনা দেখিয়া শ্রীশিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট অভিযোগ করিবার উদ্দেশ্যে সকলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী পুরী আসিয়া তাঁহার নিকট পৌঁছাইলেন। দেহে জামা রাখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিবার সময় গোবিন্দ তাঁহাকে জামা খুলিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করিতে বলিলেন। এসম্পর্কে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"পেটাঙ্গি* গায় করে দণ্ডবৎ নমস্কার।
গোবিন্দ কহে—শ্রীকান্ত! আগে পেটাঙ্গি উতার॥"

(অন্ত্য ১২।৩৬)

লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষা প্রত্যেক ভক্তিকামী ব্যক্তির অনুসরণীয় নহে কী?

বস্ত্রাবৃত দেহে প্রণাম সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্রীবরাহপুরাণবাক্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে—

"বস্ত্রপ্রাবৃতদেহস্তু যো নরঃ প্রণমেত মাম্।
শ্বিত্রী স জায়তে মূর্খঃ সপ্ত জন্মানি ভামিনি॥"

(শ্রীহ: ভ: বি: ১।৮।৩৯০)

অর্থাৎ হে ভামিনি! বস্ত্রাবৃত দেহে যে ব্যক্তি আমাকে (শ্রীভগবানকে) প্রণাম করে, সে সাতজন্ম পর্যন্ত শ্বেতকুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়।

---

*পেটাঙ্গি—জামা

অনাবৃত দেহে দণ্ডবৎ প্রণামের ফলসম্বন্ধে শ্রীস্কন্দপুরাণবচন—

"রেণুমণ্ডিতগাত্রস্য কণা দেহে ভবন্তি যৎ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥"

(শ্রীহ: ভ: বি: ১।৮।৩৭১)

অর্থাৎ (অনাবৃতদেহে) দণ্ডবৎ-প্রণত ব্যক্তির শরীরে যত ধূলিকণা লাগিয়া থাকে তত সহস্রবৎসর সে বিষ্ণুলোকে মহত্ত্ব পায়।

এইসব উদাহরণ দিয়া শ্রীল আচার্যদেব বস্ত্রাবৃত দেহে দণ্ডবৎপ্রণাম নিষেধ করিয়াছেন।

শ্রীভগবন্নামাঙ্কিত প্রস্তরফলকের উপর পদক্ষেপ অপরাধ

অনেকে পুণ্যলাভ-উদ্দেশ্যে প্রস্তরফলকে নিজের নাম অঙ্কিত করিয়া মন্দিরাদির প্রাঙ্গণে সংলগ্ন করেন। লোকে দর্শন করিতে যাইবার সময় সেইসব নামফলকে পা মাড়াইয়া যান। উক্ত প্রস্তরফলকসমূহে অধিকাংশ স্থলে ভগবদ্দাস্যসূচক নামই থাকে। শ্রীল আচার্যদেব উক্ত নামফলকের উপর যাতায়াত করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ সেই অক্ষরগুলি প্রাকৃত হইলেও শ্রীভগবানের নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তাঁহাতে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রাকৃত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সকল নাম নামী শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন। অতএব তাহাকে পদদলিত করিলে অপরাধ হওয়া সুনিশ্চিত। তজ্জন্য তাহাকে পদদলিত না করিতে শ্রীল আচার্যদেব আজ্ঞা করিয়াছেন। বোধহয় তাঁহার এরূপ শিক্ষা অন্যত্র বিরল।

মৃত্যুসময়ে ভক্তিযাজন

মৃত্যুসময়ে যে কোনমতে ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিলেই জীব কৃতার্থ হইয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন। এই কৃতার্থতা নিরপরাধত্বের উপরই একান্ত নির্ভরশীল। কেবল নিরপরাধ জীবই মৃত্যুসময়ে যেকোনও প্রকারে ভক্ত্যঙ্গ যাজনদ্বারা কৃতার্থ হইয়া থাকে।

শ্রীল আচার্যদেব আচার্য হইবার অল্প কিছুদিনের মধ্যে অনেক মঠবাসী সতীর্থ তাঁহার আচার্যত্বকে অস্বীকার করিয়া ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করিলেন। ইহার পরিণতি এরূপ হইল যে, শ্রীল আচার্যদেবের অনুগত লোকদিগকে তাহারা আক্রমণ পর্যন্ত করিলেন। তাহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া শ্রীল আচার্যদেবের অনুগত শ্রীকর্ণানন্দ নামক জনৈক মঠবাসী মৃত্যুবরণ করিলেন। এই ঘটনায় অধিকাংশ শিষ্য মত ব্যক্ত করিলেন যে, সে শ্রীগুরুসেবার জন্য প্রাণ দেওয়ায়

তাহার নিশ্চিতই সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। এপ্রসঙ্গে শ্রীল আচার্যদেবকে প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন, "নিরপরাধ হইলেই মৃত্যুসময়ে ভক্তির আকারমাত্রদ্বারা জীব কৃতার্থ হইয়া থাকে। কিন্তু নিরপরাধ জীবের সংখ্যা পৃথিবীতে অতি নগণ্য, নাই বলিলেও চলে। অপরাধ থাকিলে মৃত্যুসময়ে ভক্তিযাজন করিলেও মুক্তি হইবে না। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে কর্ণানন্দের হৃদয়ের ভাব কি ছিল, তাহা বিচার্য। সে যদি তমোগুণ-বিভাবিত হইয়া অপর পক্ষের সঙ্গে লড়াই করিয়া থাকে, তবে কেবল শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে ইহা করিতেছে বলিয়া তাহার পুণ্য হইতে পারে। কারণ তাহার সেই ভক্তি 'তামসী' পর্যায়ভুক্ত। 'রাজসী বা তামসী' ভক্তি সকামা। ইহাতে পুণ্যই হয়। কেবল 'সাত্ত্বিকী' ভক্তিতে মুক্তি হয়। ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণদ্বারা সংসারমুক্তি হইলে মহৎসঙ্গলাভ হয় এবং মহৎকৃপায় ভক্তিলাভ হইয়া থাকে। সে যদি শ্রীগুরুদেবের সন্তোষবিধানের উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জন করিয়া থাকে, তবে তাহার সংসারমুক্তি হইবে এবং পরজন্মে মহতের কৃপায় ভক্তিলাভ হইবে। সুতরাং বাহিরে কেবল ভক্তির আকার দেখিয়া কাহার কি ফল হইবে, বলা যায় না। ভক্তিযাজনের সঙ্গে হৃদয়ের ভাবের সংযোগ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। হৃদয়ের ভাব অনুযায়ী ভক্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে এবং ফলও ভাবানুরূপই হয়।"

এসম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নিম্ন উক্তি অনুসরণীয়।

"অন্তকালে চ মামেব **স্মরন্** মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
যং যং বাপি **স্মরন্** ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥" (৮।৫-৬)

অর্থাৎ অন্তকালে কেবল আমাকে **স্মরণ করিতে করিতে** যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি আমার ভাব লাভ করেন। অন্তকালে প্রাণী যে যে ভাব **স্মরণ করিতে করিতে** দেহত্যাগ করে, সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়, কারণ হে কুন্তীপুত্র! সর্বদা সে সেই সেই ভাবেই নিবিষ্ট বা তন্ময় থাকে।

উদাহরণস্বরূপ শ্রীল ভরত মহারাজ। তিনি মৃত্যুকালে হরিণশিশুর চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করায় পরজন্মে হরিণ জন্ম লাভ করিলেন। অতএব মৃত্যুকালে কেবল ভক্তির বাহ্য আকারমাত্র মুক্তির কারণ নহে—ভগবৎ-স্মৃতিই মুক্তিলাভের বা অবস্থাবিশেষে ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ। কেবল নিরপরাধ হইয়া থাকিলেই অজামিলাদির ন্যায় মৃত্যুর সময়ে ভক্তির আকারমাত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা সংসারমুক্তি হইয়া থাকে।

ছবিপূজা-সম্পর্কে শিক্ষা

কেবল মঠবাসী কেন, সকলেই প্রায় শ্রীভগবানের বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের ছবি (ফটো)র পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীল আচার্যদেব ইহাকে অশাস্ত্রীয় জানাইয়া এইরূপ পূজার বিরোধ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে কুত্রাপি ছবিপূজার ব্যবস্থা নাই, ইহা তিনি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া জানাইয়াছেন। ফটো মুদ্রিত হওয়ায় উহাকে 'আমুদ্র্য' বোলা যায়। শাস্ত্রে 'আমুদ্র্য'-পূজার ব্যবস্থা নাই, 'আলেখ্য'-পূজারই ব্যবস্থা আছে। আ-লিখ্-য (কর্মবাচ্যে) = আলেখ্য। যাহা সম্যগ্‌রূপে লিখিত বা চিত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই 'আলেখ্য'। যাহা তুলির সাহায্যে সম্যগ্‌রূপে লিখিত বা চিত্রিত নহে, উহা 'আলেখ্য' নহে। ক্যামেরার সাহায্যে যে ছবি তোলা যায় কিম্বা সেই ছবি হইতে ব্লক প্রস্তুত করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে যে প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়, তাহা 'আমুদ্র্য' নামে অভিহিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী প্রকাশিত 'আলেখ্য' নহে। আলেখ্যের সঙ্গে তুলিকার সংযোগ অনিবার্য। শ্রীভগবদর্চা নানা অধিষ্ঠানে প্রাদুর্ভূত হন। সেই প্রাদুর্ভাব বা আবির্ভাব মানবের মনোধর্ম বা উচ্ছৃঙ্খল চিত্তবৃত্তিপ্রসূত কোন ব্যাপার নহে। পূর্ব পূর্ব মহাজনগণ শাস্ত্রে যে সাধনপন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই সর্বদা অনুসরণীয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীঅর্চাবতারের প্রাদুর্ভাব-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে—

"ভক্ত্যৈব ভগবন্মূর্তি-প্রাদুর্ভাবোঽপি চেদ্ভবেৎ।
কর্তব্যোঽথাপ্যুপায়োঽত্র পূর্বৈঃ সদ্ভিঃ প্রদর্শিতঃ॥"

(শ্রীহ: ভ: বি: ২।১৮।৪)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—"অপি চেৎ যদ্যপি ভক্ত্যৈব, ন চ শিল্পাদিশক্ত্যা ভবেৎ, তথাপি অত্র ভগবন্মূর্তিপ্রাদুর্ভাবে উপায়ঃ সাধনমনুষ্ঠেয়ঃ **স চ ন স্বকল্পিতঃ, কিন্তু শাস্ত্রদ্বারা সাধুপরম্পরয়াভিব্যঞ্জিত** ইতি লিখতি পূর্বৈরিতি।"

যদিও একমাত্র ভক্তির দ্বারাই শ্রীঅর্চার আবির্ভাব হয়, শিল্পাদি শক্তিদ্বারা নহে, তথাপি শ্রীভগবন্মূর্তির প্রাদুর্ভাব উদ্দেশ্যে স্বকল্পিত কোন উপায় অনুষ্ঠেয় নহে। শাস্ত্রের দ্বারা সাধুপরম্পরায় প্রকাশিত উপায়ই অনুসরণীয়।

আজকাল বাজারে মোম (wax) ও প্লাষ্টার অফ্ প্যারিস প্রভৃতিতে বহু সুন্দর সুন্দর মূর্তি নির্মিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে। এসব মূর্তিকে কিনিয়া আনিয়া স্ত্রীপরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া শ্রীসীতা, শ্রীলক্ষ্মী বা শ্রীরাধার মূর্তি (?) ভাবিয়া পূজা করিলে তাহা শ্রীঅর্চাবতার বা শ্রীভগবন্মূর্তিপদবাচ্য হইবে না।

অপ্রাকৃত মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত যন্ত্র সাহায্যে শ্রীঅর্চাবতারের আবির্ভাব হইতে পারে না। শ্রীআলেখ্য অর্চাবতারবিশেষ; তিনি অবতীর্ণ হন, সৃষ্ট বা কল্পিত হন না।

শাস্ত্র শ্রীভগবানের যে অর্চার অধিষ্ঠানের কথা কীর্তন করিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে; সেখানে কোনও প্রকার জড় বিচার আনিতে হইবে না। শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥" (শ্রীভা: ১১।২৭।১২)

শাস্ত্রে অষ্টবিধা প্রতিমার কথা উক্ত হইয়াছে; যথা—শিলাময়ী, দারুময়ী, লৌহী অর্থাৎ স্বর্ণাদিময়ী, লেপ্যা অর্থাৎ মৃচ্চন্দনাদিময়ী, লেখ্যা অর্থাৎ পটাদিলিখিত-চিত্রময়ী, সৈকতী অর্থাৎ বালুকাময়ী, মনোময়ী, মণিময়ী অর্থাৎ সূর্যকান্তাদি মণিময়ী।

শ্রীভগবানের এই উক্তিকে অনুধ্যান করিলে আধুনিক যুগে যে 'ছবিপূজা' প্রচলিত হইতেছে, তাহা যে অশাস্ত্রীয় এবং শ্রীভগবানের ব্যবস্থিত বিধির বহির্ভূত তাহা সহজেই জানিতে পারা যায়। ক্যামেরায় তোলা কিম্বা মুদ্রাযন্ত্রে ছাপান শ্রীভগবানের ছবি (আমুদ্র্য)কে আলেখ্য জ্ঞানে অর্চন করা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। আবার অর্চার সহিত অর্চনোপকরণের স্পর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু কাচের দ্বারা ফটো বাঁধাইয়া তাহাকে অর্চারূপে পূজা করিতে গেলে তাহাতে চন্দন, তুলসী প্রভৃতি দ্রব্যের স্পর্শ হয় না। পট-লেপ্যা-লেখ্যাদি মূর্তিতে জলাদি উপকরণের পরিবর্তে শুষ্কবস্ত্রে পরিমার্জনাদি কর্তব্য। কিন্তু ফটোকে কাচে বাঁধাইয়া কাচের উপরে জলাদি দেওয়া অশাস্ত্রীয়।

শ্রীঅর্চামূর্তি সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ-বিগ্রহ। "প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (মধ্য ৫।৯৫) এই উক্তি হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, আগমকথিত বা শাস্ত্রকথিত প্রতিমা—'সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপ'। শ্রীল জীবপাদ শ্রীভগবৎবিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"স চ বিগ্রহো নিত্যঃ ঈশ্বরকরণত্বাৎ তজ্জ্ঞানাদিবদিতি; অতএব বিলক্ষণত্বমপি। জীবচ্ছবমিতি চৈতন্যযোগেন জীবত্ত্বম্, স্বতস্তু শবম্। ততঃ শ্রীভগবদ্বিগ্রহস্ত চিদেকরসত্বাৎ সদা জীবন্নেবেতি বৈলক্ষণ্যং যুক্তম্, নিত্যানন্দচিদ্রূপত্বা-দ্বুজনীয়ত্বং চ যুক্তমিতি ভাবঃ। (শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ৪৮ অনু:)।

পরমেশ্বরের জ্ঞানাদি যেরূপ নিত্য, তাঁহার শ্রীমূর্তি বা শ্রীবিগ্রহও সেইরূপ নিত্য। অতএব অন্যান্য প্রাণীর দেহ হইতে পরমেশ্বরের বিলক্ষণত্ব সিদ্ধ রহিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬০।৪৫) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরুক্মিণীর বাক্যে "জীবচ্ছবম্" অর্থাৎ 'জীবিত হইয়াও মৃত'—বাক্যাংশের তাৎপর্য এই যে, জীবদেহে চৈতন্যের সংযোগ হইলে চেতনের উন্মেষ হইয়া থাকে; নচেৎ সেই দেহ স্বতঃ 'অচেতন' বা 'শব'সদৃশ। শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ চেতন সাহায্যে জড়বস্তুর চেতনতালাভের ন্যায় নহে। কারণ তিনি 'চিদেকরস' অর্থাৎ চিৎ ব্যতীত তাঁহাতে অন্য কিছুই নাই। সচ্চিদানন্দ স্বরূপের শরীরও সচ্চিদানন্দময় অর্থাৎ সর্বক্ষণ নিত্যসিদ্ধভাবে জীবন্ত। এই নিত্য চিদ্ভাবে 'বৈলক্ষণ্য' সুসঙ্গত ও নিত্য আনন্দ চিদ্রূপ শ্রীভগবন্মূর্তির 'ভজনীয়তা'ও যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন—

"ত্বং ভক্তিযোগ-পরিভাবিত-হৃৎসরোজ
আস্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥" (শ্রীভা: ৩।৯।১১)

হে নাথ! (গুরুমুখে) আপনার কথা শ্রবণের পর লোকে ভক্তিপথের সন্ধান পান। আপনি আপনার নিজজনের ভক্তিযোগপূত হৃৎপদ্মে সর্বদা বিশ্রাম করেন। হে উত্তমঃশ্লোক! ভক্তগণ স্ব-স্ব (সিদ্ধদেহভাবগত) ভাবনানুযায়ী যেসকল নিত্য স্বরূপের চিন্তা করেন, আপনি তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন।

ক্যামেরায় বা মুদ্রাযন্ত্রে যেসব ছবির সৃষ্টি করা যায়, তাহা কখনও অর্চাবতার হইবে না। "ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব অবতার।" (শ্রীচৈ: চ: আদি ৩।৯০)।

শৈলী, দারুময়ী প্রভৃতি অষ্টবিধা প্রতিমার মধ্যে মনোময়ী অর্চাকে অষ্টমী প্রতিমা বলিয়া স্বতন্ত্ররূপে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "অর্চাদৌ হৃদয়ে চাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ" (শ্রীভা: ১১।৩।৫০)—অর্থাৎ অর্চাদিতে অথবা হৃদয়ে যথালব্ধ উপচারের দ্বারা অর্চন করিবে। এই উক্তিতে শ্রীআবির্হোত্র শ্রীনিমি মহারাজের নিকট হৃদয়ের মধ্যে পূজার স্বতন্ত্রতার কথা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ" (শ্রীভা: ৭।৫।২৩) শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবপাদ শ্রীক্রমসন্দর্ভে উল্লেখ করিয়াছেন যে প্রতিষ্ঠানপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ এইরূপ মানসপূজার অধিকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি মনোময়ী প্রতিমার পূজা করিয়া বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীশালগ্রামশিলা সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ। এসম্পর্কে শাস্ত্রে বহু প্রমাণ রহিয়াছে। শ্রীল জীবপাদও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৯৪তম অনুচ্ছেদে ইহার বিচার করিয়াছেন। শ্রীশালগ্রামকে শ্রীভগবদাকারসমূহের নিত্যসিদ্ধ অধিষ্ঠান বা নিত্যসিদ্ধ বৈকুণ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে। শাস্ত্রে আছে—"শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥" প্রেমিক ভক্তের নিকট শ্রীশালগ্রামশিলা যে কমনীয় মূর্তি ধারণ করেন, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর পূজিত শ্রীশালগ্রাম শ্রীরাধারমণরূপে প্রকটিত হইয়া আজও ইহার সাক্ষিরূপে শ্রীধাম বৃন্দাবনে বিদ্যমান রহিয়াছেন। শ্রীভগবদাকারের সমানরূপেই শ্রীপ্রতিমার ধ্যান করা হইয়া থাকে। কারণ সেখানে আকারগত ঐক্য রহিয়াছে। নিজ অভীষ্টদেবের সহিত শ্রীঅর্চামূর্তির বিন্দুমাত্রও ভেদ কল্পনা করিলে ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক বহু দোষ ও অপরাধ হইয়া থাকে। মহারাজ দশরথের দ্বারা বাণবিদ্ধ হইয়া অন্ধমুনির পুত্র মৃত্যুবরণ করিয়াছে জানিয়া অন্ধমুনি বিলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি কি কোন দিন শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহকে শিলাবুদ্ধি করিয়াছিলাম, যে অপরাধের ফলে আমার এইরূপ পুত্রশোক উপস্থিত হইল!" এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রীমূর্তিকে নিজাভীষ্ট শ্রীভগবৎস্বরূপ হইতে পৃথক্ কল্পনা করিলে ব্যাবহারিক অকল্যাণও উপস্থিত হয়।

শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে শ্রীমূর্তিপ্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে যে প্রমাণ আছে, তাহা হইতে জানা যায়—"বিষ্ণো! সন্নিহিতো ভব," অর্থাৎ হে বিষ্ণো! তুমি এই মূর্তিতে সন্নিহিত হও। পুনশ্চ মূর্তিতে শ্রীবিষ্ণুর সান্নিধ্য-সম্পাদক মন্ত্রবিশেষের পর এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"যচ্চ তে পরমং তত্ত্বং যচ্চ জ্ঞানময়ং বপুঃ।
তৎ সর্বমেকতো লীনমস্মিন্ দেহে বিবুধ্যতাম্ ॥"

অর্থাৎ (হে প্রভো!) তোমার যে পরমতত্ত্ব ও যে জ্ঞানময় বিগ্রহ, সেসব একরূপে এই শ্রীবিগ্রহে লীন হইয়াছে, ইহা জানিও। পরমোপাসকগণ শ্রীমূর্তিকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপে দর্শন করেন। বিন্দুমাত্র ভেদস্ফূর্তি হইলে ভক্তিবিচ্ছেদ হয় বলিয়া অভেদবুদ্ধিতে সেবাপূজা করা উচিৎ। "পরমোপাসকাশ্চ সাক্ষাৎপরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি; ভেদস্ফূর্তের্ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ্যুচিতম্। ইত্থমেবোক্তং শ্রীভগবতা। (শ্রীভা: ১১।২৭।৩২)—

"বস্ত্রোপবীতাভরণ-পত্রস্রগ্গন্ধলেপনৈঃ।
অলংকুর্বীত **সপ্রেম** মদ্ভক্তো **মাং** যথোচিতম্ ॥"

ইত্যত্র 'মা'মিতি 'সপ্রেমে'তি চ। অতএব শ্রীবিষ্ণুধর্মে তামধিকৃত্য শ্রীমদম্বরীষং প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্যম্—

"তস্যাং চিত্তং সমাবেশ্য ত্যজ চান্যান্ ব্যপাশ্রয়ান্।
পূজিতা সৈব তে ভক্ত্যা ধ্যাতা চৈবোপকারিণী ॥
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ভুঞ্জংস্তামেবাগ্রে চ পৃষ্ঠতঃ।
উপর্যধস্তথা পার্শ্বে চিন্তয়ংস্তামথাত্মনঃ ॥"

(শ্রীভ: স: ২৮৬ অনু:)

হে উদ্ধব! আমার ভক্ত প্রীতির সহিত আমাকে বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, পত্র, মাল্য, গন্ধ ও চন্দনাদির দ্বারা আমার যে অঙ্গের প্রতি যেটি উপযুক্ত, সেইভাবে সুশোভিত করিবে। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং **'মাং'** অর্থাৎ আমাকে **'সপ্রেম'** অর্থাৎ প্রীতির সহিত—এই দুইটি শব্দ প্রয়োগ করায় শ্রীমূর্ত্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে কোনরূপ ভেদ নাই, ইহা দেখাইয়াছেন। যদি শ্রীঅর্চার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনরূপ পার্থক্য থাকিত, তবে তিনি 'আমাকে' না বলিয়া 'প্রতিমা'কে এবং 'সপ্রেম' না বলিয়া 'সবিধি', এইরূপ উল্লেখ করিতেন।

শ্রীবিষ্ণুধর্মে শ্রীঅর্চাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের নিকট এইরূপ বলিয়াছেন—"সেই শ্রীমূর্তিতে চিত্তের আবেশ স্থাপন করিয়া অন্য বিষয়ে আবেশ ত্যাগ কর। ভক্তির সহিত অর্চন ও ধ্যান করিলে সেই অর্চাই তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। তুমি গমন, অবস্থান, শয়ন ও ভোজনের সময় সেই অর্চা নিজের সম্মুখে, পশ্চাতে, উপরে, নীচে ও নিকটে আছেন বলিয়া চিন্তা করিবে।"

অর্চন সম্পূর্ণ বিধিনিষ্ঠ। অতএব অর্চনে কোনপ্রকার মর্যাদা পরিত্যাজ্য নহে। শ্রীল জীবপাদ অর্চন প্রকরণে মর্যাদা বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্রীব্রহ্মযামলবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥"

(শ্রীভ: স: ২৮৪ অনু:)

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি প্রতিপাদ্য পঞ্চরাত্র বিধি ব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। অতএব শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্র, শ্রীমৎস্যপুরাণ, শ্রীসারদাতিলক, শ্রীক্রমদীপিকা ও শ্রীবিষ্ণুতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র যেসব অর্চাবতারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদেরই অর্চন করা কর্তব্য। কিন্তু ক্যামেরায় তোলা বা প্রেসে মুদ্রিত ও কাচের দ্বারা বাঁধান ছবি 'আলেখ্য'পদবাচ্য হইতে পারে না।

অতএব 'আলেখ্য'কে 'আমুদ্র্য' ও 'আমুদ্র্য'কে 'আলেখ্য' বলিয়া ভ্রম করিয়া কেহ যেন শাস্ত্রমর্যাদা লঙ্ঘন না করেন। আমুদ্র্যকে আলেখ্য বলিলে যেরূপ অপরাধ অনিবার্য, আলেখ্যকে আমুদ্র্যের সঙ্গে সমান জ্ঞান করাও সেইরূপ অপরাধজনক। আলেখ্য আমুদ্র্য নহে কিম্বা আমুদ্র্য আলেখ্য নহে। আলেখ্যই অর্চাবতার আর আমুদ্র্য মানবের সৃষ্ট বা কল্পিত জড়পদার্থবিশেষ।

এইসব সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ থাকিলেও ইহাকে লোকলোচনে আনয়ন করা এবং ছবিপূজা পরিবর্তে আলেখ্যপূজার প্রবর্তন করা শ্রীল আচার্যদেবের আচার্যত্বের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতি কশাঘাত

নিশ্চিন্ত জীবনযাপন যে ভক্তিসাধনের প্রধান প্রতিবন্ধক, একথা বলিয়া শ্রীল আচার্যদেব সর্বদা প্রত্যেক ভক্তিসাধককে সতর্ক করাইয়া দিতেন। ভক্তিযাজনে যাহার তৃপ্তি আসিয়া যায় অর্থাৎ যে বিচার করে—তাহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাজিত ভক্তিই শুদ্ধভক্তি, তখন সে কোন চিন্তা না করিয়া সর্বদা নিশ্চিন্ত থাকে। আর যাহারা সিদ্ধান্তের ধার ধারে না, ভক্তি কিরূপে হইবে সে বিষয়ে একবারও চিন্তা করে না, তাহারাও খাওয়া-দাওয়া করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। এই দুইপ্রকার নিশ্চিন্ত ব্যক্তির প্রতি শ্রীল আচার্যদেব খুব কঠোর মনোভাব প্রকাশ করিতেন।

প্রকৃতপক্ষে যে নিরপরাধ সে শ্রদ্ধাসহকারে মহন্মুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিলে অবশ্যই তাহার অন্তরে চিন্তার উদ্রেক হইবে। 'হরিভজন হইল না' বলিয়া অভাববোধ সর্বদা তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়া হৃদয়কে মথিত করিবে। 'দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, শ্রীগুরুপাদপদ্মে মমতা জাত হইল না, শ্রীহরিনামে রুচি হইল না, যে দিনটি চলিয়া গেল, তাহা ত আর ফিরিবে না'—এইরূপ হা-হুতাশ ভাব যাহার উদয় হয় নাই তাহার প্রকৃত সাধুসঙ্গও হয় নাই বুঝিতে হইবে। এই হা-হুতাশ, এই অভাববোধ, কোটিবৃশ্চিকদংশনন্যায় জ্বালাবোধ যাহার হয় নাই, সে পশুর সঙ্গে সমান। তজ্জন্য শ্রীল আচার্যদেব সবসময় বলিতেন—"নিশ্চিন্ত জীবন পশুজীবনের সঙ্গে সমান।" তিনিও যখন অন্যান্য বৈষ্ণবগণের নিকট পত্র দিতেন, তখন নিজেকে নানা ধিক্কার করিয়া লিখিতেন—"হরিভজন ত হইল না। এই দুঃসহ জীবনভার বৃথায় বহন করিতেছি। এ লজ্জা কাহার নিকটই বা প্রকাশ করিব?" অনুক্ষণ ভজনরত থাকিয়াও হরিভজন হইল না বলিয়া যে অন্তর্দাহ, কোটিবৃশ্চিকদংশনন্যায় যে জ্বালাবোধ,

শ্রীল আচার্যদেবের প্রত্যেক আচরণে ও উপদেশে তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি নিজে যাহা অনুক্ষণ অন্তরে অনুভব করিতেন, আচরণ ও উপদেশছলে অন্য সাধনানুরাগিগণকে তাহাই জানাইতেন।

যাহারা ভাগ্যবান্, তাহারা তাঁহার এই উপদেশের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া কোথায় ভক্তিসাধনে ত্রুটি রহিয়া যাইতেছে, তাহা সংশোধনের জন্য যত্নবান্ হইতেন। কিন্তু যাহারা দুর্ভাগা, তাহারা 'যেই তিমিরে সেই তিমিরে'ই থাকিয়া যান অর্থাৎ ভক্তিসাধনে যত্নবান্ হইয়া নিজের সাধনগত ত্রুটিকে দূর করিয়া কিভাবে সাধনে অগ্রগতি করিবেন, তজ্জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তা না করিয়া পশুবৎ নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করেন।

দেহারামীর উপর কশাঘাত

শ্রীল আচার্যদেব চিরদিনই দেহারামীর পরমশত্রু। হরিভজনপ্রয়াসী দেহারামকে প্রশ্রয় দিয়া কায়শাঠ্য করিলে কদাচ ভজনে অগ্রগতি করিতে পারিবে না। শারীরিক শ্রমকে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পণ করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া হৃদয়ে দৈন্যের উদ্রেক হইবে। যেখানে দৈন্যের আধিক্য সেইখানেই কৃপার আধিক্য। সুতরাং কায়শাঠ্য সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় সমস্ত শারীরিক শক্তি বিনিয়োগ করিতে হইবে—এই কথা তিনি সব সময় শিক্ষা দিতেন।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের কথা। এ অধম লেখক শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় গিয়াছিল। একদিন প্রাতঃকালে আমরা প্রায় ৫০।৬০ জন শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীচরণান্তিকে বসিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতেছিলাম। এই সময় শ্রীমুরারি দাস ও শ্রীত্রৈলোক্য দাস নামক দুইজন মঠবাসী বালক বাসীডালপূর্ণ একটি বড় পিতলের হাঁড়িতে একটি বাঁশ ভর্তি করিয়া কাঁধে বহিয়া গোশালায় লইয়া যাইতেছিল। এমন সময় হঠাৎ শ্রীল আচার্যদেবের চক্ষু তাহাদের উপর পড়িয়া গেল। তিনি তাহাদিগকে দেখামাত্র ক্রোধে জর্জরিত হইয়া বলিলেন—"এ কী! এত ছোট ছেলে দুজন ডালপূর্ণ এতবড় একটা হাঁড়ি কাঁধে বহন করিয়া লইতেছে! তাহাদের কত কষ্ট হইতেছে! আর তোমরা সকলে হরিকথা শুনিবার ছলনায় এখানে বসিয়া কায়শাঠ্যের প্রশ্রয় দিচ্ছ! হরিসেবা করিতে করিতে যদি কাহারও দেহপাত হইয়া যায়, তাহা হইলে দেবতাগণ স্বর্গে নৃত্য করিবেন। আর হরিসেবায় যে কায়শাঠ্য করিবে he should be brutally treated."

বজ্রগম্ভীর স্বরে এই কথা বলিয়া শ্রীল আচার্যদেব তৎক্ষণাৎই তথা হইতে উঠিয়া তাঁহার ভজনকুটীরে চলিয়া গেলেন। আমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ গিয়া ঐ ডালের হাঁড়ি লইয়া গোশালায় পৌঁছাইয়া দিল।

এইপ্রকারে তিনি নিষ্কপট হরিভজনার্থীর প্রতি যত স্নেহশীল, কপটী কায়শাঠ্যপরায়ণের প্রতি ততই কঠোর। তাঁহার কঠোর শাসন যাহারা সরল অন্তঃকরণে বরণ করিতে পারিয়াছে, তাহারা কায়শাঠ্য পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত জীবনীশক্তি শ্রীহরিসেবায় বিনিয়োগ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারিয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শিক্ষা

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের কথা। সেইসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রচণ্ড ভাবে চলিতেছিল। ভারতবর্ষের বড় বড় শহরে শত্রুপক্ষ বোমা নিক্ষেপ করিতেছিল। কেবল ভারতবাসী কেন, সমগ্র পৃথিবীবাসী যুদ্ধের বিভীষিকায় উদ্‌বিগ্ন ও পীড়িত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য নানা উপায়-উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিল। এই সময় শ্রীল আচার্যদেব শ্রীব্রজধামে অবস্থান করিয়া ব্রজভজনে রত ছিলেন। দেশবাসীর এই অবস্থা দেখিয়া তিনি শ্রীব্রজধাম হইতে নিম্নলিখিত জাগরয়িত্রী বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন—"বর্তমান দেশব্যাপী যুদ্ধের পরিস্থিতি যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে শ্রীমথুরাবাসী ও শ্রীব্রজবাসীর আনুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবতের স্তবাবলী নিত্য কীর্তন ও স্মরণ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ দেহাভিনিবেশহেতু শরীররক্ষাই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হইয়া যাইবে।"

তাঁহার নির্দেশানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত স্তব ও তৎসঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'স্থ তাহার বঙ্গানুবাদ গৌড়ীয় পত্রিকায় (২১শ খণ্ড ২৩-২৫শ সংখ্যা) প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥

(শ্রীভা: ১১।২।৩৭)

হরিমায়া দ্বারাই হরিবিমুখ জীবগণের স্বরূপের অস্ফূর্তি হয়। তাহা হইতে 'আমি দেহ'—এইরূপ অভিমান ও দেহাদিতে অভিনিবেশবশতঃ ভয়ের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই হেতু পণ্ডিতব্যক্তি শ্রীগুরুদেবকেই একমাত্র নিয়ামক ও প্রিয়তমরূপে উপলব্ধি করিয়া কর্মজ্ঞানাদিশূন্যা, শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা সুখানুসন্ধানময়ী ভক্তির দ্বারা মায়াধীশ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিবে।

জীব অনাদিকাল হইতে তার নিত্য প্রভু অশোক, অভয় ও অমৃতের আধার শ্রীভগবানের প্রতি বিমুখ হইয়া মায়াকবলিত হইয়াছে এবং মায়াসৃষ্ট জড়দেহপ্রতি আত্মবোধ করায় তাহার ভয় জাত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় সে মায়ারই ভজন করিয়া উক্ত ভয়ের হাত হইতে পরিত্রাণলাভের বৃথা চেষ্টায় সর্বদা রত থাকিয়াও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে না। পরদুঃখদুঃখী শ্রীজীব প্রভু জীবগণের এই ভবরোগের নিদান চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি শ্রীভক্তিসন্দর্ভের ৫৯তম অনুচ্ছেদে প্রকৃত 'অভী' (নির্ভয়) হইবার একমাত্র উপায় নির্দেশ করিয়া নিম্নমতে বর্ণনা করিয়াছেন—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ততে ভীঃ ॥

(শ্রীভা: ১১।২।৩৩)

এই সংসারে দেহাদি অসৎ-পদার্থে আত্মবুদ্ধিহেতু নিরন্তর উদ্বিগ্নচিত্ত মানবগণের পক্ষে শ্রীহরির চরণকমলযুগলের আরাধনাই সর্বভয়বিনাশন বলিয়া মনে করি।

লোকপিতামহ শ্রীব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন—

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥

(শ্রীভা: ৩।৯।৬)

অসদ্বস্তুতে 'আমি ও আমার' অভিমান ভয় ও শোকের মূল কারণ। হে ভগবন্! যেপর্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় শ্রীপাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করিয়াছে, সেপর্যন্ত তাহার অর্থ, দেহ ও আত্মীয়স্বজনাদির বিনাশ আশঙ্কায় ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় এসকল পাইবার জন্য স্পৃহা, তারপর তিরস্কার, তথাপি এসকলের জন্য বিপুল তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে।

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ সর্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ ॥

(শ্রীভা: ৩।৯।৭)

হে ভগবন্! ভবদীয় প্রসঙ্গ সমস্ত অমঙ্গল দূর করে। যাহারা আপনার সর্বদুঃখনিবর্তক শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইয়া লেশমাত্র বা লবমাত্র কামসুখ আশায় লোভাভিভূত হৃদয়ে নিরন্তর অমঙ্গলজনক কর্ম করে, তাহারা দৈবদ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া থাকে।

ক্ষুত্তৃট্ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্যমানাঃ শীতোষ্ণবাতবর্ষৈরিতরেতরাচ্চ।
কামাগ্নিনাচ্যুতরুষা চ সুদুর্ভরেণ সম্পশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে॥

(শ্রীভা: ৩।৯।৮)

অহো! শ্রীহরিকথাবিমুখ এই প্রজাগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও বাত-পিত্ত-কফদ্বারা এবং শীতোষ্ণবাত-বর্ষণদ্বারা পরস্পর মুহুর্মুহু পীড়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুঃসহ কামাগ্নি ও অবিচ্ছিন্ন ক্রোধযুক্ত হইয়া দুঃখ পাইতেছেন। হে উরুক্রম! ইহাদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার মন অবসন্ন হইতেছে।

যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থমায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা॥

(শ্রীভা: ৩।৯।৯)

হে ঈশ! মানব যেপর্যন্ত নিজের দেহাদি ধর্মকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, অর্থাৎ নিজের চেষ্টায় তাহার ইন্দ্রিয়চালনা হয় বলিয়া মনে করে, সেপর্যন্ত এই দুঃখপ্রদ সংসার অবাস্তব হইলেও নিবৃত্ত হয় না। সে সংসারনিবৃত্তির জন্য যাহা করে তদ্দ্বারা সংসারনিবৃত্তি পরিবর্তে দুঃখই লাভ হয়।

অহ্ন্যাপৃতার্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥

(শ্রীভা: ৩।৯।১০)

হে দেব! ঋষিগণও ভবদীয় শ্রবণ-কীর্তনরূপ প্রসঙ্গপ্রতি বিমুখ হইলে এই সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। দিবসে তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল ভগবদিতর বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট থাকে। রাত্রিতেও তাহাদের বিষয়সুখের লেশমাত্রও থাকে না। কারণ তাহারা গাঢ়নিদ্রাভিভূত হইলেও (নানা অসদ্‌বিষয়ে ধাবিত মনের ধর্মরূপ) স্বপ্নদর্শন দ্বারা তাহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের অর্থপ্রাপ্তির উদ্যমও দৈবদ্বারা সর্বতোভাবে প্রতিহত হয়।

শশ্বৎস্বরূপমহসৈব নিপীতভেদমোহায় বোধধিষণায় নমঃ পরস্মৈ।
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু নিমিত্তলীলারাসায় তে নম ইদং চকৃমেশ্বরায়॥

(শ্রীভা: ৩।৯।১৪)

হে ভগবন্! আপনার স্বরূপচেতনাদ্বারা ভেদভ্রম সর্বদা নিরস্ত হয়। বিদ্যাশক্তির আশ্রয় হওয়ায় আপনি পরতত্ত্ব; আপনাকে নমস্কার। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্তভূতা মায়ার বিলাসদ্বারা আপনার ক্রীড়া সম্পাদিত হয়। অতএব আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ মায়ার নিয়ন্তা। আমরা আপনাকে নমস্কার করিতেছি।

যস্যাবতারগুণকর্মবিড়ম্বনানি নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥
(শ্রীভা: ৩।৯।১৫)

যাঁহার 'দেবকীনন্দন' প্রভৃতি অবতারসূচক, 'ভক্তবৎসল' প্রভৃতি গুণসূচক ও 'গোবর্ধনধর' প্রভৃতি লীলাসূচক নামসমূহ প্রাণত্যাগকালে বিবশ হইয়াও যাহারা কেবল উচ্চারণ করেন, তাহারা বহুজন্মসঞ্চিত পাপরাশি হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া যে নিরস্তাবরণ সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হন, আমি সেই জন্মরহিত অর্থাৎ সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানে প্রপন্ন হইতেছে।

প্রকৃত অভী হইবার জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন জগদ্গুরু শ্রীব্রহ্মা। এতদ্ব্যতীত শ্রীকংসারির সংসারবাসনাশৃঙ্খলে আবদ্ধ, কৃষ্ণগতপ্রাণ, কৃষ্ণপ্রীতি-সর্বস্ব শ্রীমথুরাবাসী ও শ্রীব্রজবাসিগণও অনুরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন। অবশ্য এই ব্রজবাসী ও মথুরাবাসিগণের প্রার্থনায় যে বৈশিষ্ট্য আছে, একমাত্র অতিমর্ত্য প্রীতির রাগে যাঁহাদের হৃদয় রঞ্জিত, তাঁহারাই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যখন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপিণী দেবকীর গর্ভসিন্ধু হইতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবাসুদেব চতুর্ভুজ মূর্তি প্রকট করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন কংসকারাগারস্থ শ্রীবসুদেব কংসভয়ে ভীত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া নিম্নমতে শ্রীবাসুদেবকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন (শ্রীভা: ১০।৩।২৬-২৮)—

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াংস্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে ॥

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল ভাগবতাচার্য প্রভু উক্ত শ্লোকের পদ্যানুবাদ নিম্নমতে করিয়াছেন—

যদি বা বলিবা—'কালে করয়ে সংহার'।
কালরূপে আছে এক শকতি তোমার ॥
সেই কালে করে সৃষ্টি, পালন, প্রলয়।
সেই কাল তোমার লীলায় মাত্র হয় ॥
(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ১০।৩।৫০-৫১)

মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥

মৃত্যুভয়ে ব্যাকুল হইয়া এতকাল।
পলায়া কোথাহ লোক না পায় নিস্তার ॥
এখনে পদারবিন্দ করিয়া আশ্রয়।
সুখে লোক থাকিব, খণ্ডিব ভবভয় ॥
(শ্রীকৃ: প্রে: ত: ১০।৩।৫২-৫৩)

স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্নস্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভৃত্যবিত্রাসহাসি।
রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং মা প্রত্যক্ষং মাংসদৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ ॥

উগ্রসেনসুত কংস দুরন্ত নিষ্ঠুর।
তা'র ভয়ে আমি সব আছি বেয়াকুল ॥
'ভকতবৎসল' নাম করিয়া সফল।
ভৃত্যগণে পরিত্রাণ কর প্রাণেশ্বর ॥
যে রূপ যোগেন্দ্রগণ চিন্তয়ে ধেয়ানে।
চর্মচক্ষে সে রূপ দেখিব সর্বজনে ॥
পরতেক এ রূপ না কর নারায়ণ।
ধ্যানগম্য রূপ প্রভু কর সম্বরণ ॥

(শ্রীকৃ: প্রে: ত: ১০।৩।৫৪-৫৭)

শ্রীবসুদেবের শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার্থ কংসভয়ে ভীতির যে অভিনয় ও আত্মরক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে যে নিবেদন, তাহা বদ্ধজীবের দেহাত্মবোধরূপ কারণ হইতে উদ্ভূত নহে। অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণের সমগ্র সত্তা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পিত। তাঁহাদের দেহ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নৈবেদ্য বা ভোগোপকরণ। তাঁহাদের দেহ-দেহীতে প্রভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মই তাঁহাদের জীবাতু। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসর্বস্ব। তাঁহাদের আনখকেশাগ্র সমগ্র তনু শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময়। অতএব তাঁহাদের ভীতির অভিনয় প্রীতিপরাকাষ্ঠারই পরিচায়ক। তাঁহাদের দেহাত্মবোধ শ্রীকৃষ্ণাত্মবোধেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দলনলীলা দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসিগণ শ্রীকালিন্দীতটে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। রাত্রিতে হঠাৎ এক ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া নিদ্রিত ব্রজবাসিগণকে বেষ্টন করিয়াছিল। তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া এইরূপে স্তব করিয়াছিলেন (শ্রীভা: ১০।১৭।২৩-২৪)—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম।
এষ ঘোরতমো বহ্নিস্তাবকান্ গ্রসতে হি নঃ ॥
শরণ পশিলা সভে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাভাগ! কর পরিত্রাণে ॥
অমিতবিক্রম রাম! করুণাসাগর!
দাবানল চৌদিগে বেঢ়িল ঘোরতর ॥

(শ্রীকৃ: প্রে: ত: ১০।১৭।৪৪-৪৫)

সুদুস্তরান্নঃ স্বান্ পাহি কালাগ্নেঃ সুহৃদঃ প্রভো।
ন শক্নুমস্ত্বচ্চরণং সন্ত্যক্তুমকুতোভয়ম্ ॥

আমি-সব নিজজন, সেবক তোমার।
কাল-দাবানল হৈতে রাখ' একবার ॥
আগুনে পুড়ুক, তাহে নাহি বাসি ডর।
ছাড়িতে না পারি তোমার চরণ-কমল ॥

(শ্রীকৃ: প্রে: ত: ১০।১৭।৪৬-৪৭)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজবাসিগণের প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ একটি লীলা করিয়াছিলেন। নিজজনগণের এই কাতরভাব দর্শন করিয়া তিনি দাবানল পান করিয়া ফেলিলেন। অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করিবার ভয় ব্রজবাসিগণের ছিল না। কিন্তু মৃত্যু হইলে শ্রীকৃষ্ণের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবেন, সেই ভয়ে তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। মৃত্যু হইলে দেহ বিনষ্ট হইবে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি বিষয়সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে—এইরূপ ভয় দেহাত্মবাদিগণের। কিন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবৈকব্রত, সেই ব্রজবাসিগণের পক্ষে একমুহূর্তও শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকা অতিশয় অসহনীয়। অতএব, তাঁহাদের এইরূপ ভীতি শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিরই পরাকাষ্ঠা। দেহসর্বস্ব প্রাকৃত জীব ইহা কিরূপে বুঝিবে ?

পৃথিবীর দেহাত্মবাদী জীবগণের ন্যায় মৃত্যুভয়ে ভীত না হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে একান্ত শরণাগত হইয়া প্রত্যেক মঠবাসী শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত স্তবসমূহকে হৃদয়ের সহিত গান করিয়া তাহাদের তৎ তৎ স্থানে অবস্থান করিতে শ্রীল আচার্যদেব কৃপানির্দেশ দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে একান্ত শরণাগতি ব্যতীত শতচেষ্টাসত্ত্বেও জীব আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। তবে প্রণয়ী ভক্তগণের এই স্বভাব যে, তাঁহারা নিজের দেহের জন্য বিন্দুমাত্র ভাবনা না করিলেও শ্রীভগবানের জন্য সর্বক্ষণ চিন্তাগ্রস্ত। 'শ্রীকৃষ্ণের কোন অশুভ হইবে'—এই আশঙ্কায় শ্রীব্রজবাসিগণ সর্বদা ভীত। এই প্রতিবিম্বিত জগতে দেহাসক্তগণের যে স্বভাব, শ্রীগোলোকবৃন্দাবনে শ্রীব্রজবাসিগণের মধ্যে সেই স্বভাবই অত্যন্ত উপাদেয়রূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়া থাকে। তাই শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপ্রভুর প্রাণারাম শ্রীগোবর্ধনধারী গোপাল, শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর প্রাণধন শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীল সনাতনের প্রাণসর্বস্ব শ্রীমদনমোহনপ্রমুখ শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেবগণ ম্লেচ্ছউপদ্রবভয়ে প্রণয়ী ভক্তগণের দ্বারা স্থানান্তরে নীত হইয়াছিলেন। অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণ যেরূপ তাঁহাদের জীবাতু শ্রীকৃষ্ণকে ও গোধনসমূহকে দুরাত্মা কংসের কবল হইতে এবং দাবানল হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রগাঢ় প্রেমের স্বভাববশতঃ স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ অপ্রাকৃত ব্রজবাসিবর

শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অভীষ্টানুসারে বিভিন্ন মঠ হইতে শ্রীবিগ্রহগণকে ও গোধন-সমূহকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। এই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির মর্ম দেহাসক্ত ব্যক্তিগণ বুঝিতে না পারিয়া, তাহাদের ন্যায় ভগবদ্ভক্তগণও মৃত্যুভয়ে ভীত বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ যুক্তি করেন, "যদি ঠাকুর নিজেকে ও তাঁহার মন্দিরকে রক্ষা করিতে না পারিলেন, তবে তিনি অন্যকে আবার রক্ষা করিবেন কিরূপে ? আর তাঁহাকে সর্বশক্তিমান্ ভগবদ্বিগ্রহই বা বলা যাইবে কিরূপে ?"

দেহাত্মবাদিগণের মুখে এইরূপ কথা শোভা পাইতে পারে। শ্রীঅর্চাবতার যে আমাদের ভীষণতম অচেতনবৃত্তিনিবন্ধন পূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইয়াও অচেতনবৎ প্রতিভাত হইতেছেন, ইহা আধ্যক্ষিকতাপিশাচী বুঝিতে দেয় না। কিন্তু যাঁহারা মায়ানির্মুক্ত প্রণয়ী ব্রজবাসী, তাঁহারা শ্রীভগবৎতনুকে পরম সুকুমারবুদ্ধিতে প্রীতিযুক্ত হইয়া যেরূপ তাঁহার পরিচর্যা করেন, সেইরূপ সর্বরক্ষক শ্রীভগবদ্বিগ্রহকে প্রীতির স্বভাববশতঃ রক্ষ্যপ্রায় উপলব্ধি করিয়া তজ্জন্য অখিল চেষ্টা করিয়া থাকেন। অচেতন আধ্যক্ষিকের নিকট শ্রীসাক্ষিগোপাল নির্বাক প্রস্তর মূর্তি; কিন্তু সচেতন প্রণয়ী ভক্তের নিকট তিনি ভক্তের মর্যাদারক্ষার্থ বিচারালয়ে সাক্ষ্যপ্রদানকারী। ভক্তের বিচারে—"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

বদ্ধজীব যখন এই বাস্তব সত্যের বিমল আলোক হইতে বঞ্চিত তথা শোকভয়-মোহাদি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া মায়ার ক্রোড়ে নিদ্রিত, তখন পরদুঃখদুঃখী শ্রীআচার্যভাস্করের জাগরয়িত্রী বাণী সেবোন্মুখ চিত্তে প্রবেশ করিয়া জীবের নিত্য স্বরূপের ও স্বরূপধর্মের উদ্বোধন করিয়া দেয়। বস্তুতঃ, "তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ" (শ্রীভা: ৪।২৯।৪১) **যাঁহারা অতৃপ্ত হইয়া অবধানযুক্ত কর্ণদ্বারা (উৎকর্ণ হইয়া) মহাজনকীর্তিত শ্রীহরিকথামৃত পান করেন, তাহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক ও মোহ স্পর্শ করিতে পারে না।**

শ্রীল আচার্যদেবের উপরোক্ত অনুভবসিদ্ধ বীর্যবতী বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রত্যেক মঠবাসী, যাহারা যেখানে ছিলেন, তাহা শত বিপদসঙ্কুল হইলেও তথা হইতে অন্যত্র যাইবার চিন্তা না করিয়া শরণাগতচিত্তে তৎ তৎ স্থানে নির্ভয়ে অবস্থান করিলেন; কিন্তু শ্রীবিগ্রহ ও গোধনসমূহকে নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিয়া দিলেন। সেবোন্মুখ না হইলে মহতের এইসব বাণী হৃদয়কে স্পর্শ করিবে না বা তদনুযায়ী আচরণ করিতে স্পৃহাও জাত হইবে না। ভিজা কাঠে আগুন লাগাইলেও তাহা জ্বলে না। সেইরূপ যাহার হৃদয় জন্মজন্মান্তরের

অপরাধে বজ্রের ন্যায় কঠিন হইয়াছে, সে কখনও এইসব মহৎবাণীর প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারিবে না।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা

অনেকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া ইহাকে "ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়" আখ্যা দিয়া থাকেন এবং তদনুযায়ী ইহার গুরুপরম্পরাও স্থির করিয়া থাকেন। তাহাদের যুক্তি এই যে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য, তাঁহার শিষ্য শ্রীল ঈশ্বরপুরী এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শ্রীল আচার্যদেব নিম্নলিখিত তুলনাত্মক বিচারের দ্বারা এই মতবাদকে নিরাস করিয়াছিলেন।

মাধ্বমত ও গৌড়ীয়মতের তুলনাত্মক বিচার—উভয় সম্প্রদায়ের কি কি বিষয়ে মিল আছে, প্রথমে তাহা দেখা যাউক। মাধ্বসম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বর সেব্য এবং জীব তাঁহার সেবক। গৌড়ীয় সম্প্রদায়েরও সেই মত। কেবল এই একটি বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মিল আছে বলিয়া কি উভয় সম্প্রদায়কে এক বলা যাইবে? না, উভয় সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন যদি সর্বতোভাবে সমান হইয়া থাকে, তবে তাহাকে এক সম্প্রদায় বলা যাইবে। তাহা না হইলে উভয় সম্প্রদায়কে এক বলিয়া মনে করা সমীচীন হইবে না। এখন উভয় সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা বিচার করা যাউক।

সম্বন্ধ (উপাস্য)—মাধ্বমতে বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণই পরব্রহ্ম এবং তিনি উপাস্য হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ। গৌড়ীয়মতে মাধুর্যপ্রধান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম এবং তিনি উপাস্যবিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীনারায়ণ মাধুর্যপ্রধান শ্রীকৃষ্ণের অংশ ও তাঁহার ঐশ্বর্যপ্রধান প্রকাশবিশেষ।

অভিধেয় (উপাসনাপদ্ধতি)—শ্রীনারায়ণকে বর্ণাশ্রমধর্মের সমর্পণই মাধ্ব-সম্প্রদায়ের উপাসনাপদ্ধতি। শ্রীমন্মধ্বাচার্যের উপদিষ্ট ভজনপদ্ধতি সম্পর্কে 'সর্বদর্শনসংগ্রহে'র উক্তি—"ভজনং দশবিধং বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঃ, কায়েন দানং পরিত্রাণং পরিরক্ষণং, মনসা দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা চেতি। অত্রৈককং নিষ্পাদ্য নারায়ণং সমর্পণং ভজনম্।" অর্থাৎ ভজন দশপ্রকার। সত্য, হিত ও প্রিয়কথন এবং শাস্ত্রানুশীলন—এই চারিটি বাচিক ভজন। দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ—এই তিনটি কায়িক ভজন এবং দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা—এই

তিনটি মানসিক ভজন। ইহা হইতে প্রত্যেকটির অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীনারায়ণকে সমর্পণই ভজন-পদবাচ্য। কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম পরিত্যাগপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রবণকীর্তনাদি নবধা ভক্তির অনুষ্ঠানই গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের ভজন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে উড়ুপীতে মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্যের সঙ্গে সাধ্য-সাধন সম্পর্কে তাঁহার যে আলোচনা হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

"সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য-সাধনশ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ৯।২৩৭)

ইহার উত্তরে তত্ত্ববাদী আচার্য বলিয়াছিলেন—

আচার্য কহে—"বর্ণাশ্রমধর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥" (ঐ ২৩৮)

তাঁহার এই উত্তর শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

প্রভু কহে—"শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্তন।
কৃষ্ণপ্রেম সেবাফলের পরমসাধন॥ (ঐ ২৪০)

তথাহি (শ্রীভা: ৭।৫।২৩-২৪)—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

শ্রবণ-কীর্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ—পুরুষার্থসীমা॥ (ঐ ২৪১)

তথাহি (শ্রীভা: ১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

কর্মত্যাগ কর্মনিন্দা—সর্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম হৈতে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি কভু নহে॥ (ঐ ২৪২)

তথাহি (শ্রীভা: ১১।১১।৩২)—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥

তথাহি ভগবদ্গীতায়াং (১৮।৬৬) –

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

তথাহি (শ্রীভা: ১১।২০।৯) –

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥
কর্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন ?
এইত বৈষ্ণবের নহে সাধ্য-সাধন।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য-সাধন ॥" (ঐ ২৪৩-৪৫)

তত্ত্ববাদী আচার্য –

শুনি তত্ত্বাচার্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত ॥
আচার্য কহে – "তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়।
সর্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥
তথাপি মধ্বাচার্য যে করিয়াছে নির্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সভে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ ॥" (ঐ ২৪৬–৪৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভু –

প্রভু কহে – "কর্মী, জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥" (ঐ ২৪৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যদি মাধবমতকে স্বীকার করিতেন তবে উপাসনাপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্যকে কখনও এইরূপ প্রশ্ন করিতেন না। তিনি যে কেবল প্রশ্ন করিয়াছেন তাহা নহে, তাহাদের সাধনপদ্ধতি যে শাস্ত্রানুমোদিত সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনপদ্ধতি নহে, তাহাও পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তি হইতে তিনি যে মাধবমতকে উপেক্ষা করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট জানা যায়।

প্রয়োজন (সাধনের ফল) – মাধবমতে চতুর্বিধ মুক্তি প্রয়োজন বা সাধনের ফল। কিন্তু গৌড়ীয়মতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন বা ভক্তিসাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল। এসম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি –

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥” (৩।২৯।১৩)

অর্থাৎ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তি ভক্তকে প্রদত্ত হইলেও ভগবানের সেবা ব্যতীত তাহা সে গ্রহণ করে না।

উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে জানা যায় যে, মাধ্ব সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন অর্থাৎ উপাস্যদেব, উপাসনাপদ্ধতি ও উপাসনার ফল গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতে পৃথক্। কেবল বিষ্ণু সেব্য ও জীব তাঁহার সেবক, এই একটি মাত্র বিষয়ে সাম্য আছে। শ্রীরামানুজ ও শ্রীনিম্বার্কের মতেও বিষ্ণু সেব্য ও জীব তাঁহার সেবক। কেবল সেব্য-সেবক-ভাবের সমত্বে যদি সম্প্রদায়ের একত্ব হইত তাহা হইলে গৌড়ীয় সম্প্রদায় কেবল মাধ্ব সম্প্রদায় কেন শ্রীরামানুজ সম্প্রদায় ও শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়েরও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উক্ত হইত। কিন্তু সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের সর্বতোভাবে সাম্য না হইলে সম্প্রদায় সমান বলা অসঙ্গত হইবে। অতএব গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা একান্ত অমূলক।

মাধ্ব সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা—মাধ্ব সম্প্রদায়ের মূল আস্থান উড়ুপীমঠে গুরুপরম্পরার যে তালিকা পাওয়া যায়, তাহাতে সকলেই ‘তীর্থ’-উপাধিধারী। ‘পুরী’-উপাধিধারী কোন সন্ন্যাসীর নাম উক্ত পরম্পরায় নাই। শ্রীকবিকর্ণপূরের নামে প্রচলিত ‘শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা’র (?) প্রারম্ভে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক (?)—এই চারি সম্প্রদায়ের মূল আচার্যগণের বিষয়ে পদ্মপুরাণের যে কয়টি শ্লোক* উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া জানা যায়। এতদ্ব্যতীত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও তদ্রূপ। কারণ এপর্যন্ত শ্রীপদ্মপুরাণের যেসব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোনটিতেই উক্ত চারিসম্প্রদায়ের প্রমাণসূচক এইসব শ্লোকের অস্তিত্ব নাই। আনুমানিক ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণঘেরার শ্রীমধুসূদনদাস গোস্বামী সার্বভৌম মহাশয় স্বয়ং শ্রীপদ্মপুরাণের সর্বত্র বহু অনুসন্ধান সত্ত্বেও

---

* “প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকাঃ।
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকাহ্বয়াঃ পাদ্মে যথা স্মৃতাঃ ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥” (শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা-২১ শ্লোক)

'শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকাঃ' ইত্যাদি শ্লোকগুলি কোথায়ও না পাওয়ায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিঠাকুরের নিকট উপরোক্ত শ্লোকসমূহের উৎস(স্থান)পরিচয় জানিবার জন্য একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কতিপয় পণ্ডিতের সহায়তায় বিভিন্ন সংস্করণের পদ্মপুরাণ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া কোথায়ও উক্ত শ্লোকগুলির স্থান-পরিচয় পান নাই।* ইহা উক্ত গোস্বামী মহাশয়কেও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

গৌড়ীয় সম্প্রদায় কবে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত হইল ?—জয়পুরের গলতা-গাদিতে রামানন্দী মতের কতিপয় পণ্ডিত তথাকথিত চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন না কোনটির অন্তর্ভুক্তি ব্যতীত এবং শঙ্কর সম্প্রদায়ের ন্যায় স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসমর্থক ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, উপনিষদ্‌ভাষ্য ও শ্রীগীতাভাষ্য ব্যতীত সম্প্রদায়সিদ্ধি হয় না বলিয়া মত পোষণ করিয়াছিলেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু সেই মতবাদী পণ্ডিতদিগকে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যে গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ষড়গোস্বামিগণের লেখনীর মধ্যে অথবা শ্রীকবিকর্ণপূরের 'শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য' ও 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' কিম্বা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' ঘুণাক্ষরেও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্তির কথা নাই। এইজন্য পরবর্তিকালের কষ্টকল্পিত অন্য প্রমাণ যে মূল্যহীন, ইহাতে দ্বিমত হইবার কিছুই নাই। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুর পর হইতেই এই মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে। ইহার যৌক্তিকতা বিচার না করিয়া অনেকে এই অবান্তর মতবাদকে গ্রহণ করিয়া লইতেছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভুষণ প্রভুর পূর্বে এইরূপ মতবাদ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল না বলিয়া জানা যায়।

ব্রজগোপীগণের সম্পর্কে শ্রীমন্মধ্বাচার্যের উক্তি—শ্রীমন্মধ্বাচার্যের মতে ভক্তিতে ব্রজগোপীগণ অপেক্ষা অষ্টমহিষী দুইগুণ অধিক, তাঁহাদের অপেক্ষা নন্দগৃহিণী যশোদা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠা; যশোদার অপেক্ষা দেবকী শ্রেষ্ঠা। দেবকী অপেক্ষা বসুদেব, বসুদেব অপেক্ষা অর্জুন এবং অর্জুন অপেক্ষা বলরাম

* শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের রচিত 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' গ্রন্থের ২১৪ পৃষ্ঠায় তাঁহার নিজের উক্তি।

যথাক্রমে ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা ব্যতীত অন্য কেহই ভক্তিতে বলরাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। ব্রহ্মাই সর্বাধিক; তিনি 'ঈশেশ'।*

শ্রীমন্মধ্বাচার্য তাঁহার 'ভাগবততাৎপর্যে' (১০।২৭।১৩) ★ লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণকামা ব্রজগোপীগণ দেহত্যাগের পর স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। কাম হেতু তাঁহারা পরব্রহ্মকে পান নাই। জগৎপ্রপিতামহ শ্রীভগবানে জারবুদ্ধি উচিৎ নহে। কোন কোন অপ্সরারই পারকীয় ভাবে উপাসনাযোগ্যতা লাভ হইয়াছিল" ইত্যাদি। (১০।২৭।১৫) ☆

শ্রুতি-স্মৃতি অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাঁহারা জীবকোটির অন্তর্ভুক্ত নহেন অথচ শ্রীমন্মধ্বাচার্য তাঁহাদিগকে 'অপ্সরা' বলিয়াছেন। অপ্সরাগণ জীবকোটির অন্তর্গত প্রাকৃত স্বর্গবাসিনী রমণী ও স্বীয় দেহদ্বারা অন্যের কামসম্পাদনে সঙ্কোচহীনা। কিন্তু ব্রজগোপীগণের

---

* কৃষ্ণপ্রিয়াভ্যো গোপীভ্যো ভক্তিতো দ্বিগুণাধিকাঃ।
মহিষ্যষ্টৌ বিনা যাস্তাঃ কথিতাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ ॥
তাভ্যঃ সহস্রসমিতা যশোদা নন্দগেহিনী।
ততোঽপ্যভ্যধিকা দেবী দেবকী ভক্তিতস্ততঃ ॥
বসুদেবস্ততো জিষ্ণুস্ততো রামো মহাবলঃ।
ন ততোঽভ্যধিকঃ কশ্চিদ্ ভক্ত্যাদৌ পুরুষোত্তমে।
বিনা ব্রহ্মাণমীশেশং স হি সর্বাধিকঃ স্মৃতঃ ॥
(শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত 'ভাগবত-তাৎপর্যম্' ১১।১২।২২)

★ কৃষ্ণকামাস্তদা গোপ্যস্ত্যক্ত্বা দেহং দিবং গতাঃ।
সম্যক্ কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বা কালাৎ পরং যযুঃ ॥
পূর্বং চ জ্ঞানসংযুক্তাস্তত্রাপি প্রায়শস্তথা।
অতস্তাসাং পরং ব্রহ্মগতিরাসীন্ন কামতঃ ॥
ন তু জ্ঞানমৃতে মোক্ষো নান্যঃ পন্থেতি হি শ্রুতিঃ ॥ (ঐ ১০।২৭।১৩)

☆ বিমুক্তাবপি কামিন্যো বিষ্ণুকামা ব্রজস্ত্রিয়ঃ।
দ্বেষিণশ্চ হরৌ নিত্যং দ্বেষেণ তমসি স্থিতাঃ ॥
স্নেহভক্তাঃ সদা দেবাঃ কামিত্বেনাপ্সরঃস্ত্রিয়ঃ।
কাশ্চিৎ কাশ্চিন্ন কামেন ভক্ত্যা কেবলয়ৈব তু ॥
ভক্ত্যা বা কামভক্ত্যা বা মোক্ষো নান্যেন কেনচিৎ।
কামভক্ত্যাপ্সরঃস্ত্রীণামন্যেষাং নৈব কামতঃ ॥
উপাস্যঃ শ্বশুরত্বেন দেবস্ত্রীণাং জনার্দনঃ।
জারত্বেনাপ্সরঃস্ত্রীণাং কাসাঞ্চিদিতি যোগ্যতা ॥ (ঐ ১০।২৭।১৫)

শ্রীকৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময় প্রেম যে সর্বতোভাবে কামগন্ধলেশশূন্য, ইহা সকল শাস্ত্র তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্যের এবংভূত বিবৃতি গৌড়ীয়গণের হৃদয়বিদারক নহে কী? তাঁহার উক্তি হইতে জানা যায় যে, ভক্তির তারতম্য বিচারে গোপীগণ সর্বনিম্ন স্তরে এবং ব্রহ্মা সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত। কিন্তু এই উক্তি শাস্ত্রসম্মত নহে। যে ব্রহ্মাকে মাধ্বসম্প্রদায়ের আদিগুরুজ্ঞানে ব্রজগোপীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচার করা হইয়াছে, ব্রজগোপীগণের সম্পর্কে সেই ব্রহ্মার নিজ উক্তিই উপরোক্ত বিচারের সম্পূর্ণ বিরোধী।

ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণের নিকট ব্রহ্মা বলিতেছেন—

"ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরা।
নন্দগোপব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণূপলব্ধয়ে॥
তথাপি ন ময়া প্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পাদরেণবঃ॥"

(লঘুভাগবতামৃত: ভক্তামৃত ৩১ ধৃত বৃহদ্‌বামনপুরাণবচন)

আমি পূর্বে নন্দব্রজস্থ গোপীগণের চরণরেণু পাইবার জন্য ষাটহাজার বৎসর তপস্যা করিয়াছিলাম; তথাপি তাহা লাভ করিতে পারিলাম না।

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা যত্তৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ॥

(শ্রীভা: ১০।১৪।৩১)

হে বিভো! অদ্যাবধি সমস্ত যজ্ঞ যাহার তৃপ্তিবিধানে সমর্থ হইতে পারে নাই, সেই তুমি গোবৎস এবং গোপবালকরূপে যাঁহাদের স্তন্যামৃত প্রচুর মাত্রায় আনন্দে পান করিয়াছ, সেই ব্রজগোমাতা এবং ব্রজগোপীগণ অতীব ধন্যা।

ব্রহ্মা মাধ্বসম্প্রদায়ের আদিগুরু এবং উপাস্যবিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেও উপরোক্ত শ্লোক হইতে দেখা যায়, তিনি কিরূপভাবে ব্রজগোপীগণের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন। অথচ শ্রীমধ্ব তাঁহাদিগকে স্বর্গের অপ্‌সরারূপ কর্মফলবাধ্য জীবমাত্র মনে করিয়া হেয় জ্ঞান করিয়াছেন। বস্তুতঃ গোপীগণ কর্মফলবাধ্য জীবসামান্য নহেন। তাঁহারা ভক্তকুলমুকুটমণি ও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—গোপীগণ তাঁহার যত প্রিয়, ব্রহ্মা, রুদ্র, এমন কি বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীও তত প্রিয় নহেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব এবং ব্রহ্মা উভয়ে গোপীগণের চরণরেণু কামনা করিয়াছেন। অতএব গোপীগণের সম্পর্কে শ্রীমন্মধ্বাচার্যের উক্তি শাস্ত্রসম্মত বলিয়া বলা যাইবে কিরূপে এবং ইহা গৌড়ীয়গণের গ্রহণযোগ্য বা হইবে কিরূপে?

আরও শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১২শ, ১৩শ ও ১৪শ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুকে বিচার করিলে ভক্তি-বিবেচনায় ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। তাই বোধ হয় শ্রীমন্মধ্বাচার্য উক্ত তিন অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত ভাবিয়া ইহার ভাষ্য করেন নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু মাধ্বমত স্বীকার করেন নাই—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন উক্তি হইতে তিনি যে মাধ্বমতকে স্বীকার করিয়াছেন, ইহা জানা যায় না। বরং উহা খণ্ডন করিবার কথাই জানা যায়।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে সাধ্য-সাধন সম্পর্কে তত্ত্ববাদী আচার্যের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু দুইবার "তোমার সম্প্রদায়ে" বলিয়াছেন।

"প্রভু কহে—কর্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি এই দুই চিহ্ন॥
সবে এক গুণ দেখি **তোমার সম্প্রদায়ে**।
সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে করহ নির্ণয়ে॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ৯।২৪৯-৫০)

শ্রীমন্মহাপ্রভু মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া থাকিলে 'তোমার সম্প্রদায়ে' বলিতেন না।

শ্রীকবিকর্ণপূর নিজকৃত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে' (৮।১) স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের উক্তির মধ্যে লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেঽপি নারায়ণোপাসকা এব। অপরে তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব। নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্। অপরে তু শৈবা এব বহবঃ। পাষণ্ডাস্ত মহাপ্রবলা ভূয়াংস এব। কিন্তু ভট্টাচার্য! রামানন্দমতমেব মে রুচিতম্।

সার্বভৌমঃ—ভবন্মত এব প্রবিষ্টোঽসৌ ন তস্য মতকর্তৃতা। স্বামিন্, অতঃ পরমস্মাকমপ্যেতদেব মতং বহুমতং সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যঞ্চৈতদিতি।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিলেন—"কতিপয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারাও শ্রীনারায়ণের উপাসক আবার বহু তত্ত্ববাদীও আছেন। তাঁহারাও সেইরূপ (অর্থাৎ তাঁহারাও শ্রীনারায়ণের বা শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, কিন্তু শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসক নহেন)। তাঁহাদের মত (সিদ্ধান্ত) নিরবদ্য (বিশুদ্ধ) নহে, অন্য ব্যক্তিগণের মধ্যে শৈবমতাবলম্বীর সংখ্যাই অধিক। মহাপ্রবল পাষণ্ডগণেরই বাহুল্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু হে ভট্টাচার্য! রামানন্দের মতই আমার রুচিসম্মত।"

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলিলেন—"প্রভো! শ্রীরামানন্দ আপনার মতেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং কোন মত প্রবর্তন করেন নাই। অতএব আমাদেরও ওই মতই শ্রেষ্ঠ মত এবং তাহাই সকলের স্বীকৃত ও সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য।"

শ্রীকবিকর্ণপূরের উক্ত বক্তব্য হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, তত্ত্ববাদিগণের মত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত নহে। শ্রীরায়রামানন্দের মুখে বক্তা হইয়া তিনি যে সিদ্ধান্ত স্ফূরিত করাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার অনুমোদিত। তিনি প্রয়াগে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুকে ও বারাণসীতে শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভুকে সেইসব সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীভাগবতসন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনী প্রভৃতি গ্রন্থে সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া সেইসব সিদ্ধান্ত বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা গৌড়ীয়গণের কণ্ঠহারসদৃশ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে মাধ্বমত স্বীকার করেন নাই, উপরোক্ত আলোচনা হইতে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

মাধ্বমত সম্পর্কে শ্রীল সনাতন গোস্বামী—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীশ্রীরূপসনাতন গোস্বামী এবং তাঁহাদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভৃতি কেহই মাধ্বসম্প্রদায়ের মত স্বীকার করার কোন প্রমাণ নাই; বরং তাহার বিপরীত কথাই তাঁহাদের উক্তি হইতে জানা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১২।১ শ্লোকের 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী' টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তত্ত্ববাদিগণের (মাধ্বসম্প্রদায়ের) মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"তত্ত্ববাদিগণ মুক্তির পরমপুরুষার্থতা মনে করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রদর্শিত অসুরমুক্তি এবং গোপীস্তন্যপানাদি লীলা সহ্য করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের পূতনা-সদ্গতিপ্রতিপাদক 'পূতনা লোকবালঘ্নী'—আদি ছয়টি শ্লোক, 'য এতৎ পূতনামোক্ষম্' ইত্যাদি শ্লোক (১০।৬।৩৫-৪০,৪৪) এবং ইহার দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ এই তিন অধ্যায়কেও স্বীকার করেন নাই। কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদাদি বহু পুরাতন এবং আধুনিক মহাত্মাগণ সেগুলির সমাদর করিয়াছেন। শ্রীপদ্মপুরাণাদিতেও এইসব বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্তের সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই। ভক্তিনিষ্ঠগণের নিকট মুক্তির যে কোন উপাদেয়তা নাই, শ্রীমদ্ভাগবতে সর্বত্র ইহা সুব্যক্ত। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের স্তন্য পান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় শ্রীযশোদার ন্যায় মাননীয়া। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা (হ্লাদিনীশক্তির প্রকাশ) পরা নবতরুণীও সহস্র সহস্র আছেন। সুতরাং কোন বিরোধ নাই।

বিশেষতঃ (মাধ্বসম্প্রদায়ের অস্বীকৃত) এই তিন অধ্যায়ে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের অসাধারণ মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ হইলে ইহা অনুভবের বিষয় হইবে। সুতরাং ইহা অতি সুগোপ্য। তত্ত্ববাদিগণ এই সুগোপ্য মহিমা অনুভব করিতে পারেন নাই বলিয়া এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়াছেন।”

মাধ্বমত ও শ্রীল জীবগোস্বামী—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১২শ, ১৩শ ও ১৪শ অধ্যায়ত্রয়ে ব্রহ্মবিমোহনলীলা বর্ণিত হওয়ায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য উক্ত অধ্যায়ত্রয়কে অস্বীকার করিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ তাঁহার ‘সংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী’তে উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্যের এইরূপ বিচার যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয় তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং শ্রীভা: ১০।১২।১ শ্লোকের সংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী টীকায় মাধ্বসম্প্রদায়কে স্পষ্টভাবে ‘অন্য সম্প্রদায়’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ‘সর্বসম্বাদিনী’ টীকায় তিনি মাধ্বমত সম্পর্কে লিখিয়াছেন, “অভেদবাদশ্চ বিশেষানুসন্ধানরাহিত্যেনৈবেতি। অপরে তু ‘তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ’ (ব্র: সূ: ২।১।১১) ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্মর্যাদদোষসন্ততিদর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুম-শক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ, তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ ভেদমপি সাধয়ন্তোঽ-চিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্বন্তি। * * * শ্রীরামানুজমধ্বাচার্যমতে চেত্যপি সার্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ। স্বমতে ত্বচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি।” (৮০ পৃ)

শ্রীজীবপাদের এই যুক্তিতে “শ্রীরামানুজমত”, “শ্রীমধ্বাচার্যমত” এবং “স্বমত অর্থাৎ স্বসম্প্রদায়ের মত” এইরূপ ভেদবাচক পদ থাকায় গৌড়ীয় মত যে মাধ্বমত হইতে ভিন্ন ইহা তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া বুঝাযায়।

তাঁহার সন্দর্ভের একাধিক স্থানে শ্রীমন্মধ্বাচার্যকে “তত্ত্ববাদগুরু” বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু কোনও স্থানে “স্বসম্প্রদায়গুরু বা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়গুরু” বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

মাধ্বসম্প্রদায় গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের ন্যায় সবিশেষবাদী। তাই শ্রীল জীবপাদ তাঁহার শ্রীভাগবতসন্দর্ভে শ্রীমধ্বাচার্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেইরূপ তিনি শ্রীশঙ্করাচার্যের কোন কোন উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। উভয় সম্প্রদায়ের যেসব মত গৌড়ীয় মতের অনুকূল, কেবল সেইগুলিকেই তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এইজন্য যদি তাঁহাকে মাধ্বমতাবলম্বী বলা যাইবে, তবে এই যুক্তিবলে তাঁহাকে শঙ্করমতাবলম্বীও বলা যাইবে না কেন ? তত্ত্বসন্দর্ভে তিনি মাধ্বমতকে ‘প্রচুরপ্রচারিতবৈষ্ণবমতবিশেষঃ’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মাধ্বসম্প্রদায়কে নিজসম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকিলে তিনি মাধ্বমতকে ‘বৈষ্ণবমতবিশেষঃ’ বলিতেন না।

এতদ্ব্যতীত “শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ ....তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ।।” (শ্রীভা: ৭।৫।২৩-২৪) শ্লোকের টীকায় শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৬৯তম অনুচ্ছেদে তিনি লিখিয়াছেন—“ইতি নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা ভগবতি তদ্‌বিষয়িকা অদ্ধা সাক্ষাদ্রূপা ন তু কর্মাদ্যর্পণরূপা পারম্পরিকী ভক্তিরিয়ং, তত্রাপি শ্রীবিষ্ণাবেবার্পিতা তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা, ন তু ধর্মার্থাদিষ্বর্পিতা, এবংভূতা চেৎ ক্রিয়তে, তদা তেন কর্ত্রা যদধীতং তদুত্তমং মন্য ইত্যর্থঃ ।”

এখানে শ্রীজীবপাদের মতে ‘এই নববিধা ভক্তি শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎ সুখকর কার্য এবং তাঁহার উদ্দেশ্যেই ইহা কৃত হইতেছে’—প্রথমে মনে এইরূপ ভাবনা করিয়া পরে ইহার অনুষ্ঠান করাই শুদ্ধভক্তিপদবাচ্য। কিন্তু প্রথমে ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষলাভ উদ্দেশ্যে উহাকে অর্পণ করা শুদ্ধভক্তি নহে। অবশ্য রজস্তমোগুণ প্রবল থাকা অবস্থায় সাধক ভক্তি করিতে গেলেও তাহা কর্ম হইয়া যাইবে। সেই কর্ম কিরূপে বিষ্ণুতে অর্পণ করিলে তাহা ভক্তিলাভের সহায়ক হইবে, সেসম্পর্কে শ্রীল জীবপাদ নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—

“অত্র নিমিত্তানি চ ত্রীণি—কামনা, নৈষ্কর্ম্যম্, ভক্তিমাত্রঞ্চেতি। ***। ভক্তৌ পুনঃ প্রীণনমেব ভক্তেস্তদেব জীবনত্বাৎ। *** পরমভক্তাস্তু ভগবৎ-পরিতোষণং প্রীণনমেব প্রার্থয়ন্তে।” (শ্রীভ: স: ২২৪ অনু:)

অর্থাৎ এই কর্মার্পণের তিনপ্রকার উদ্দেশ্য দেখা যায়, যথা—কামনা, নৈষ্কর্ম্য ও ভক্তিমাত্র। *** ভক্তিমূলক কর্মার্পণে ভগবৎপ্রীণনেরই প্রাধান্য দেখা যায়, যেহেতু **ভগবৎপ্রীণনই ভক্তির একমাত্র জীবনস্বরূপ**। ***। **শ্রীভগবানের সন্তোষই পরম ভক্তগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন।**

উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে মাধ্বসম্প্রদায়ের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন অর্থাৎ উপাস্য, উপাসনাপদ্ধতি ও উপাসনার ফল যে গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহা জানা যায়। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে নিম্নাধিকারে কর্মার্পণের ব্যবস্থা থাকিলেও তাহা কেবল শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষবিধান-নিমিত্তই অর্পিত হয়। কারণ বিষ্ণুর সন্তোষবিধানই ভক্তির প্রাণ। কেবল এই ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণকেই শ্রীল জীবপাদ ‘অকৈতব’ এবং সকাম ও নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণকে ‘সকৈতব’ বলিয়াছেন। ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ কেবল শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ-নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হওয়ায় এবং তাহাতে সাধকের কোন ফলাভিসন্ধি না থাকায় তাহা ‘অকৈতব’-পদবাচ্য আর সকাম ও নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণে যথাক্রমে ইহ-পর-জগতের সুখভোগবাঞ্ছা ও মুক্তিবাঞ্ছারূপ স্বার্থপরতা থাকায় উহা ‘সকৈতব’-পদবাচ্য। কেবল শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষবিধানের ইচ্ছাই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সাধনের একমাত্র প্রবর্তক হওয়ায়

তাহা অকৈতব ও পরিণামে প্রেমলাভের সহায়ক। কিন্তু মুক্তিকামনা মাধ্বসম্প্রদায়ের সাধনের একমাত্র প্রবর্তক হওয়ায় তাহা 'সকৈতব' এবং এইপ্রকার সাধন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সাধকগণের সর্বতোভাবে ত্যাজ্য। কারণ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সাধনের চরম লক্ষ্য 'প্রেম'লাভের ইহা পরিপন্থী। ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, মাধ্বমতে সাধন করিলে কস্মিন্‌কালে প্রেমলাভ হইতে পারিবে না। তাই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার একান্ত অনুগত শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীকবিকর্ণপূর, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর প্রভৃতি কেহই মাধ্বমতকে স্বীকার করেন নাই।

মাধ্বমত ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুরের কোন লেখায় মাধ্বসম্প্রদায়ের কোন প্রশস্তি দেখা যায় না। যে গোপীদিগকে স্বর্বেশ্যা বলিয়া অভিহিত করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য হেয়জ্ঞান করিয়াছেন, সেই গোপীগণের সম্পর্কে সারার্থদর্শিনীতে (১০।২৯।১১) শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুর লিখিয়াছেন—"পতিবুদ্ধি অপেক্ষা জারবুদ্ধিতে অধিক নিরঙ্কুশ প্রেমোৎকর্ষ রহিয়াছে; কারণ, যে গোপীগণ দুস্ত্যজ আর্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিমৃগ্য শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্মের ভজন করিয়াছিলেন, সেই গোপীগণের চরণরেণু প্রাপ্তি-আশায় শ্রীউদ্ধব ও শ্রীব্রহ্মা ব্রজে গুল্মলতা হইতে কামনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্যের উক্তি শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুরের এই উক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে না কী? এইরূপ অবস্থায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিবার কোন যুক্তি নাই।

চারি সম্প্রদায় ও মাধ্ব-গৌড়ীয়-গুরুপরম্পরা—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার রচিত 'গোবিন্দভাষ্য', 'সিদ্ধান্তরত্ন', 'প্রমেয়রত্নাবলী' ও 'তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায়' স্পষ্টভাষায় প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিকভাবে গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে 'মধ্বানুগত' বলিবার বহু চেষ্টা করিয়াছেন।

কেহ কেহ মত পোষণ করেন যে, শ্রীকবিকর্ণপূর তাঁহার রচিত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ তাঁহার রচিত গোবিন্দভাষ্যের সূক্ষ্মা নাম্নী টীকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা কতদূর গ্রহণযোগ্য তাহা নিম্ন আলোচনা হইতে জানা যাইবে।

প্রথমে শ্রীকবিকর্ণপূরের কথা আলোচনা করা যাউক। তিনি তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে" শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতের সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, উহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। যে শ্রীকবিকর্ণপূর "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে" শ্রীমন্মধ্বাচার্যকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভিন্নমতাবলম্বী বলিয়াছেন তিনিই আবার তাঁহার "শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা"য় নিম্নমতে বর্ণনা করিবার কথা প্রচারিত হইয়াছে—

"প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকাঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাহ্বয়াঃ পাদ্মে যথা স্মৃতাঃ ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥" (২১)

অর্থাৎ কলিযুগে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটি সম্প্রদায় প্রকাশিত বলিয়া শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে। কলিযুগে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইবে। এইসব বৈষ্ণব ক্ষিতিপাবন।

এই শ্লোকগুলির অব্যবহিত পরে শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় মাধ্ব সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা উল্লেখ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী মাধ্বসম্প্রদায়েরই শিষ্য ছিলেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং গুরুপরম্পরা বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভু মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যপার্ষদ শ্রীকবিকর্ণপূরের এইরূপ পরস্পর বিরোধাত্মক বিষয় বর্ণন কতদূর সঙ্গত তাহা বিচারযোগ্য।

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে বর্ণিত "প্রাদুর্ভূতা কলিযুগে .... ক্ষিতিপাবনাঃ ॥" শ্লোকদ্বয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী শ্লোক হইতেছে—

"যঃ শ্যামো দধদাস বর্ণকমমুং শ্যামং যুগে দ্বাপরে।
সোঽয়ং গৌরবিধুর্বিভাতি কলয়ন্নামাবতারং কলৌ ॥" (২০)

অর্থাৎ যিনি দ্বাপরযুগে শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়া শ্যাম নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, তিনিই এই গৌরচন্দ্র কলিযুগে নামাবতাররূপে বিরাজমান আছেন।

"প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের পরে অন্য কয়েকটি শ্লোকে মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা বর্ণিত হইয়া তাহার পরে নিম্ন শ্লোকটি উল্লিখিত হইয়াছে—

"স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তী পূর্বসুদুষ্করে।
অন্তর্বহী রসাম্ভোধিঃ শ্রীনন্দনন্দনোঽপি সন্ ॥" (২৬)

অর্থাৎ "শ্রীনন্দনন্দন রসসাগর হইলেও পূর্বে তাঁহার পক্ষে সুদুষ্কর শ্রীরাধিকার ভাবকে অন্তরে ও কান্তিকে বাহিরে স্বীকার করিয়া।"

পূর্বোক্ত "যঃ শ্যামো দধদাস" এবং পরোক্ত "স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তী" শ্লোকে দ্বাপরের শ্রীশ্যামসুন্দর কিরূপে কলিযুগে শ্রীগৌরসুন্দর হইলেন সেই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট জানা যাইতেছে। সুতরাং "যঃ শ্যামো * * *"

শ্লোকের অব্যবহিত পরে "স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তী * * *" শ্লোক থাকা যে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ইহা নিঃসন্দেহ। এই দুই শ্লোকের মধ্যে "প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে * * *" ইত্যাদি শ্লোকের ও মাধ্বগুরুপরম্পরার উল্লেখের কোন সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না।

অতএব স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, ইহা শ্রীকবিকর্ণপূরের লেখা নহে। পরবর্তিকালে মাধ্বসম্প্রদায়সম্পর্কীয় শ্লোকগুলি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তজ্জন্য "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে"র বর্ণনার সঙ্গে "শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা"র বর্ণনার অসঙ্গতি দেখা যাইতেছে।

সেইরূপ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদের শ্রীগোবিন্দভাষ্যের "সূক্ষ্মা" নাম্নী টীকায় বর্ণিত হইয়াছে—

"তথা চোক্তম্

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ ॥" ইতি

ইহার পরে উল্লিখিত চারিসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ের আদিগুরুকে উল্লেখ করিয়া মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

"শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা"র এই প্রক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুকে ও "সূক্ষ্মা" টীকাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া অনেকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন; কিন্তু এই মতবাদ যে ভ্রমাত্মক, ইহা নিঃসন্দেহ। উল্লিখিত চারিসম্প্রদায়ের বিষয় যে পদ্মপুরাণের উক্তি নহে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহা পদ্মপুরাণের শ্লোক হইলে শ্রীরূপ-সনাতন-জীবাদি গোস্বামিগণ তাঁহাদের গ্রন্থে নিশ্চয়ই ইহার উল্লেখ করিতেন।

এতদ্ব্যতীত তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল প্রচারিত একটি শ্লোকে শ্রীমন্মধ্বাচার্যের প্রবর্তিত সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায়। কাহারও মতে শ্রীজয়তীর্থ, কাহারও মতে শ্রীত্রিবিক্রমাচার্য, কাহারও মতে 'ন্যায়ামৃতকার' শ্রীব্যাসরায় ও কাহারও মতে 'যুক্তি-মল্লিকা'কার শ্রীবাদিরাজ তীর্থস্বামী সেই শ্লোকটির রচয়িতা। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের অভ্যুদয়ের পূর্বেও তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের গ্রন্থে শ্রীমধ্বমতের প্রতিপাদক এই শ্লোকটি দেখা যায়—

"শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো
ভিন্না জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন-
মক্ষাদিত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ ॥"

অর্থাৎ শ্রীমন্মধ্বাচার্যের মতে শ্রীহরিই পরতত্ত্ব; জগৎ তত্ত্বতঃ সত্য; জীবসমূহ পরস্পর ভিন্ন ও শ্রীহরির অনুচর; তাহাদের মধ্যে পরস্পর অধিকারের তারতম্য বর্তমান; নিজ স্বরূপগত আনন্দের অনুভূতিই মুক্তি; অমলা ভক্তিই সেই মুক্তিরূপ প্রয়োজনের সাধন; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ; শ্রীহরিই একমাত্র অখিল-আম্নায়বেদ্য অর্থাৎ বেদবেদ্য।

একমাত্র শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুই উক্ত শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোক রচনা করিয়া উহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের সিদ্ধান্ত বা উপদেশের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"**শ্রীমধ্বঃ** প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ **কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ** ॥"

শ্রীমধ্ব বলেন—(১) বিষ্ণুই পরতত্ত্ব, (২) বিষ্ণু অখিলবেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব সত্য, (৪) ভেদও সত্য, (৫) জীবসমূহ শ্রীহরির চরণসেবক অর্থাৎ দাস, (৬) তাহাদের মধ্যে তারতম্য বর্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মোক্ষ, (৮) বিষ্ণুর শুদ্ধভজনই জীবের মুক্তির কারণ, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ইহা উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুর পূর্বে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর পর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্য কেহ এইরূপ শ্লোক রচনা করেন নাই। অতএব তিনিই গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিবার এবং মাধ্বগৌড়ীয় গুরুপরম্পরা প্রবর্তনের প্রথম ব্যক্তি।

শ্রীবলদেব উড়িষ্যার খণ্ডায়ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই খুব বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ন্যায় ও বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি প্রথমে শাঙ্করভাষ্য ও তাহার পর মাধ্বভাষ্য ভালভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি তত্ত্ববাদিগণের শিষ্য হইয়া মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন।

বেদান্তবিশারদ শ্রীবলদেব অত্যল্প দিনের মধ্যেই দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য, আর্যাবর্ত প্রভৃতি অঞ্চলের যে যে স্থানে বেদান্তচর্চা হইত, তথায় তিনি পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণের পূজাভাজন হইয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া তিনি তত্ত্ববাদী মঠে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়ে গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ বলদেবের ন্যায় পুরুষরত্নকে নিজ সম্প্রদায়ে আনয়নের জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। বলদেবের বিদ্যা ও পারমার্থিক বুদ্ধি প্রবল থাকায় অনেকে শ্রীমুরারির প্রশিষ্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরাধাদামোদর দাসকে শ্রীবলদেবের সহিত সিদ্ধান্তবিচারের জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি প্রথমে শ্রীবলদেবের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া উভয়ে একসঙ্গে থাকিলেন। তিনি কিছু কিছু বেদান্ত পড়িয়াছিলেন। ষট্‌সন্দর্ভে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকায় শ্রীবলদেব এই গ্রন্থ বিষয়ে তাঁহার নিকট হইতে জানিতে চাহিলেন। শ্রীরাধাদামোদর কান্যকুব্জ বিপ্র হইয়াও মহাপ্রেমী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত ভক্তি ও প্রেম দর্শন করিয়া শ্রীবলদেবের তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জাত হইয়াছিল। তবুও বিচারস্থলে দুইজনের মধ্যে যথেষ্ট শাস্ত্রীয় যুদ্ধ হইত। ভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীবলদেব নিজের মত (মাধ্বমত) স্থাপন করিতে না পারিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহার পরে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিতে পারিয়া স্বীয় মধ্বাম্নায় বজায় রাখিয়া গৌড়ীয়-মাধ্বী-সম্প্রদায় অভিমানে নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। ইহার পর তিনি শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে গেলেন এবং তথায় কোন দেবালয়ে অবস্থান করিলেন। সেই সময়ে জয়পুরে এক সঙ্কট উপস্থিত হইল। জয়পুরের রাজা তৎপূর্ব হইতে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অনুগত থাকিয়া শ্রীনারায়ণের পূজার পূর্বে শ্রীগোবিন্দজীর পূজা করাইতেন। কিন্তু শ্রী-সম্প্রদায়ী কয়েকজন মহান্ত বৈষ্ণব এই সময়ে জয়পুরে আসিয়া শ্রীগোবিন্দজীর পূজার আগেই শ্রীনারায়ণের পূজা চালাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সদাচারী রাজা ইহাতে সম্মত না হইয়া এবিষয়ে শাস্ত্রীয় বিচারের জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে উপযুক্ত বৈষ্ণবপণ্ডিত আনয়নের চেষ্টা করিলেন। বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীগোবিন্দজীর মর্যাদারক্ষার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদকে জয়পুর যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি সেসময় অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ায় জয়পুর যাইতে অসামর্থ্য প্রকাশ করিলেন। এজন্য সকলে শ্রীবলদেবকে তথায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিও শ্রীবলদেবকে বেদবেদান্তে পারদর্শী জানিয়া তাঁহাকে জয়পুরে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন। শ্রীবলদেব হস্তে কমণ্ডলু, গলদেশে চিরাকাঁথা ও কটিতে কৌপীন বহির্বাসমাত্র ধারণ করিয়া একাকী

রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি তথায় গিয়াছেন তাহা জানাইলেন। রাজা তাঁহার অকিঞ্চনবেশ দেখিয়া প্রথমে তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। তথাপি শ্রী-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহাকে সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে পণ্ডিতপ্রবর! আপনি কোন্ ভাষ্যের অনুগত ?" শ্রীবলদেব বলিলেন—"আমি মধ্বশিষ্য, মধ্বকৃত-ভাষ্যের মাধ্যমে বিচার করিব।" তখন তাহারা বলিলেন—"মধ্বের ভাষ্যে কেবল শ্রীকৃষ্ণই প্রতিষ্ঠিত, শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রীগোবিন্দজী কি শ্রীরাধাকে ছাড়িয়া পূজা গ্রহণ করিবেন ?" শ্রীবলদেব দেখিলেন যে, মধ্বভাষ্যের দ্বারা এখানে কার্য চলিবে না। তাই তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে কিছুদিন সময় লইয়া শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে বসিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্রনামভাষ্য ও উপনিষদ্ভাষ্য রচনা করিয়া ফেলিলেন। পরে সভায় শ্রীসম্প্রদায়ীগণকে পরাস্ত করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দজীর সেবার প্রাধান্য বজায় রাখিলেন। সেই বিদ্বৎসভায় শ্রীবলদেবকে "বিদ্যাভূষণ" উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল।

শ্রীবলদেব পূর্ব (মাধ্ব) গুরুপরম্পরা ত্যাগ না করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের মধ্যে সঙ্গতি দেখাইবার জন্য ভাবপ্রবণ হইয়া উঠিলেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও তদনুগ শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবাদি গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে 'শ্রীমদ্ভাগবত'ই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। সেই ভাষ্যের অনুভাষ্য ও বিবৃতিস্বরূপ শ্রীসনাতনের 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত', 'শ্রীবৃহদ্-বৈষ্ণবতোষণী', শ্রীরূপপাদের 'শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃত', 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' প্রভৃতি এবং শ্রীজীবের 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ', 'শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী', 'ক্রমসন্দর্ভ' ও 'সর্বসম্বাদিনী' প্রভৃতি থাকায় আর স্বতন্ত্রভাবে বেদান্তের ভাষ্যরচনার কোন প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা বোধ করেন নাই। কিন্তু কোন কোন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কোন নিজস্ব ভাষ্য নাই'—এইরূপ মত প্রকাশ করায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ তাৎকালিক প্রয়োজনানুরোধে জয়পুরস্থ শ্রীগোবিন্দজীর স্বপ্নাদেশে ব্রহ্মসূত্রের 'গোবিন্দভাষ্য' রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীল জীবপাদের শিক্ষা-শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ। শ্রীশ্যামানন্দের দীক্ষাগুরু শ্রীহৃদয়চৈতন্য। তিনি শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীশ্যামানন্দের দীক্ষিত শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ। তাঁহার পৌত্র ও শিষ্য শ্রীনয়নানন্দ দেবগোস্বামী। তাঁহার শিষ্য শ্রীরাধাদামোদর। এই শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্য 'একান্তী শ্রীগোবিন্দদাস'

বা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ। এই শ্রীবলদেব পূর্বে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত থাকায় মাধ্ব-সম্প্রদায় ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরাকে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই বিচার শাস্ত্রসম্মত নহে।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক কে ?—পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে মাধ্বসম্প্রদায়ের সঙ্গে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বহু তত্ত্বগত ও বিচারগত ভেদের কথা পরিষ্কার জানা যায়। সেইজন্য স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে আরম্ভ করিয়া তদনুগ শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবাদি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ কেহই মাধ্বমতকে স্বীকার করেন নাই। এইরূপ অবস্থায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিবার কোন যথার্থতা নাই। অবশ্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য বৈষ্ণবাচার্য হিসাবে সকলের নমস্য এবং শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও বৈষ্ণব হিসাবে সকলের মান্য। কিন্তু তাঁহার মতবাদ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অনুগত ব্যক্তিগণের গ্রহণীয় নহে।

এখন প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক কে ? নিম্ন আলোচনা হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।

শ্রীকবি-কর্ণপূর তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মধ্যে কথোপকথন প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেঽপি নারায়ণোপাসকা এব। অপরে তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব। নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্। অপরে তু শৈবা এব বহবঃ। পাষণ্ডাস্তু মহাপ্রবলা ভূয়াংস এব। কিন্তু ভট্টাচার্য! রামানন্দমতমেব মে রুচিতম্।

সার্বভৌমঃ—ভবন্মত এব প্রবিষ্টোঽসৌ, ন তস্য মতকর্তৃতা। স্বামিন্! অতঃ পরমস্মাকমপ্যেতদেব মতং বহুমতং সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যঞ্চৈতদিতি।" (৮।১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিলেন—(দক্ষিণদেশে) কতিপয় বৈষ্ণবকে দেখিয়াছি—যাঁহারা শ্রীনারায়ণের উপাসক। এতদ্ব্যতীত তত্ত্ববাদী বৈষ্ণবগণকেও দেখিয়াছি। তাঁহারাও সেইরূপ শ্রীনারায়ণেরই উপাসক। তাঁহাদের মত বিশুদ্ধ নহে। অবশিষ্ট যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে শৈবই বেশি ও মহাপ্রবল পাষণ্ডগণের সংখ্যাও অনেক। কিন্তু হে ভট্টাচার্য! রামানন্দের মতই আমার রুচিসম্মত।

একথা শুনিয়া শ্রীসার্বভৌম বলিলেন—প্রভো! আপনার মতেই শ্রীরামানন্দ প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং কোন মত প্রবর্তন করেন নাই। অতএব আমাদেরও এই মতই শ্রেষ্ঠ মত। ইহাই বহুলোকের স্বীকৃত মত এবং ইহাই সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য।

পুনরায় শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের রচিত "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" গ্রন্থের টীকার উপসংহারে টীকাকার শ্রীআনন্দী লিখিয়াছেন—"স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা তদুপাসকসম্প্রদায়প্রবর্তকো ভবতি। * * * অতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ স্বয়ং ভগবানেব সম্প্রদায়প্রবর্তকস্তৎপার্ষদা এব সাম্প্রদায়িকা গুরবো নান্যে।"

উপর্যুক্ত উক্তি হইতে জানা যায় যে, **স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই তাঁহার উপাসক (গৌড়ীয়) সম্প্রদায়ের প্রবর্তক** এবং তদীয় পার্ষদ শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিগণই এই সম্প্রদায়ের গুরুবর্গ। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, ব্রহ্মের সহিত জীবজগদাদির সম্বন্ধবিষয়ক তত্ত্ব, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব ও পরমরসস্বরূপত্বাদি এবং শ্রীনারায়ণাদি অন্য ভগবৎস্বরূপের শ্রীকৃষ্ণাংশত্বাদি সর্ববিধ তত্ত্ব, সাধন হিসাবে ভক্তিমাত্রকামা ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং সাধ্য হিসাবে প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠত্বের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুই জগৎকে জানাইয়াছেন। সুতরাং তিনিই যথার্থতঃ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।

গৌড়ীয় সম্প্রদায় স্বয়ংসম্পূর্ণ—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি যদি পরতত্ত্বের বিষয়ে বলেন—সত্যবস্তু যদি নিজকথা নিজেই বলেন, তবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্ আনন্দের চমৎকারিতা উপলব্ধি করিবার জন্য যে স্বরূপশক্তির উপর সর্বদা নির্ভরশীল এবং স্বরূপশক্ত্যানন্দ উপলব্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার অনাবিল প্রেমে বশীভূত, সেই স্বরূপশক্তি যদি নিজের এই সুগোপ্য কথা নিজেই ব্যক্ত করেন, তবে তাহা যে সর্বশাস্ত্রসার, সকল উপাসনার সার, সকল সাধ্যসার—ইহা নিঃসন্দেহ। স্বয়ং পরতত্ত্ব তাঁহার এই সুগোপ্য রহস্য জগদ্বাসীকে বিদিত করাইবার উদ্দেশ্যে সেই স্বরূপশক্তির মূর্তিমতী অভিব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা শ্রীগান্ধর্বার (শ্রীরাধার) ভাব ও কান্তি ধারণ করিয়া সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া নিজের কথা নিজেই বলিয়া গেলেন। এ কথা তিনি কেবল বলিয়া যান নাই, বলার সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদনের লোভও সম্বরণ করিতে পারেন নাই। সেই শ্রীগান্ধর্বার নিকট হইতে যে মন্ত্র এই প্রপঞ্চে গুরু-শিষ্য বা সেবক-পরম্পরাক্রমে প্রকাশিত, সেই কামবীজ ও কামগায়ত্রী মন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ণবস্তুর যেরূপ কোন প্রতিপক্ষ নাই, সেইরূপ তাহার প্রতিপাদক শাস্ত্রের (শ্রীমদ্ভাগবতের) বা তাহার বাচক মন্ত্রেরও কোন প্রতিপক্ষ নাই। অন্য সকল মন্ত্রই এই মন্ত্ররাজের মধ্যে অনুস্যূত। নিরুপাধিপ্রীতিলক্ষণযুক্ত পরতত্ত্বের প্রতি নিরুপাধি আনুকূল্যময় প্রীতি যাহার যত বেশি, যাহার হৃদয় তাঁহার রুচিকর ও আনন্দদায়ক, তাহার হৃদয়ে মন্ত্র তত অধিক প্রতিভাত। প্রীতির আবির্ভাব

যে হৃদয়ে যত অধিক, সে হৃদয় তত স্বচ্ছ। শ্রীগান্ধর্বার হৃদয়টি সর্বাপেক্ষা অধিক স্বচ্ছ। কারণ পরতত্ত্বের প্রতি প্রীতির আবির্ভাব তাঁহার হৃদয়ে সর্বাধিক। সুতরাং সেই শ্রীগান্ধর্বা-দয়িতের মন্ত্রই মন্ত্রবিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহাই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মন্ত্র।

অতএব গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্তক শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসামৃতসমুদ্রে অবগাহন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীল হরিদাস ঠাকুররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দশাবতারের মধ্যে কোন অবতার নহেন, স্বয়ং অবতারী এবং সকল অবতার তাঁহা হইতে আসিয়াছেন, সেইরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হওয়ায় অবতারী। সুতরাং তাঁহার প্রবর্তিত শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায় অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের আকর বা উৎপত্তিস্থল। অন্য কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া নিজেকে প্রাচীন সম্প্রদায় বলিয়া স্থাপন করা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে কখনই গৌরবের বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং সর্বাংশী স্বয়ং শ্রীগোপীজনবল্লভের উপাসক সম্প্রদায় (গৌড়ীয় সম্প্রদায়) কখনই অন্য কোন অংশাবতারের উপাসকসম্প্রদায়ের আশ্রয়প্রার্থী হইতে পারে না। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রামাণিক শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত—আকর শাস্ত্র; কারণ ইহা স্বয়ং শ্রীভগবানের কৃত। অন্য সমস্ত শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ, সোপান বা বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। গৌড়ীয়গণের শাস্ত্র, মন্ত্র, ঋষি, উপাস্য, সাধন, ধাম, প্রয়োজন—সমস্তই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। গৌড়ীয়গণের মন্ত্রের মধ্যে সমস্ত মন্ত্র, উপাস্যের মধ্যে ব্রহ্মপরমাত্মাদি তত্ত্ব, ঋষি শ্রীগান্ধর্বার মধ্যে সমস্ত উপাসক, সাধনের মধ্যে সমস্ত সাধন ও প্রয়োজনের মধ্যে সমস্ত প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত। ইহাই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। কেবল যে সম্প্রদায়-অনুরোধে এ কথা বলা হইতেছে, তাহা নহে; ইহা স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণসিদ্ধ ও অনুভবসিদ্ধ কথা।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগৌরহরিই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক এবং তাঁহার অনুগত পার্ষদগণই এই সম্প্রদায়ের গুরু। তাঁহাদের অনুগত শিষ্য-প্রশিষ্যাদিক্রমে যে পরম্পরা গড়িয়া আসিতেছে, তাহাই "গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা"। "পরিবার" বলিয়া একটি প্রথা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে চলিয়া আসিতেছে; যথা—শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবার, শ্রীঅদ্বৈত-পরিবার, শ্রীগদাধর-পরিবার, শ্রীবক্রেশ্বর-পরিবার, শ্রীনরোত্তম-পরিবার ইত্যাদি। 'পরিবার' একটি গোষ্ঠীবাচক পারিভাষিক শব্দ। কোনও গোষ্ঠীর মূল প্রবর্তক যে ভাবাবেশ লইয়া শ্রীগোপীজনবল্লভের ভজন করিয়া থাকেন, সেই ভাবাবেশযুক্ত সাধনপদ্ধতির অনুসরণকারী গোষ্ঠীকেই তাঁহার 'পরিবার' বলা হয়। অনেকে কেবল বাহ্য

বেশাদি (তিলকাদি) দেখিয়া পরিবার নির্ণয় করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ নির্ণয় যথেষ্ট নহে। কারণ কেবল বেশগ্রহণদ্বারা কেহই কোন পরিবারভুক্ত হইতে পারে না। পরিবারের মূল প্রবর্তকের ভাবাবেশের লোভাকৃষ্ট অনুসরণই পরিবারভুক্ত হইবার একমাত্র যোগ্যতা। তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত নিজ চেষ্টায় জীব এই আবেশ (শ্রীগোপীজনবল্লভের সুখানুসন্ধানাবেশ) কখনই লাভ করিতে পারে না। এই আবেশের মূল অধিকারিণী হইলেন শ্রীগান্ধর্বা। তাঁহার নিজজন বা প্রিয়জনের কৃপাতেই এই আবেশ লাভ হইতে পারে।

সুতরাং গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বাহুচ্ছায়াতলে রাখিবার অপচেষ্টা আদরণীয় নহে। এই সম্প্রদায় স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ইহার নিজের গুরু-পরম্পরাদি সবকিছু আছে। সাধক নিষ্কপট হইলে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামিসূত্রে তাহার নিকট সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবেন।

গৌড়ীয়সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার যোগ্যতা—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার ভজন করাই গৌড়ীয়ধর্মের বৈশিষ্ট্য। মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীগৌরহরি উক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ জগদ্‌বাসীকে সেসম্পর্কে সম্যক্ ধারণা দিয়া উহা লাভ করিবার উপায় নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া গেলেন। তাঁহার পরে তাঁহার একান্ত অনুগত গোস্বামিগণও তাঁহাদের আচরণের দ্বারা গৌড়ীয়ত্বের স্বরূপ জগদ্‌বাসীর নিকট প্রকাশ করিয়া গেলেন। শ্রীগৌরহরি ও তদনুগ গোস্বামিবর্গের শিক্ষা তথা আচরণকে নিষ্কপটভাবে অনুধ্যান করিলে জানা যাইবে যে, ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিযোগের অভাব অনুভব করিয়া উহা লাভ করিবার আশায় যে শত শত বিনিদ্র রজনীযাপন, যে বুকফাটা ক্রন্দন, তাহাই গৌড়ীয়ত্বলাভের একমাত্র যোগ্যতা।

শ্রীমদ্ভাগবতের "অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্তাঃ। প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুযিতং বিষণ্ণা মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্॥" (ভা: ৬।১১।২৬) অর্থাৎ অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক যেরূপ মাতার আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে, রজ্জুবদ্ধ বৎস যেরূপ ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া স্তন্যপানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে, প্রবাসী পতির দর্শন-অভিলাষে বিষণ্ণবদনা প্রেয়সী যেরূপ উৎকণ্ঠিতা হইয়া থাকে, হে কমললোচন! আমার মনও সেইরূপ একমাত্র তোমাকে দর্শন করিতে ব্যাকুল হইতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর "নাহি কৃষ্ণপ্রেমধন, দরিদ্র মোর এ জীবন, দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব।" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২।৩৬) ও "উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হৈল যুগসম। বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন॥ গোবিন্দ-বিরহে শূন্য

হৈল ত্রিভুবন। তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥ (শ্রীচৈ: চ: অ ২০।৩১-৩২) এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর "অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্যকথন। পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥" (শ্রীচৈ: চ: আ ১০।৯৬) ইত্যাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভ হইল না বলিয়া যে অভাববোধ, জ্বালাবোধ, আবেশ, অভিনিবেশ ও বুকফাটা ক্রন্দনের কথা জানা যায়, তাহাই গৌড়ীয়ত্ব লাভের একমাত্র যোগ্যতা।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই যোগ্যতা লাভ হইবে কিরূপে? ইহা কি চেষ্টাসাপেক্ষ? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, ইহা চেষ্টাসাপেক্ষ নহে। তথাকথিত শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্তনাদি রাশি রাশি সাধনের দ্বারাও ইহা লভ্য নহে। ইহা একমাত্র মহৎকৃপালভ্য। "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ * * *" (শ্রীভা: ১১।২০।৮) শ্লোকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাদৃচ্ছিকী বা আকস্মিকী মহৎকৃপাকেই ভক্ত্যধিকারলাভের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। এই মহৎকৃপালাভের অন্য কোন কারণ নাই। মহতের স্বতন্ত্র ইচ্ছায়ই ইহা সংঘটিত হইয়া থাকে। নলকূবর ও মণিগ্রীবের প্রতি শ্রীনারদের আকস্মিকী কৃপাই ইহার উদাহরণ। তাহারা নিতান্ত মদমত্ত থাকিয়াও শ্রীনারদের কৃপায় শুদ্ধভক্ত্যধিকার লাভ করিয়া প্রেমপ্রাপ্তির যোগ্য হইয়াছিলেন। এই যাদৃচ্ছিকী মহৎকৃপা যিনি লাভ করিয়া থাকেন, পরকালে ভগবদিচ্ছায় উপযুক্ত মহতের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ যে অবশ্যই হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। মহতের কৃপায়ই তাঁহার হৃদয়ে ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী বৃত্তি সঞ্চারিত হইবে এবং সেই বৃত্তি লইয়া ভজন করিলে তিনি প্রেমলাভ করিতে পারিবেন।

যাহার প্রতি মহৎকৃপা হয় নাই, সে স্বভাববিহিত ক্রমপন্থায় চালিত হইলে অর্থাৎ অন্তর্যামিদৃষ্টিতে ভূতাদরপূর্বক কর্মার্পণ করিতে করিতে মহৎকৃপালাভ-আশায় অনুক্ষণ ব্যাকুলভাবে পরমকরুণ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ডাকিলে, তাঁহারা নিশ্চিতরূপে অভীষ্ট মহতের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ করিয়া দিবেন এবং সে সদ্গুরু লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারিবে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাহার দৃষ্টান্ত। এক বিশাল জমিদার পরিবারে জন্মলাভ করিয়াও বাল্যকাল হইতে বিষয়ভোগের প্রতি তাঁহার অভিলাষের লেশ মাত্রও ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিবর্গের দর্শন ও সঙ্গলাভ হইল না বলিয়া তিনি অনুক্ষণ অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইতেন এবং অশ্রুগঙ্গায় স্নাত হইয়া নিজেকে শত শত ধিক্কার করিতে করিতে অনাহারে ও অনিদ্রায় দিবারাত্র অতিবাহিত করিতেন। এইরূপে শ্রীগৌরপার্ষদগণের সঙ্গলাভের আশায় ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে

করিতে একদিন শ্রীগৌরহরির ইচ্ছায় তিনি নিদ্রাবিষ্ট হইলেন। শ্রীগৌরহরি স্বপ্নছলে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া শ্রীল নরোত্তমকে বলিয়াছিলেন—"নরোত্তম! তোমার আর্তিযুক্ত ক্রন্দনে আমি ধৈর্যধারণ করিতে পারিতেছি না। তুমি চিন্তা করিও না। অচিরে তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত ব্রজধামে যাইয়া তথায় আমার নিজজন, আমার অভিন্নবিগ্রহ বিরক্তশিরোমণি শ্রীলোকনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক তোমার অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবে।"

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনরোত্তমের বুকফাটা ক্রন্দনে ধৈর্যধারণ করিতে না পারিয়া স্বপ্নছলে নিজে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়া জানাইয়া দিলেন যে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভুই তাঁহার গুরুদেব। শ্রীল নরোত্তম নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া গুরু অন্বেষণ করিতে যান নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশ পাইয়া তিনি পাগলের প্রায় শ্রীব্রজধামের দিকে ছুটিতে লাগিলেন। তথায় তিনি শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভুর কৃপাভিষিক্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইয়া শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভুর দর্শন পাইলেন। দর্শনান্তে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষালাভের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করায় তিনি দীক্ষা দিবার জন্য কোন আগ্রহ দেখাইলেন না। কিন্তু শ্রীনরোত্তমের অদ্ভুত বৈরাগ্য ও বিরহকাতরতাময় দৈন্য দর্শনে সকল ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের হৃদয় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। সেইজন্য সকলে গিয়া শ্রীল নরোত্তমকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভুকে অনুরোধ করিলেন। তাহাতেও তিনি সহসা রাজি হইলেন না। মাত্র সকল বৈষ্ণবের বহু অনুনয় বিনয়ের পরে তিনি শ্রীনরোত্তমকে "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তম শ্রীল লোকনাথ প্রভুর নিকট হইতে শ্রীহরিনামোপদেশ লাভ করিয়া নির্জনে দিবারাত্র জাগ্রত থাকিয়া দৈনিক দুইলক্ষ নাম জপ করিতে লাগিলেন।

শ্রীনরোত্তমের উক্ত আচরণ হইতে গুরুকরণের পূর্বেও সদ্‌গুরুলাভের জন্য শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে কিরূপে সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতে হইবে, সেই জ্ঞান হয় এবং শ্রীগৌরসুন্দরই যে সদ্‌গুরুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপন করিয়া দেন ইহাও জানা যায়। সদ্‌গুরুলাভান্তে তাঁহার প্রদত্ত শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র কিভাবে সংখ্যা রাখিয়া নিদ্রাত্যাগ করিয়া দিবারাত্র গ্রহণ করিতে হয়, তাহাও তাঁহার আচরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়। অবশ্য শ্রীনরোত্তম তাঁহার নিত্যপার্ষদ। কেবল লোকশিক্ষার জন্যই তিনি এইপ্রকার লীলা করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং কেবল গুরুকরণরূপ বাহ্য অনুষ্ঠানে তৃপ্ত না হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালাভের জন্য নিদ্রাত্যাগপূর্বক তাঁহার প্রদত্ত শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র সর্বদা কীর্তন করিতে যত্নবান্ হওয়াই গৌড়ীয়গুরুর কৃপালাভের একমাত্র যোগ্যতা। সাধারণের পক্ষে এইরূপ যোগ্যতালাভ সহজ নহে। হৃদয়ে রতির অঙ্কুর জাত না হইলে এইরূপ যোগ্যতালাভ হইবে না।

ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, হৃদয়ে রত্যঙ্কুর জাত হওয়াই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রবেশলাভের একমাত্র যোগ্যতা, জাতরতি ভূমিকার পর হইতেই গৌড়ীয় সাধনের আরম্ভ। এসম্পর্কে শ্রীল রূপপাদ লিখিয়াছেন—

"উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্‌নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ২।১।২৭৬)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহাদের রতি উৎপন্ন হইয়াছে, অথচ বিঘ্ন সর্বতোভাবে দূর হয় নাই এবং শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের যোগ্যতালাভ হইয়াছে, তাঁহারাই সাধকরূপে খ্যাত। বস্তুতঃ তাহারাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাধক। 'প্রেমলাভ' উদ্দেশ্য না রাখিয়া যেখানে ভক্তিসাধন করা হইতেছে সেখানে গৌড়ীয়ত্ব নাই। 'প্রেম'বাসনালাভই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাধনের মূলভিত্তি।

এই প্রেমলাভের বাসনা বা ভক্তিবাসনা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীগান্ধর্বার প্রিয়জন (মহতের) কৃপাসাপেক্ষ। সুতরাং প্রেমিক মহতের কৃপাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে প্রবেশলাভের একমাত্র যোগ্যতা।

অধিকারনির্ণয়

শ্রীল আচার্যদেবের আচার্যত্বের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল প্রত্যেক ভক্তিকামীকে তাহার অধিকারবিষয়ে সচেতন করানো। সাধনপথে ইহা যে অপরিহার্য ইহাতে দ্বিমত হইবার কিছুই নাই। মাদৃশ স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম উপদেশ পাওয়া মাত্রই নিজেকে "নামপরায়ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব" বলিয়া অভিমান করিতেছিল। এইরূপ অভিমান যে সম্পূর্ণ ভক্তিবিরোধী, বহু শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া শ্রীল আচার্যদেব ইহা সকলকে বুঝাইতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র লাভ করামাত্রই যে কোন ব্যক্তিকে নামসাধক বলা যাইবে, তাহা নহে। কারণ হৃদয়ে রজস্তমোগুণ প্রবল থাকা পর্যন্ত সকলেই কর্মাধিকারী। কর্মাধিকারে চিত্ত সর্বদা নিজভোগপর নানা

চিন্তায় বিক্ষিপ্ত থাকে। সেইজন্য শ্রীহরিনাম গ্রহণকালে চিত্ত ভগবৎস্মৃতির পরিবর্তে অসৎ বিষয়-চিন্তায়ই মগ্ন থাকে। সেরূপ হরিনামগ্রহণ অনবধানতারূপ নামাপরাধবিশেষ। কোটি কোটি জন্ম এইরূপ অপরাধযুক্ত হরিনাম কীর্তনদ্বারা ভক্তিফল প্রেম লাভ হইবে না। এসম্পর্কে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥" (শ্রীচৈ: চ: আদি ৮।১৫)

অর্থাৎ বহু জন্ম ধরিয়া এই অনবধানতাযুক্ত হরিনাম কীর্তন করিলেও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধন লভ্য হয় না।

এইরূপ সাধনকে শ্রীল রূপপাদ **'অনাসঙ্গ সাধন'** বলিয়াছেন।

"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্লভা ॥"
(শ্রীভ: র: সি: ১।১।৩৫)

জন্ম জন্ম ধরিয়া বহু অনাসঙ্গ সাধনের দ্বারা ভক্তিলাভ হয় না। সাসঙ্গ সাধনেও সহসা ভগবান্ ভক্তি দেন না অর্থাৎ হৃদয় হইতে ভোগমোক্ষবাঞ্ছা নির্মূল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।

সাসঙ্গ—আসঙ্গযুক্ত; 'আসঙ্গ' শব্দের অর্থ সাধননৈপুণ্য বা সাক্ষাৎ ভজনে প্রবৃত্তি বলিয়া শ্রীল জীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন। অনাসঙ্গ—আসঙ্গহীন বা সাক্ষাৎ ভজনে প্রবৃত্তিহীন। আসঙ্গ শব্দের আভিধানিক অর্থ আসক্তি।

সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তি বলিতে কি বুঝায় সেবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। মনুষ্য যে কোন কার্য করিবার পূর্বে উক্ত কার্য হইতে কি ফললাভ হইবে, সেবিষয়ে ভালভাবে বুঝিয়া উক্ত ফললাভ-নিমিত্ত তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এজন্য 'নিষ্কাম কর্ম' কথাটা সম্পূর্ণ অবাস্তর। এসম্পর্কে শ্রীল জীবপাদ বলিয়াছেন—"যদ্ যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্" (শ্রীভ:স: ২২৪ অনু:) অর্থাৎ জীব যে যে কার্য করে, তাহা কামনামূলক চেষ্টামাত্র।

শাস্ত্রে শ্রীহরিনামকীর্তন বা ভক্তি করিতে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য কি? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, জীব অনাদিকাল হইতে শ্রীভগবানকে ভুলিয়া মায়াকবলিত হইয়াছে। হৃদয়ে অনুক্ষণ ভগবৎস্মৃতি জাত করাইয়া মায়াগ্রস্ত হইবার মূল কারণস্বরূপ এই ভগবদ্বিস্মৃতি দূর করাই সাধনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাকে নিদান চিকিৎসা বলিয়া শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে উল্লেখ করিয়াছেন।

"স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥"

(শ্রীভ: স: ৯৪ অনু: ধৃত পদ্মপুরাণবচন)

অর্থাৎ সর্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করা উচিত। কদাপি বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। যাবতীয় বিধি ও নিষেধ এই দুইটিরই দাসস্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদেবকীদেবীর গর্ভগত হইবার পর দেবতাগণ তাঁহার স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন—

"শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্ নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে ॥"

(শ্রীভা: ১০।২।৩৭)

হে ভগবন্! আপনার পাদপদ্মযুগলে **আবিষ্টচিত্ত** হইয়া যিনি যাবতীয় কার্যে আপনার পরমমঙ্গলময় নাম ও রূপ শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণপূর্বক কীর্তন করিতে করিতে অপরকে স্মরণ করাইয়া থাকেন ও নিজে চিন্তন করেন, তাঁহার আর সংসার থাকে না।

উপর্যুক্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে নিরন্তর শ্রীবিষ্ণুর স্মৃতিতে বিভোর বা আবিষ্ট থাকাই সমস্ত সাধনের শেষফল বলিয়া জানা যায়। অতএব এতদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, শ্রীহরিনামগ্রহণরূপ সাধনের একমাত্র ফল শ্রীবিষ্ণুর প্রতি আবেশলাভ। আবেশহীন সাধন সাধনপদবাচ্য হইতে পারে না। যেখানে আবেশলাভ শ্রীহরিনামকীর্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেইখানেই ইহা যথার্থ সাধনপদবাচ্য।

যেখানে প্রীতির আধিক্য সেইখানেই স্মৃতির আধিক্য দেখা যায়। শ্রীল জীবপাদের মতে জীব পরমাত্মবৈভব (পরমাত্মার দ্বারা সৃষ্ট) হওয়ায় তাহার হৃদয়ে শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তির অবস্থিতি নাই। শ্রীভগবানের প্রতি মমতাযুক্ত হওয়া এই হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তি। জীবের স্বরূপে হ্লাদিনীশক্তি না থাকায় শ্রীভগবানের প্রতি মমতাযুক্ত হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। এইরূপ অবস্থায় অনুক্ষণ তাঁহার সুখানুসন্ধানে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার নাম কীর্তন করা জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে তাঁহার সুখানুসন্ধিৎসা লইয়া শ্রবণ-কীর্তন করিতে শাস্ত্রের যে উপদেশ, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হ্লাদিনীশক্তিকে জীবহৃদয়ে আবির্ভূত করানো। লৌহ অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইলে যেরূপ দহন করিবার শক্তি লাভ করে, সেইরূপ জীবের ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইলেই শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হওয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে। তখন যে শ্রীহরিনামকীর্তন, তাহাতে শ্রীভগবানের সুখচিন্তা অবশ্য থাকিবেই এবং তাহাই বস্তুতঃ ভক্তিসাধনপদবাচ্য।

সেই ভূমিকায় সাধককে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পর্যায়ভুক্ত বলা যাইবে। তাহার পূর্বে প্রাকৃত ভূমিকায় যে সাধন, তাহা কর্মামিশ্রা ভক্তি, ভক্ত্যাভাস বা পূর্বাঙ্গরূপা ভক্তি-পদবাচ্য। এই ভূমিকায় সাধক স্বরূপতঃ কর্মী। তাহার এই কর্মমিশ্র অধিকারে যে আবেশহীন শ্রীহরিনামকীর্তন, তাহার প্রেরক হ্লাদিনীশক্তি না হওয়ায় তাহা শুদ্ধভক্তি নহে—'ভক্ত্যাভাস' মাত্র। শ্রীল জীবপাদের মতে ভক্ত্যাভাস প্রেমলাভের সাক্ষাৎ কারণ নহে। হ্লাদিনীশক্তির দূত মহতের কৃপাই প্রেমলাভের একমাত্র কারণ। সুতরাং এই কর্মমিশ্র অধিকারে সাধক নিজেকে নামপরায়ণ শুদ্ধভক্ত বলিয়া বিচার করা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। অধিকাংশ সাধক এই ভ্রমের বশবর্তী হইয়া নিজের উপযুক্ত অধিকার নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া পড়ে। পরিণামে ভক্ত্যাভাসকে ভক্তি বলিয়া ধারণা করিয়া প্রেমলাভ হইতে বঞ্চিত হন। **সাধক-সম্প্রদায়ের এই ভ্রম দূর করিয়া প্রত্যেক ভক্তিসাধককে তা'র প্রকৃত অধিকার সম্পর্কে সচেতন করানো শ্রীল আচার্যদেবের আচার্যত্বের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য**। তাঁহার শিষ্যাভিমানী অধিকাংশ ব্যক্তি যে কর্মাধিকারী—ভক্ত্যধিকারী নহে এবং তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত ভক্তি যে ভক্তি নহে, ভক্ত্যাভাস(কর্মার্পণ)মাত্র, ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া তিনি প্রায় অধিকাংশের নিকট অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে বহু ভক্তাভিমানী কর্মী তাঁহার এই উপদেশের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের যুক্তি হইল—"আমরা কি সবসময়ে প্রাথমিক স্কুলেই পড়িয়া থাকিব, আর কলেজে যাইব না?" এই যুক্তি দেখাইয়া তাহারা অন্য গুরু আশ্রয় করিয়া নিজ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রাজসী ও তামসী ভক্তি সাধনপূর্বক তাহাতেই তৃপ্তিলাভ করিল। পরিণামে অজাতরতি ভূমিকায় নিজে গুরু সাজিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার বশবর্তী হইল। কিন্তু যাহারা ভাগ্যবান্, তাহারা তাঁহার উপদেশের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে পড়িয়া রহিলেন এবং প্রাথমিক অবস্থায় প্রাকৃত ভূমিকা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তিসাধনের যোগ্যতালাভের জন্য মহৎকৃপা যে অপরিহার্য, ইহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া তৎপ্রাপ্তির আশায় ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক শ্রীহরিনাম-কীর্তনমুখে ইষ্টদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্মার্পণ-পন্থার অবলম্বনে তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইলেন।

শ্রীল আচার্যদেব মিশনে অবস্থানকালে মঠবাসিগণের ভজনে উন্নতি হইতেছে না লক্ষ্য করিয়া সকলের রুচি পরীক্ষাপূর্বক জানিতে পারিলেন যে, প্রায় সকলেই রজস্তমোগুণাক্রান্ত প্রবৃত্তিমার্গী। এই অবস্থায় তাদের পক্ষে আবেশসহকারে শ্রীহরিনামগ্রহণ অসম্ভব। অতএব বর্ণাশ্রমধর্ম-পালনপূর্বক কর্মার্পণ করিলেই চিত্ত

শুদ্ধ হইয়া শ্রীহরিনামশ্রবণযোগ্যতা লাভ হইবে। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ ও শ্রীল জীবপাদের এই সিদ্ধান্তানুসরণে* তিনি বলিলেন যে, যত মঠবাসী আছেন, সকলেরই গৃহস্থ হইয়া কর্মার্পণ করিবার অধিকার। নিজের নিবৃত্তাধিকার হইয়াছে বলিয়া যাহারা মনে করিতেছেন, তাহারা নিষ্কিঞ্চন হইয়া জঙ্গলে বা বৃক্ষমূলে থাকিয়া ভজন করিতে পারেন। মিশনে থাকা তাহাদের পক্ষে ভজনের অনুকূল নহে। কারণ এখানে বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির লোক আছে। তাহাদের সঙ্গে ঐকান্তিক ভজন বাধাপ্রাপ্ত হইবে। অবশ্য যাহাদের গৃহস্থ হইবার অধিকার অথচ তজ্জন্য যোগ্যতা নাই, তাহাদের দায়িত্ব তিনি নিজেই লইবেন বলিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি শ্রীপুরুষোত্তমধামে, শ্রীনবদ্বীপধামে ও শ্রীবৃন্দাবনধামে তিনটি মঠ স্থাপন করিয়া দিবেন এবং তথায় যাঁহারা থাকিবেন তাহাদের জন্য কিছু জমির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। তাঁহারা বিষয়ী লোকের নিকট ভিক্ষার জন্য না গিয়া সেখানে চাষ করিয়া ধামোৎপন্ন দ্রব্যে জীবননির্বাহপূর্বক ভজন করিবেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাবে কেহই রাজী হইলেন না। রাজী না হওয়ার প্রধান কারণ হইল ভিক্ষা। ভিক্ষা বন্ধ হইলে লোকের সহিত সম্পর্ক থাকিবে না, ফলে অর্থ ও প্রতিষ্ঠালাভের আশা পূরণ হইবে না। যে অন্যাভিলাষী, সে প্রতিষ্ঠা না পাইলে বাঁচিতে পারিবে না। সেইজন্য তাঁহার উক্ত প্রস্তাবে কেহই রাজী হইলেন না। তজ্জন্য তিনি বিতৃষ্ণ হইয়া নিজে মিশনের সহিত তাঁহার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন।

শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যের মাহাত্ম্য প্রদর্শন

ত্যক্ত্যাশ্রমিদের উদরপূর্তির জন্য মাধুকরী ভিক্ষা অপেক্ষা শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যেরই শ্রেষ্ঠত্ব ভজনশীল মহদ্‌গণের দ্বারা কীর্তিত হইয়াছে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার রচিত 'স্বনিয়ম-দশকে' লিখিয়াছেন—

"ব্রজোৎপন্ন-ক্ষীরাশন-বসন-পাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং সনিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি-পুরতঃ॥"

আমি দম্ভশূন্য হইয়া শ্রীব্রজধামোৎপন্ন দুগ্ধাদি ভোজ্য দ্রব্য এবং পরিধেয় বস্ত্র ও পাত্রাদি দ্বারা ব্যবহার নির্বাহ করিয়া নিয়মপূর্বক যেরূপ শ্রীগোবর্ধনসন্নিহিত শ্রীরাধাকুণ্ডতটে বাস করিতে পারি ও মৃত্যুসময়ে শ্রীজীব গোস্বামি প্রভু প্রমুখ ভাগবতবৃন্দের সম্মুখে প্রিয়তম শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।

---

* 'রজস্তমোগুণাক্রান্ত সাধকের পক্ষে কায়িক সেবার উপাদেয়তা' প্রকরণ আলোচ্য।

স্থূলভিক্ষা অপেক্ষা মাধুকরী শ্রেষ্ঠ। শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যকে স্বভাবসিদ্ধ শ্রীভগবৎপ্রসাদ-বিচারে গ্রহণ করা মাধুকরী গ্রহণ অপেক্ষা অধিকতর ভজনের অনুকূল। মাধুকরী ভিক্ষার দ্রব্য নির্গুণ; কিন্তু শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় অবতীর্ণ চিদ্‌বিলাসময় অপ্রাকৃত বস্তু। নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে যেরূপ চিদ্‌বিলাসময় ভগবজ্জ্ঞান শ্রেষ্ঠ অথবা নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে যেরূপ চিদ্‌বিলাসী শ্রীভগবান্ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ মাধুকরী হইতে স্বয়ং অবতীর্ণ চিদ্‌বিলাসময় শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যের শ্রেষ্ঠত্ব মহাজনগণ কীর্তন করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্যদেব শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যকে চিদ্‌বিলাসময় শ্রীভগবৎপ্রেরিত অপ্রাকৃত বস্তুরূপে দর্শন করিতেন এবং ধামোৎপন্ন দ্রব্য ব্যতীত তিনি কখনও অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করিতেন না। তিনি শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যে জীবন নির্বাহকারী কুকুরকেও পরম সুকৃতিশালী বলিয়া আদর করিতেন ও তাহার ভাগ্যের প্রশংসা করিতেন।

তিনি সব সময় ধামের মজুর হইতে সকলকে উপদেশ দিতেন। তিনি নিজে আচরণপূর্বক ইহা সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন। এ বিনীত লেখক মঠবাসকালে একবার শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিতেছিল। একদিন বৈকাল চারিটার সময় হঠাৎ দেখিল যে, মঠবাসী সকলেই মুলাক্ষেতে বসিয়াছেন। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজকেও হাতে একটি খুরপি ধরিয়া ঐ মুলাক্ষেতের দিকে যাইতে লক্ষ্য করিল। অন্যসকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে শ্রীল আচার্যদেব নিজে একটি খুরপি ধরিয়া মুলাক্ষেতের ঘাস বাছিতে গিয়াছেন জানিতে পারিয়া মঠবাসী সকলেই সেখানে হাজির হইয়াছেন এবং শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজও ঐ ক্ষেতে ঘাস বাছিতে যাইতেছেন। ইহা ছিল শ্রীল আচার্যদেবের আর একটি বৈশিষ্ট্য। আচার্য অর্থ আচরণশীল প্রচারক অর্থাৎ তিনি যাহা উপদেশ করেন, তাহা নিজের আচরণেও প্রতিফলিত করেন। শ্রীল আচার্যদেব সর্বদা তাহাই করিতেন। মঠবাসিগণ ভিক্ষা না করিয়া ধামের জমিতে মজুর হইয়া কেবল সেই ধামোৎপন্ন দ্রব্যে জীবননির্বাহপূর্বক ভজন করুক, ইহা তাঁহার একমাত্র ইচ্ছা ছিল। তিনি বলিতেন, যাহারা নিজেকে 'ধামের মজুর' অভিমান করিয়া ধামসেবায় সমস্ত শক্তি বিনিয়োগ করিতে পারিবে, তাহারা ক্রমশঃ নিরপরাধ হইয়া শ্রীধামপ্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনামপ্রভুর কৃপাও পাইতে পারিবে।

আচরণহীন প্রচারক সাজিয়া পরোপদেশে পণ্ডিত হওয়া অপেক্ষা ধামের মজুর হইতে পারিলে প্রকৃত মঙ্গললাভ হইবে বলিয়া তিনি সব সময় সকলকে

বলিতেন। যাহারা শত শত সাধন সত্ত্বেও কামক্রোধাদি রিপুর হাত হইতে মুক্ত হইতেছে না, শত শত অন্যাভিলাষ যাহাদিগকে সর্বদা বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতেছে, তাহারাও যদি শ্রীধামবাসী শ্রীধর ঠাকুর প্রভৃতির আনুগত্যে অভিনিবেশ সহকারে প্রীতিযুক্ত হইয়া ধামের মজুর হয়, তবে অচিরে শ্রীধামেশ্বরের কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

তিনি নিজে আচরণপূর্বক কি মঠবাসী কি গৃহস্থ সকলকে প্রীতিপূর্বক শ্রীধামের সেবা করিয়া ধামোৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা জীবন নির্বাহ করিতে প্রেরণা দিতেন। তিনি সত্য সত্য কিরূপে নিজেকে ধামের মজুর অভিমান করিতেন, তাহার এই আচরণ ও শিক্ষা হইতে তাহা স্পষ্ট জানা যায়।

ভগবৎসেবোপকরণের মাহাত্ম্য প্রদর্শন

শ্রীল আচার্যদেব কিভাবে সর্বদা ভগবৎসেবাচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, তাঁহার প্রত্যেকটি আচরণ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতি তুচ্ছ বস্তুকেও তিনি শ্রীভগবানের সেবার উপকরণ জ্ঞানে গুছাইয়া রাখিতেন। নারিকেলের ছোবড়া ও মালা, কয়লাগুঁড়ো এমনকি ন্যাকড়া পর্যন্ত গুছাইয়া রাখিতে তিনি উপদেশ দিতেন। তাঁহার এইরূপ উপদেশের উদ্দেশ্য এই যে, ঐসব জিনিষ নিতান্ত হেয় হইলেও প্রয়োজনের সময় শ্রীভগবানের সেবায় লাগিতে পারে। তাঁহার এইরূপ শিক্ষার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একবার তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থানকালে শ্রীভক্তিবিজয়ভবন হইতে তাঁহার ভজনকুটীরের অভিমুখে যাইতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে অনেক বৈষ্ণব এবং এ দীন লেখকও যাইতেছিল। যাইতে যাইতে তাঁহার বামপাশে কতকগুলি কয়লাগুঁড়ো পড়িয়াছে দেখিয়া সেদিকে হাত দেখাইয়া বলিলেন—"এ কী? এতগুলি সেবার উপকরণ কেন নষ্ট হইতেছে? তোমরা জান, তোমরা হয়ত' কোন সময়ে ভগবানকে ঠকাইতে পার, কিন্তু ইহারা কখনই তা' করিবে না। একদিন না একদিন নিশ্চয়ই তাঁহার সেবায় লাগিবে। তাই তোমাদের জীবনের অপেক্ষা এগুলির মূল্য যথেষ্ট বেশি।" ইহা বলিয়া তিনি সেখানে বসিয়া তা'র মধ্য হইতে বড় বড় খণ্ড সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া সকলেই সেইরূপ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এলাহাবাদ মঠে অবস্থানের সময় তাঁহাকে একবার ডাবের জল দেওয়ার পর সেই ডাবটিকে বাহিরে ফেলা হইয়াছিল। তিনি তাহা দেখিয়া যে ডাবের জল দিয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাকে ডাবের জল দেওয়ার

পর সে ডাবটা কি হইল ?" উক্ত ব্যক্তি বলিলেন—"আজ্ঞে, বেড়ার বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"উহা কি একটা সেবার উপকরণ নয় ? উহাকে এইভাবে নষ্ট করা কি উচিত ?"

সেই এলাহাবাদ মঠে অবস্থানকালে তিনি একবার শ্রীরাধামোহনজীর সঙ্গে কোন এক স্থানে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে রাস্তায় একখানা কাপড়ের পাড় দেখিয়া বলিলেন—"রাধামোহন! এ কাপড়ের পাড়টি উঠাইয়া রাখ; ইহা কোন সময় শ্রীভগবানের সেবায় লাগিতে পারে।" শ্রীরাধামোহনজী কি কাপড়ের পাড় হইয়া থাকিবে ভাবিয়া প্রথমে ঘৃণাসহকারে তাহা উঠাইতে ইতস্ততঃ করিলেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আদেশজ্ঞানে পরে উহা তুলিয়া রাখিলেন।

এইরূপ ভগবৎসেবোপকরণবুদ্ধিতে তিনি অতিতুচ্ছ বস্তুকেও খুব যত্নের সহিত গুছাইয়া রাখিতে উপদেশ দিতেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার জড়দর্শন ছিল না। তিনি সর্বদা ভগবৎসেবাচিন্তায় আবিষ্ট থাকায় প্রত্যেক বস্তুকে অপ্রাকৃত ভগবৎসেবোপকরণ জ্ঞান করিতেন। তজ্জন্য কোনও বস্তুর প্রতি তাঁহার হেয়জ্ঞান বা ঘৃণাভাব ছিল না। অপ্রাকৃত ভগবৎসেবোপকরণজ্ঞানে তিনি প্রত্যেক বস্তুকে আদর করিতেন।

প্রকৃত হরিভজনকারীর আদর্শ আচরণ শিক্ষা

গৌড়ীয় মিশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার দিন হইতেই শ্রীল আচার্যদেব কোনও বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া অনুক্ষণ ভজনরত থাকিতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁহার আচরণ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মঠের মধ্যে অন্নকূট মহোৎসব অনুষ্ঠানের বাহ্যাড়ম্বরকে তিনি আচার্য হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, ইহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আচরণহীন প্রচার বন্ধ, অনুভূতিহীন লেখকের দ্বারা লিখিত পত্রিকা প্রকাশন বন্ধ, অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ত্যাগ, নিজে মকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াও যাহারা গৌড়ীয় মিশনের মালিকানা দাবি করিয়া তাঁহার সঙ্গে মকদ্দমা করিয়াছিল, উক্ত গুরুভ্রাতাগণকে মঠদান ইত্যাদি বহু আদর্শ আচরণ একান্ত হরিভজনের প্রতি তাঁহার সুতীব্র নিষ্ঠার পরিচয় দেয়। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি তাঁহার উপর্যুক্ত আচরণের নিদর্শন।

(১) প্রচার বন্ধ—তিনি যখন আচার্য হইলেন, তখন অধিকাংশ মঠবাসী ব্যক্তিগত আচরণের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া প্রচারের উপর গুরুত্ব দিতেন। অবশ্য প্রচারের দ্বারা অর্থ ও প্রতিষ্ঠা প্রচুর লাভ হইত। সেইজন্য উক্ত অন্যাভিলাষের

বশবর্তী হইয়া নিজ আচরণের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া সকলেই প্রচারের প্রতি আগ্রহী হইতেন। কিন্তু এইরূপ আচরণহীন প্রচারের দ্বারা বক্তা ও শ্রোতা কাহারও মঙ্গল হইবে না, একথা শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেওয়ার পর তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রচার বন্ধ করিয়া দিতে নির্দেশ দিলেন। অবশ্য তাঁহার এই নির্দেশ অন্যাভিলাষিগণের পক্ষে গ্রহণীয় হইল না। তাঁহারা ইহাতে খুবই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তবুও তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন।

(২) **পত্রিকা-প্রকাশন বন্ধ**—সেই সময় মিশন হইতে কয়েকটি পারমার্থিক পত্রিকা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইত; যথা—দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ, সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ও মাসিক পরমার্থী ইত্যাদি। এগুলিকে তাঁহার নির্দেশে বন্ধ করা হইল। ইহার কারণস্বরূপ তিনি বলিলেন যে, আচরণহীন বক্তার (সরাগবক্তার) বক্তৃতা যেরূপ শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ অনুভূতিহীন লেখকের লেখাও পাঠকহৃদয়ে রেখাপাত করিতে পারিবে না। অধিকন্তু লেখকের ভক্তিসম্বন্ধে নিজের যে ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাহা তা'র লেখার মাধ্যমে পাঠকহৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে ভক্তিপথে অগ্রসর করাইবার পরিবর্তে তথা হইতে চ্যুত করিয়া দিবে। এই সিদ্ধান্ত এতই সূক্ষ্ম যে, সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তবুও তিনি সকলকে ইহা বুঝাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(৩) **অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ত্যাগ**—শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থানের সময় জনৈক খ্যাতিসম্পন্ন মঠবাসী ব্রহ্মচারী কোন একটি নূতন স্থানে একটি মঠ স্থাপন করিতে প্রস্তাব দিলেন। তাহার সঙ্গে আলোচনা করিয়া শ্রীল আচার্যদেব জানিতে পারিলেন যে, উক্ত স্থানে অন্য সম্প্রদায়ের একটি মঠ আছে এবং তাহা খুব ভাল চলিতেছে। এই কথা শুনিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—"দেখ, হরিভজন করিতে আসিয়া কাহারও সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা অনুচিত। অন্য কেহ সেখানে একটি মঠ করিয়াছে। তুমি তথায় আর একটি মঠ করিয়া তাহাদের প্রতিযোগী হওয়া আদৌ উচিত নহে। কারণ ইহার দ্বারা তোমার তাহাদের প্রতি মাৎসর্য বৃদ্ধি পাইবে। ভক্তি নির্মৎসর সাধুগণের ধর্ম। সুতরাং ভক্তিসাধকের এইরূপ মাৎসর্যমূলক প্রতিযোগিতায় প্রয়াসী হওয়া অনুচিত। উক্ত আলোচনার সময় এঅধম লেখক তথায় উপস্থিত ছিল।

এসম্পর্কে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের আর একটি ঘটনাও এখানে উল্লেখযোগ্য। সেসময় শ্রীল আচার্যদেবের সঙ্গে বিরোধ করিয়া যাহারা মকদ্দমা করিয়াছিল তিনি তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ মঠ প্রদান করিলেন। ফলে মাদ্রাজে

অবস্থিত মঠ তাহাদের ভাগে পড়িয়াছিল। সেসময় শ্রীহরিগোপাল দাসজী ও শ্রীরাজুগোপাল দাসজীর সঙ্গে এ অধম লেখক ভিক্ষা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কটকস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে মাদ্রাজে গিয়াছিল। সেখানে একজন লোক মন্দির করিবার জন্য আবশ্যকীয় জমি ও মন্দির নির্মাণের সমস্ত উপকরণ দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণের খরচ বাবদ ৪৫০০০ টাকার একটি চেক্ আমাদিগকে দিলেন। আমরা তাহাতে খুব খুশী হইয়া গেলাম। কারণ সেসময়ে ৪৫০০০ টাকার মূল্য কিছু কম নহে। শ্রীহরিগোপাল জী সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কথা জানাইয়া শ্রীল আচার্যদেবের আদেশ পাইবার আশায় তাঁহাকে একটি টেলিগ্রাম করিলেন। তিনি টেলিগ্রামের উত্তরে জানাইলেন—"Kick out that money and come back." অর্থাৎ উক্ত অর্থকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আইস। আমরা তাঁহার এই উত্তর পাইয়া প্রথমে একটু বিষণ্ন হইয়া পড়িলাম। কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলাম যে, এখানে একটি মঠ থাকা অবস্থায় প্রতিযোগিতা করিয়া আর একটি মঠ স্থাপন করা শ্রীল আচার্যদেবের অভিপ্রেত নহে। তজ্জন্য তিনি উক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহার পর আমরা বিনীতভাবে উক্ত ভদ্রলোককে সমস্ত কথা বুঝাইয়া তাঁহার চেক্ ফেরত দিলাম।

(৪) **বিরোধিগণকে মঠদান**—শ্রীল আচার্যদেবের নিরপেক্ষ আচরণে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিগণ অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং পরিশেষে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া মঠের মালিকানা পাইবার জন্য মকদ্দমাও করিলেন। কিন্তু প্রত্যেকটি মকদ্দমায় তাহারা হারিয়া গেলেন। এই সময় একদিন প্রাতঃকালে শ্রীল আচার্যদেব কাহাকেও না জানাইয়া একাকী কলিকাতা বাগবাজারস্থিত গৌড়ীয় মঠ হইতে মকদ্দমার প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সাহা মহাশয়ের বাটীতে গিয়া পৌঁছাইলেন। তাঁহাকে এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার বাটীতে পৌঁছিতে দেখিয়া শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহার বিস্মিত ভাব দেখিয়া শ্রীল আচার্যদেব বলিলেন—"কুঞ্জদা! আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইতেছেন কী? না, আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। আমি আমার হৃদয়ের ব্যথা আপনাকে জানাইতে আসিয়াছি। আপনি বসিলে সমস্ত কথা বলিব।" তিনি বসিবার পর শ্রীল আচার্যদেব বলিলেন—"দেখুন কুঞ্জদা! আমরা হরিভজন করিতে আসিয়াছি। বিষয় সম্পত্তি লইয়া এইরূপ কোর্ট কাছারির দ্বারস্থ হওয়া আমাদের পক্ষে ঘোর নিন্দনীয়। অবশ্য আপনি মকদ্দমায় হারিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে দুঃখ করিতেছেন। কিন্তু আমার অনুরোধ, আপনি কোন দুঃখ করিবেন না। এই কাগজটি দস্তখত করিয়া দিতেছি। আপনি যে যে মঠ লইতে চান তাহার

তালিকা ইহাতে লিখিয়া রাখুন।” ইহা বলিয়া শ্রীল আচার্যদেব তাঁহার দস্তখত করা একটি সাদা কাগজ তাঁহার হাতে বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া তিনি স্তব্ধীভূত হইয়া গেলেন এবং চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইতে গড়াইতে শ্রীল আচার্যদেবকে আনন্দে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তারপর তিনি যেসব মঠ লইতে চান, তাহার তালিকা উক্ত দস্তখত করা কাগজে লিখিয়া রাখিলেন।

এই সমস্ত ঘটনার পর শ্রীল আচার্যদেব বাগবাজার মঠে ফিরিয়া আসিয়া গভর্ণিংবডির একটি সভা ডাকাইয়া সকলকে এই কথা জানাইয়া দিলেন। ইহাতে অনেকেই খুব ক্ষুব্ধ হইলেন। যাহাই হউক, যখন হাত কাটিয়া লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে তখন ত আর কিছু উপায় ছিল না। বহু প্রতিবাদের পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকলে তাঁহার এই সিদ্ধান্তকে আপাততঃ গ্রহণ করিলেন। কিছুদিনের পর মঠসকল হস্তান্তর করা হইল। মঠ হস্তান্তরের সময় শ্রীল আচার্যদেবের অনুগত মঠবাসিগণ শ্রীবিগ্রহের মূল্যবান্ বস্ত্র ও অলঙ্কার ইত্যাদি লইয়া আসিয়াছিলেন। একথা জানা মাত্রই শ্রীল আচার্যদেব খুব ব্যথিত হইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যে যে শ্রীবিগ্রহের যে যে জিনিষ আনা হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য কিছু কিছু অর্থ দিতে নির্দেশ দিলেন।

এইসব আচরণের দ্বারা শ্রীল আচার্যদেব যে সত্য সত্য তাঁহার অনুগত সকলকে অকপট হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয় না কী ? যে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার জন্য জগৎ পাগল, তিনি যে এইসকলকে অতি নির্মমভাবে পদাঘাত করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার এইসব আচরণ হইতে স্পষ্ট জানা যায়।

বাহ্যাড়ম্বরশূন্য অকপট হরিভজন

শ্রীল আচার্যদেব চিরদিনই অন্তর্নিষ্ঠাসম্পন্ন হরিভজনে ব্রতী ছিলেন। তিনি কখনও বাহ্য আড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই জগৎ ঐশ্বর্যপ্রধান স্থান। এখানে সকলেই বাহ্য আড়ম্বরের পক্ষপাতী। ভক্তিযাজনেও সেইরূপ অন্তর্নিষ্ঠাহীন কেবল কতকগুলি অনুষ্ঠান হইয়া গেলে লোকে তাহাকেই ভক্তি ভাবিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। শ্রীল আচার্যদেবের আচরণে কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইত। তিনি কখনও বাহ্য অনুষ্ঠানকে পছন্দ করিতেন না। যে ভক্ত্যনুষ্ঠানে ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধিৎসা নাই, তিনি তাহাকে কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সমান বলিতেন। কারণ,

ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধিৎসাশূন্য ভক্তির আড়ম্বরদ্বারা কেবল ক্ষয়িষ্ণু পুণ্যফললাভই সার হয়, ইহাই শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্ত। "নামগ্রহণাদীন্যপি যদি কর্মাদৌ তৎসাদ্গুণ্যাদ্যর্থং প্রযুজ্যন্তে, তদা তস্য ধর্মস্য পরত্বং নাস্তি, তুচ্ছফলার্থং প্রযুক্তত্বেন তদপরাধাদিত্যর্থঃ, তথৈব ক্ষয়িষ্ণুফলদাতৃত্বঞ্চ ভবতীতি ভাবঃ।" ক্রমসন্দর্ভ (শ্রীভা: ৬।৩।২২) শ্লোকের টীকা। অর্থাৎ নামগ্রহণাদি যদি নিজের কোন কাম্য-কর্মের নশ্বর ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে করা যায়, তবে তাহা পরধর্ম হয় না। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠারূপ তুচ্ছ ফললাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহা নামাপরাধবিশেষ। সুতরাং ক্ষয়িষ্ণু পুণ্যফললাভেই এই নামগ্রহণাদিরূপ ভক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সিদ্ধান্তে সর্বদা দৃঢ় থাকিয়া শ্রীল আচার্যদেব কখনও ইষ্টস্মৃতিশূন্য ভক্তির আড়ম্বরকে পছন্দ করিতেন না।

তিনি যেকোন স্থানে যান, কখনই কাহাকেও জানাইতেন না। এমন কি তিনি যাহাকে সঙ্গে লইতেন, সেও তাঁহার গন্তব্য-স্থল জানিত না। ষ্টেশনে পৌঁছানোর পর তিনি যে স্থানে যাইতে ইচ্ছুক, সেখানকার টিকিট কাটিতে বলিতেন। টিকিটটি আবার তৃতীয় শ্রেণী ব্যতীত অন্য কোন উপর শ্রেণীর হইত না। তিনি তাঁহার প্রকটকালের মধ্যে তৃতীয়শ্রেণী ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীতে রেলযাত্রা করেন নাই। তিনি যখন এতবড় সম্প্রদায়ের আচার্য, তখন তাঁহার কোন সম্মাননীয় শ্রেণীতে রেলযাত্রা করা উচিত—এইরূপ অহমিকার বহু ঊর্দ্ধে তিনি ছিলেন। অপরন্তু তিনি কোথায় যাইতেছেন পূর্ব হইতে জানাইলে পাছে কেহ ফুলের মালা ইত্যাদি দিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইতে ষ্টেশনে আসে, তজ্জন্য তিনি তাঁহার গন্তব্য-স্থল কাহাকেও জানাইতেন না।

মঠমন্দির করা, বহু শিষ্য করা এবং উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার অভিলাষ তাঁহাকে স্পর্শই করে নাই। বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব প্রার্থী হইয়া বহুদিন এমন কি ৮।১০ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেও তাহাদের নিষ্কপটতা না থাকিলে তিনি তাঁহাদিগকে শিষ্য করিতেন না। এইরূপ আদর্শ যে এযুগে বিরল, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এইসমস্ত আচরণ তাঁহার বাহ্যাড়ম্বরশূন্য অন্তর্নিষ্ঠাযুক্ত ভজনপিপাসার পরিচয় দেয় না কী ? তাঁহার এই শিক্ষায় যে অনুপ্রাণিত হইতে পারিবে, সে নিশ্চিতরূপে শুদ্ধভক্তিলাভের অধিকারী হইতে পারিবে।

গৃহস্থলীলা

অপক্ক অবস্থায় গৃহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী কিম্বা সন্ন্যাসী সাজিয়া গোপনে ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করা অপেক্ষা রজস্তমোগুণাক্রান্ত প্রবৃত্তিমাগীর পক্ষে গৃহস্থ

হইয়া ক্রমপন্থায় চলা যে শ্রেয়স্কর ইহা বুঝাইয়া তিনি সকলকে গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু মিশনের এত সুখসুবিধা ছাড়িয়া কেহ গৃহস্থ হইতে রাজী হইলেন না; অধিকন্তু তিনি মিশন ভাঙ্গিতে চান বলিয়া দোষারোপ করিলেন। ইহাতে তিনি মিশনের প্রতি অত্যন্ত বীতস্পৃহ হইয়া মিশন হইতে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন এবং ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে স্বধামগত অতুল চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পরমা ভক্তিমতী কন্যা শ্রীমতী প্রণতি দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহস্থলীলা করিলেন। তাঁহার এই লীলাদ্বারা তিনি জগৎকে দেখাইয়া দিলেন যে, অনধিকারী ত্যাগী-জীবন অপেক্ষা ক্রমপন্থানুসরণকারী গৃহস্থ-জীবনই কর্মাধিকারীর পক্ষে অধিক মঙ্গলপ্রদ। প্রকৃতপক্ষে তিনি গৃহী বা ত্যাগী ছিলেন না। তিনি ছিলেন হ্লাদিনী শক্তির দূত—মহৎ ও তাঁহার হৃদয় সর্বদা ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানে আবিষ্ট ছিল। তাঁহার এই অতিমর্ত্য গৃহস্থলীলার দ্বারা তিনি জগৎকে দেখাইয়া দিলেন যে, ভক্তি দেশাতীত ও বেশাতীত।

গৃহস্থ হইবার পরে সদ্‌গৃহস্থের যেসব ভক্ত্যনুকূল আচরণ তাহা তিনি নিজে করিয়া জগতকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি কথার পক্ষপাতী ছিলেন না—কার্যেরই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন তাহা আচরণে পরিণত করিতেন। লোকবঞ্চনার উদ্দেশ্যে বাহিরে গৃহস্থবেশে থাকিলেও অন্তরে তিনি ছিলেন শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাবিষ্টমনা পরমহংসশিরোমণি। তাঁহার হৃদয় সর্বদা ইষ্টদেবের সুখচিন্তায় কিরূপ আবিষ্ট ছিল, যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অবিদিত নাই।

অবশ্য তাঁহার এই গৃহস্থলীলা দেখিয়া তাঁহার শিষ্যাভিমানী কেহ কেহ তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল। তাহাদের মতে গুরুদেব যখন বিবাহ করিলেন, তখন তিনি নিশ্চয় পতিত হইয়া গেলেন। এই ভ্রান্ত বিচারের বশবর্তী হইয়া তাহারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া অন্য গুরু বরণ করিল। অবশ্য এইরূপ করিবার দ্বারা তাহারা যে আধ্যক্ষিক বিচারের বশবর্তী হইয়া হ্লাদিনীশক্তির দূতকে চিনিতে গিয়াছে, ইহা প্রমাণিত হইয়া গেল, কিন্তু গুরুতত্ত্ব অপ্রাকৃত। তাহা জীবের প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা মাপা সম্ভব নহে। একমাত্র শ্রীভগবানের কৃপা হইলেই শরণাগত ব্যক্তি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে। যে সদ্‌গুরুলাভের জন্য সত্য সত্য চোখের জলে বুক ভাসাইয়া শ্রীভগবানের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইয়াছে, পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ অবশ্যই তাহাকে তাহার অভীষ্ট মহতের সন্ধান দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। যাহারা শ্রীল আচার্যদেবের গৃহস্থলীলা দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন, নিজের বুকে নিজে হাত দিয়া

নিষ্কপটভাবে চিন্তা করিলে তাহারা শ্রীকৃষ্ণভক্তিলাভ উদ্দেশ্যে গুরুবরণের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন কি অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে ইহাতে আগ্রহী হইয়াছিলেন, তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এবিষয়ে অন্য কাহারও পরামর্শের আবশ্যকতা নাই। পরমার্থরাজ্যে প্রতারণা নাই। যে সরল অন্তঃকরণে সদ্‌গুরুলাভের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করিতেছে, তাহাকে কি শ্রীভগবান্ কখনও অসদ্‌গুরুর নিকট পাঠাইয়া বঞ্চনা করিবেন ? না, কদাপি নহে। পরমার্থরাজ্যে ঐপ্রকার অন্যায় কখনও হইতে পারে না।

শ্রীল আচার্যদেব গৃহস্থলীলা করিয়া কিছুদিন এলাহাবাদে অবস্থান করিয়াছিলেন। অল্প কিছুদিন গৃহস্থলীলা করিবার পর তিনি শ্রীব্রজধামে অবস্থান করিয়া শ্রীগোস্বামিগ্রন্থসেবায় ও স্বভজনে রত রহিলেন।

তিনি গৃহস্থলীলা করিবার পূর্বে সকলকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন—"পরীক্ষা দিতে হইবে। এই পরীক্ষা কাগজকলমে নহে, হৃদয়ক্ষেত্রে।" তাঁহার এই উক্তির মর্ম তাঁর নিতান্ত অনুগত অল্প কয়েকজন ব্যতীত অন্য কেহই বুঝিতে পারিলেন না। এই পরীক্ষা কিরূপ তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন "তাঁহার অভিলষিত শিষ্যের স্বরূপ" প্রকরণে উহা বর্ণিত হইয়াছে। এই পরীক্ষায় যে মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান্ কয়েক জন উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন, তাহারা তাঁহার সহিত নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন।

মহতের বাহ্য আচরণদ্বারা তাঁহার ভগবন্নিষ্ঠা স্থিরীকৃত হইতে পারে না। মহাভাগবতের লক্ষণ বলিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে 'ভগবদাবেশে'র উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগ সম্প্রদায়ে এই ভগবদাবেশেরই প্রাধান্য। সুতরাং এই আবেশের গাঢ়ত্ব হইতেই ভাগবতত্বের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। উত্তমোত্তম মহাভাগবতগণ সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ-আবেশে মগ্ন। শ্রীল আচার্যদেবের সংস্পর্শে যাহারা আসিয়াছেন, তাহারা অবশ্যই অনুভব করিয়াছেন তিনি কিরূপে অনুক্ষণ অপ্রাকৃত বিরহ-জনিত ভাবাবেশে আবিষ্ট থাকিতেন। এইরূপ ভাবাবিষ্ট ব্যক্তির গৃহস্থাশ্রম কি ভজনে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে? সুতরাং তাঁহার এই গৃহস্থাশ্রম-স্বীকার লোকবঞ্চনামাত্র।

শ্রীগুরুদেবকে চিনিবে কিরূপে ?

শ্রীগুরুদেব শ্রীহ্লাদিনীশক্তির দূত। সুতরাং তাঁহার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ শ্রীহ্লাদিনী-শক্তির দ্বারাই পরিচালিত। জীবোদ্ধার উদ্দেশ্যে তিনি এই প্রাকৃত জগতে অবস্থান করিলেও জলে পদ্মপত্রের ন্যায় প্রাকৃতভাবস্পর্শের বহু ঊর্দ্ধে তাঁহার

অবস্থিতি। এই প্রাকৃত জগতে অবস্থানহেতু অনেকেই প্রাকৃত বুদ্ধিদ্বারা তাঁহার জাতি, কুল ও আচরণাদি দেখিয়া তাঁহাকে মাপিতে চেষ্টা করে। কেবল ভক্তিসাধক কেন, প্রত্যেক জীবেরই অধঃপতনের ইহা একটি মুখ্য কারণ। শ্রীগুরুদেবের বা মহৎব্যক্তির আচরণে আপাততঃ দোষ দেখা যাইতে পারে। কিন্তু সর্বদা স্বীয়-ইষ্টদেবের সেবাচিন্তায় আবিষ্ট থাকায় এই আপাতদোষরূপ আচরণে তাঁহাদের অভিনিবেশ থাকে না বা থাকা সম্ভবও নহে; যেহেতু অনুক্ষণ তাঁহাদের অভিনিবেশ শ্রীকৃষ্ণের দিকেই থাকে। এইরূপ অবস্থায়ও কি তাঁহাদের দুরাচার দেখা যায়? হাঁ, কদাচিৎ তদ্রূপ দেখা যাইতে পারে। এপ্রসঙ্গে শ্রীরূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ও শ্রীউপদেশামৃতে উল্লেখ করিয়াছেন—

"জনে চেজ্জাতভাবেঽপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্যতে।
কার্যা তথাপি নাসূয়া কৃতার্থঃ সর্বথৈব সঃ॥

যথা নারসিংহে—

ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমির-পরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ॥" ইতি
(শ্রীভ: র: সি: ১।৩।৫৯-৬০)

"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদ-ফেন-পঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ॥"
(শ্রীউপদেশামৃত ৬)

অর্থাৎ জাতভাব ব্যক্তিতে যদি বাহ্যতঃ দুরাচারতার ন্যায় কিছু দেখাও যায়, তথাপি তাঁহার প্রতি অসূয়া কর্তব্য নহে; যেহেতু (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভাব জাত হওয়ায়) তিনি সর্বতোভাবেই কৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রীনৃসিংহপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে পূর্ণচন্দ্র শশচিহ্নদ্বারা কলঙ্কিত হইলেও যেরূপ কখনও অন্ধকারের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীহরিতে যাঁহার চিত্ত একনিষ্ঠ, সেই মানব বাহ্যতঃ মালিন্যযুক্তবৎ (দুরাচারপরায়ণরূপে) দৃষ্ট হইলেও অন্তর্বিরাজমান ভক্তিবলে অন্যান্য লোকগণকে পরাভব করিয়াই শোভা বিস্তার করেন।

জলের বিকার—বুদ্বুদ, ফেন ও পঙ্কের বিদ্যমানতা হেতু যেরূপ গঙ্গাজলের ব্রহ্মদ্রবত্ব (দ্রবীভূত ব্রহ্মভাব) কদাপি লোপ পায় না, তদ্রূপ এই জগতে অবস্থিত শুদ্ধভক্তের স্বভাবে ও দেহে আপাতদৃষ্ট দোষসমূহ দর্শন করিয়া তাঁহাতে মর্ত্যবুদ্ধি করা অনুচিত।

এসম্পর্কে শ্রীজীবপাদও উল্লেখ করিয়াছেন—"বৈষ্ণবপূজকৈস্তু বৈষ্ণবানামাচারোঽপি ন বিচারণীয়ঃ।" (শ্রীভ: স: ২৪৭ অনু:)

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের পূজক বা অনুসরণকারীর পক্ষে তাঁহাদের আচরণ বিষয়ে কোনরূপ বিচার করা অনুচিত।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর এইসব উক্তি হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, শ্রীহ্লাদিনীশক্তির ইচ্ছায় চালিত মহতের বাহ্য আচরণে আপাতদোষ দেখা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ইহা কর্মফলবাধ্য জীবের প্রারব্ধ কর্মফলভোগের অনুরূপ নহে। শ্রীহ্লাদিনীশক্তিই তাঁহার নিজজনগণকে কোন কোন সময়ে শ্রীভরত মহারাজের মৃগশিশুর প্রতি আসক্তিরূপ আপাতদোষপ্রতিম কার্যে প্রবৃত্ত করান। এইরূপ আচরণের দ্বারা তাঁহাদের কোনও ক্ষতি ত' হয়ই না, বরং আর্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং এই আর্তি আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্ধকই হয়। সুতরাং শ্রীহ্লাদিনীশক্তির ইচ্ছায় চালিত মহদ্‌গণের আপাতদোষপ্রতিম আচরণও শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্ধক। যাহা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্ধক তাহা কি কখনও ভক্তি-বিঘাতক হইতে পারে! অতএব মহদ্‌গণের উপর্যুক্ত অন্যথাচরণও ভক্তিপোষক। যে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি মহতের এতাদৃশ আচরণে দোষ দর্শন করে সে অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হয়।

এ ত' গেল জাতভাব বা জাতরতি মহতের কথা। অজাতরতি রজস্তমোগুণাক্রান্ত ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণকারী ব্যক্তি বিষয়দ্বারা আকৃষ্ট হইলেও তাহার দোষদর্শন কর্তব্য নহে বলিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥" (শ্রীভা: ১১।১৪। ১৮) অর্থাৎ হে উদ্ধব! আমার অজিতেন্দ্রিয় ভক্ত বিষয়দ্বারা আকৃষ্ট হইলেও ভক্তিসামর্থ্যহেতু প্রায়শঃ তাহাতে অভিভূত হয় না। এইরূপ অজিতেন্দ্রিয় রজস্তমোগুণাক্রান্ত প্রাকৃত ভক্ত বিষয়দ্বারা আকৃষ্ট হইলেও কোন্ গুণের জন্য তাহাতে অভিভূত হয় না? সে ত' কর্মাধিকারী, তাহার ভক্তিসামর্থ্যই বা আসিল কোথা হইতে? ইহার উত্তরে শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩১২তম অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—"ভক্তির প্রতি যাহার রুচি আছে, ধর্মশাস্ত্রোক্ত নিষিদ্ধাচরণে তাহার ঘৃণা আসে। কারণ মুক্তিরূপ আনন্দেও যে ভক্তিকামীর বাঞ্ছা নাই, পরমঘৃণ্য বিকর্মজনিত আনন্দে তাহার রুচিই বা হইবে কিরূপে? সুতরাং এইরূপ রুচিমান্ ভক্তের বিকর্মপ্রতি স্বাভাবিক রুচি থাকে না। যদি প্রমাদাদিবশতঃ কখনও এইরূপ বিকর্ম ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে হৃদয়স্থিত শ্রীহরি তত্‌ক্ষণাৎই উহা বিনাশ করিয়া দেন। অর্থাৎ উক্ত কর্মের ফল তাহাকে ভোগ করিতে হয় না। বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ। সুতরাং যে কার্যে শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ হয় তাহাতেই রুচিমান্ ভক্ত প্রবৃত্ত হয় ও যাহাতে

তাঁহার অসন্তোষ হয়, তাহাতে সে প্রবৃত্ত হয় না। কারণ, শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষই প্রীতির একমাত্র জীবন।" শ্রীজীবপাদের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষচিন্তাই ভক্তির প্রাণ। ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণকারীর যাবতীয় অনুষ্ঠান শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষকে কেন্দ্র করিয়াই হইয়া থাকে। এই শ্রীবিষ্ণুর সুখানুসন্ধানাবেশই তাহার **'ভক্তিসামর্থ্য'**। শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ হইবে না বলিয়া বিকর্মের প্রতি তাহার স্বাভাবিক রুচি থাকে না। দৈবাৎ সে তাহাতে লিপ্ত হইয়া গেলেও শ্রীবিষ্ণুই তাহাকে উদ্ধার করেন। কিন্তু এইরূপ বিকর্মকারীর দোষ যে দেখে সে অবশ্যই অধঃপতিত হইবে। অতএব কি জাতরতি কি অজাতরতি কাহারও দোষদর্শন শাস্ত্রানুমোদিত নহে। সুতরাং তাহা সর্বথা বর্জনীয়।

শ্রীগুরুদেব শ্রীহ্লাদিনীশক্তির দূত অর্থাৎ তিনি শ্রীহ্লাদিনীশক্তিই। সুতরাং জীবশক্তি হইতে সৃষ্ট বিভিন্নাংশ জীবের ন্যায় তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকিতে পারে না। তাঁহার ইচ্ছা শ্রীহ্লাদিনীশক্তিরই ইচ্ছা অর্থাৎ তাঁহার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির আগার। অতএব তাঁহাতে দোষারোপ করিয়া ভক্তিলাভের চেষ্টা বাতুলতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে ?

যে মহতের কৃপা জীবের কৃষ্ণভক্তিলাভের মূল কারণ, সেই মহতকে নিজের প্রাকৃত বুদ্ধিদ্বারা মাপিতে যাওয়া মূর্খতা নহে কী ? জোনাকি পোকা কি কখনও তার ক্ষীণ আলোকের সাহায্যে সূর্যকে দেখিতে পারিবে ? সূর্য স্বপ্রকাশ। তাহার আলোকেই তাহাকে দেখিতে হইবে। সেইরূপ মহৎ স্বপ্রকাশ। তাঁহার কৃপায়ই তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি হইতে পারে। তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর না করিয়া যে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে বিচার করিয়া তাঁহাকে মাপিতে চেষ্টা করে সে কখনও ভক্তিপথের পথিক হইতে পারিবে না। এ প্রসঙ্গে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নিম্ন উক্তি আলোচ্য—

"অধিকারি-বৈষ্ণবের না বুঝি ব্যভার।
যে-জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার॥
অধমজনেরো যে-আচার যেন ধর্ম।
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম॥
কৃষ্ণ-কৃপায় সে ইহা জানিবারে পারে।
এসব সংকটে কেহো মরে, কেহো তরে॥
সভে ইথে দেখি এক মহা-প্রতিকার।
সভারে করিব স্তুতি-বিনয়-ব্যবহার॥

অজ্ঞ হঞা লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহান্ত-বচন ॥
তবে কৃষ্ণ তা'রে দেন হেন দিব্যমতি।
সর্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয় কতি ॥"

(শ্রীচৈ: ভা: অন্ত্য ১০।৩৮৮-৯৩)

অর্থাৎ উচ্চ অধিকারী বৈষ্ণবের বাহ্য আচরণ বুঝিতে না পারিয়া যে তাঁহার দোষ দর্শন করে তাহার নিস্তার নাই। নিতান্ত অধম লোকে যাহা করে একজন উচ্চ অধিকারী বৈষ্ণবেরও তদ্রূপ আচরণ দেখা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত ইহা ঠিক কি ভুল জানা অসম্ভব। যে তাঁহার কৃপায় ইহা জানিতে পারে সে ভাগ্যবান্। আর যে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া জানিতে চেষ্টা করে, সে অপরাধী হইয়া অধঃপতিত হয়। সুতরাং এ ধর্মসংকটে নিজেকে নিতান্ত অজ্ঞ জ্ঞান করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয় এবং খুব সতর্কতার সহিত সাধুর বাক্য শ্রবণ করে, সে অবশ্যই অপরাধের হাত হইতে রক্ষা পায়। বৈষ্ণবের কথা দূরে থাকুক সাধারণ লোকেরও দোষ না দেখিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥" (শ্রীভা: ১১।২৮।১)

অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষদ্বারা সৃষ্ট এই নিখিল বিশ্বকে একাত্মক (এক অন্তর্যামিপুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) জানিয়া পরের স্বভাব ও কর্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না।

ভক্তি শ্রীহ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি। জীব শ্রীভগবানের জীবশক্তি হইতে সৃষ্ট হওয়ায় তা'র হৃদয়ে শ্রীহ্লাদিনীশক্তির অবস্থান নাই। সুতরাং তা'র হৃদয়ে শ্রীহ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিভূতা ভক্তিবাসনা (শ্রীকৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাবাসনা) জাগ্রত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং তাহার ভক্ত্যনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রশ্নই নাই। অনাদি ভগবদ্‌বিমুখ জীব প্রাকৃত রজস্তমোগুণদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া স্বসুখচিন্তায় সতত মগ্ন। প্রাকৃত রজস্তমোগুণাবিষ্ট মনে ভক্তির প্রতি যে শ্রদ্ধা জাত হয়, তাহা স্বসুখবাসনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। ভক্তির প্রাণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানবাসনার লেশমাত্রও তাহাতে থাকে না। তজ্জন্য সেই তথাকথিত ভক্তি নির্গুণা হওয়ার পরিবর্তে সগুণাই হইয়া থাকে। সগুণা ভক্তি কর্মমিশ্রা ও সকামা। এই ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতারূপ ফল প্রসব করিবার পরিবর্তে পুণ্যরূপ ক্ষয়িষ্ণু ফলই প্রসব করিয়া সাধকের বন্ধনকে দৃঢ়তর করিয়া থাকে।

অবশ্য ইহার দ্বারা ভক্তির শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ ফলদানের অসামর্থ্য সূচিত হইতেছে না; যেহেতু 'ফল' কেবল সাধন হইতে পাওয়া যায় না। সাধকের বাসনানুযায়ীই ফললাভ হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকে শিক্ষা দেওয়ার সময়ে এই বাসনার প্রাধান্য বিষয়েই বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
* * * * *
সুখে প্রেম-ফলরস করে আস্বাদন॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ১৯।১৩৩-১৪৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপরোক্ত উপদেশে ভক্তির অনুষ্ঠান অপেক্ষা বাসনার কিরূপ প্রাধান্য রহিয়াছে তাহা নিম্ন বিশ্লেষণ হইতে জানা যাইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উল্লিখিত "ভক্তিলতাবীজ" যে শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদন-বাসনা—ইহা এই গ্রন্থের ৩৬শ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। উপরোক্ত পয়ারে যে 'উপশাখা'র উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি-লাভের বাসনা। এই ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি-লাভের বাসনা বা অন্যাভিলাষ হৃদয় হইতে দূর করিলেই মূল শাখা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসুখবাসনারূপ ভক্তিলতা শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রবণ-কীর্তনরূপ অনুষ্ঠানকে জলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বীজহীন ক্ষেত্রে জলসেচন করিলে যেরূপ উদ্দিষ্ট বৃক্ষ বা লতা জাত না হইয়া অবাঞ্ছিত তৃণগুল্মাদি জন্মে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধিৎসারূপ বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে বপন না করিয়া শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ জল সেচন করিলে ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা ও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-কামনাদি রূপ তৃণগুল্ম (অর্থাৎ অন্যাভিলাষ) পুষ্ট হইয়া সাধককে ভক্তি সাধনের মুখ্য ফললাভে বঞ্চিত করিবে। বাসনা(ভক্তিবাসনা)ই ভক্ত্যনুষ্ঠান হইতে প্রেম জাত করায় এবং এই বাসনা (অন্যাভিলাষ)ই ভক্ত্যনুষ্ঠানকারীকে বিপথগামী করাইয়া তাহার সর্বনাশ সাধন করে। আবার অনেক সময় ভক্তির অনুষ্ঠান সত্ত্বেও বৈষ্ণবাপরাধরূপ দুর্বাসনা হেতু সাধক নরকগামী হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রবণাদি ভক্ত্যনুষ্ঠান হইতে সর্বদা ভক্তিবাসনারই প্রাধান্য। তজ্জন্য শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুর হৃদয়ে ইষ্টদেবের সুখবাসনা পোষণপূর্বক যাবতীয় অনুষ্ঠান করিতে সর্বদা উপদেশ দিতেন। ইহা তাঁহার আচার্যত্বের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য।

"উপজিয়া বাঢ়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়। বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥ তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন। কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"—এই কয়েকটি পয়ারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা যে রজস্তমোগুণাবিষ্ট

কর্মাধিকারী জীবগণের প্রতিই উদ্দিষ্ট, ইহা সুস্পষ্ট। রজস্তমোগুণাক্রান্ত কর্মাধিকারী জীবের স্থিতি এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে। শ্রীগুরুকৃপায় ভক্তিলতাবীজ (শ্রীকৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানবাসনা) লাভ করিয়া শ্রীহরিনাম-কীর্তনাদি ভক্ত্যনুষ্ঠানরূপ ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ করিলে হৃদয় হইতে রজস্তমোগুণোত্থ স্বসুখবাসনা (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনা)রূপ উপশাখা দূর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সুখ ত' দূরের কথা ব্রহ্মলোকের সাযুজ্যমুক্তিসুখে (ব্রহ্মানন্দে) এমন কি বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যমিশ্রিত প্রেমানন্দেও তাহার বাসনা আবদ্ধ না রহিয়া গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্যময় সেবারসে নিমগ্ন হইবার জন্য ছুটিয়া যায়। ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে শ্রবণকীর্তনাদি জলসেচনদ্বারা কর্মাধিকারী সাধকের শ্রীগুরুকৃপালব্ধ ভক্তিবাসনা ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে পরিণত হয়। যেখানে শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানবাসনার পরিবর্তে নিজস্বার্থসিদ্ধিবাসনা ভক্তির প্রবর্তক হয়, সেখানে উক্ত বাসনার অনুরূপই ফললাভ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা বাহ্যতঃ ভক্তিবৎ প্রতিভাত হইলেও স্বরূপতঃ ভক্তি নহে—কপটতাবিশেষ। অজ্ঞ লোকে ইহা বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ কপট ভক্তিকেই শুদ্ধভক্তি বিচার করিয়া বিভ্রান্ত হয়।

জীব নিজচেষ্টায় ভক্তি করিলে তাহা সর্বদা এইরূপ স্বসুখাত্মক কপট ভক্তিই হইয়া থাকে। কারণ শুদ্ধভক্তি কখনও জীবের আয়াসসাধ্য নহে। হ্লাদিনীশক্তির দূত মহতের অহৈতুকী কৃপাই ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ। সেই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দিয়াছেন—"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৪৮)। মহৎসঙ্গ ও তাঁহার কৃপা ব্যতীত কখনই ভক্তি লাভ হইবে না। হইবে বা কিরূপে? ভক্তিবাসনার চাবিকাঠি ত' মহতের কাছে। তাঁহার কৃপা হইলেই ভক্তিবাসনা লাভ হইবে। মহৎকৃপালাভের কোন নির্দিষ্ট কারণ নাই। তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছাই ইহার একমাত্র কারণ। তিনি সাধকের যোগ্যতা দেখিয়া কৃপা করেন না। বরং অযোগ্যের প্রতিই তাঁহার কৃপা অধিক হইয়া থাকে; যেমন শ্রীনলকূবর ও মণিগ্রীবের প্রতি শ্রীনারদের কৃপা, জগাইমাধাইর প্রতি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ও বেশ্যার প্রতি শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপা। ইঁহারা কেহ কোনও সাধন করেন নাই, কেবল মহৎকৃপা হইতেই ভক্তিলাভ করিয়াছেন। অবশ্য এইরূপ কৃপা বিরল। কর্মাধিকারী জীব ভক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে তাহাকে মহৎকৃপার অভিলাষী হইতেই হইবে। মহৎ সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানে আবিষ্ট। ভক্তিলাভবিষয়ে নিজের অযোগ্যতা তীব্রভাবে অনুভূত

হইলেই চক্ষু হইতে যে অকপট অশ্রুর উদ্‌গম হয়, তাহাই মহতের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পরম সহায়ক হইয়া থাকে। যেখানে দৈন্যাধিক্য সেইখানেই কৃপা অধিক উচ্ছলিতা বলিয়া শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৮০তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। রজস্তমোগুণাক্রান্ত হৃদয়ে এই দৈন্য জাত হওয়া অসম্ভব। ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে সর্বভূতাদরপূর্বক কর্মার্পণ করিলেই হৃদয় হইতে ক্রমশঃ রজস্তমোগুণ দূর হয়। হৃদয় রজস্তমোগুণমুক্ত হইলেই যে তাহাতে দৈন্যের উদ্রেক অবশ্যম্ভাবী তাহাও নহে। যেস্থানে মহৎকৃপালাভ কর্মার্পণের উদ্দেশ্য, কেবল সেই স্থানেই রজস্তমোগুণমুক্ত হৃদয়ে দৈন্যের উদ্রেক হয়। এই দৈন্যই ভক্তিসাধকের পরম সম্পদ, যেহেতু ইহা মহৎকৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সাধককে প্রেমলাভের যোগ্য করায়।

মহৎকৃপা বা গুরুকৃপা ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ হওয়ায় ভাগ্যবশতঃ শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহার প্রতি কিরূপে নিজের দেবতা (নিয়ামক) ও আত্মা (প্রিয়তম) জ্ঞান হইবে, সেই উদ্দেশ্যে সর্বদা ব্যাকুল হইয়া মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে সক্রন্দন প্রার্থনা জানাইতে হইবে। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়মতি অবশ্যম্ভাবী। শ্রীভগবান্ অসন্তুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব রক্ষা করেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের চরণে অপরাধ হইলে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তজ্জন্য সর্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবকেই সন্তুষ্ট করিবার প্রচেষ্টা ভক্তিকামীর একমাত্র সাধন। ভক্তিকামীর শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠানও কেবল শ্রীগুরুদেবের কৃপালাভের উদ্দেশ্যেই হওয়া আবশ্যক। সুতরাং যেরূপ আচরণ করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছেন তৎপ্রতি অনুক্ষণ ধ্যান দেওয়া উচিত। ইহাই শুদ্ধভক্তিলাভের একমাত্র পন্থা। এতদ্ব্যতীত নিজের পাণ্ডিত্যাদির অভিমান লইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলে ভক্তির পরিবর্তে দম্ভ বৃদ্ধি হইয়া সাধককে ভক্তিপথচ্যুত করিয়া দিবে। সাধকের দৈহিক ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তিসাধন পর্যন্ত যাবতীয় কার্যের সঙ্গে শ্রীগুরুদেবের স্মৃতি অনুক্ষণ জড়িত থাকা একান্ত কাম্য।

শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের চরিত্র আলোচনা করিলে জানা যায় যে, তাঁহাতে আচার্যোচিত অশেষ গুণ বিদ্যমান ছিল। আবার তাঁহার কয়েকটি আচরণ দুর্বোধ্যও ছিল। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপার আশ্রয় না লইয়া যাহারা নিজবুদ্ধি খাটাইয়া তাঁহাকে মাপিতে গেলেন তাহারা তাঁহার আচরণের সঙ্গতি করিতে না পারিয়া তাঁহার সমালোচনা করিলেন। পরিণামে তাঁহার নিন্দুক হইয়া নিজের সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন। পরন্তু যাঁহারা নিজেকে নিতান্ত অজ্ঞ

মনে করিয়া তাঁহার যথাযথ স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা প্রার্থনা করিলেন, তাঁহারাই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে পড়িয়া রহিলেন।

তাঁহার কয়েকটি দুর্বোধ্য আচরণ ও উপদেশ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি সকলের অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। অধিকার মুখ্যতঃ তিন প্রকার; যথা—কর্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার ও ভক্ত্যধিকার। শাস্ত্রে ভক্তি সম্বন্ধে যেসমস্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা মুখ্যতঃ ভক্ত্যধিকারীর জন্যই উদ্দিষ্ট; কর্মাধিকারী বা জ্ঞানাধিকারীর জন্য নহে। হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তি কর্মাধিকারী জীবের চেষ্টাসাধ্য নহে। ইহা একমাত্র মহৎকৃপাসাপেক্ষ। কর্মাধিকারে থাকিয়া যে ভক্তি করা যায়, তাহা অহংকারমিশ্রিত হওয়ায় কর্মমিশ্রা ভক্তিতে পরিণত হয়। ইহা স্বরূপতঃ কর্মই। কেবল বাহ্যতঃ শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তির আকার থাকায় ইহাকে ভক্তি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে মাত্র। হ্লাদিনীশক্তি-প্রেরিতা না হইয়া নিজসুখবাঞ্ছা-প্রেরিতা হওয়ায় ইহা সগুণা ও সকামা কর্মমিশ্রা ভক্তিতেই পরিণত হয়। ইহার ফল পুণ্যকর্মের ফলের সঙ্গে সমান। শ্রীল জীবপাদও এইরূপ ভক্তিকে স্বরূপতঃ কর্ম বলিয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২১৭তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের ৯২তম অনুচ্ছেদে 'এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ ··· ··· তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥' (শ্রীভা: ৬।৩।২২)র টীকায় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভক্তির প্রাণরূপ শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধিৎসা যেখানে এই নামকীর্তনরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের প্রেরক না হইয়া ধর্ম-অর্থ-কামলাভরূপ স্বসুখানুসন্ধান প্রেরক হইয়া থাকে, সেখানে ইহা ক্ষয়িষ্ণু পুণ্যকর্মের ফলই প্রসব করিয়া থাকে।

শ্রীজীবপাদের এই শিক্ষা অবলম্বনে শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর সর্বদা নিম্নমতে উপদেশ দিতেন—"শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিহীন শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যনুষ্ঠান পুণ্যকর্মের সঙ্গেই সমান। তুমি যে শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতেছ, হয়ত মনে করিতে পার যে তাহাতে তোমার রুচি হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমার হৃদয়ে কী আত্মধিক্কার বা যথার্থ দৈন্যের উদয় হইয়াছে অথবা তুমি যাহাকে আত্মধিক্কার বা দৈন্য মনে করিতেছ, সেইগুলি তোমার প্রচ্ছন্ন নিজ শান্তি বা সুখের সন্ধানী সৈন্য ? তুমি যে সময়-সময় অশ্রুমোচন কর, হয়ত' তাহা নির্জনেও করিতে পার, তাহা কী তোমার নিত্য প্রভুর সেবা বা সুখানুসন্ধানের প্রকৃত আর্তিজ্ঞাপক না নিজ পাপভারাক্রান্ত হৃদয়কে কিছুটা লাঘব করিবার মূলে যে আত্মসুখানুসন্ধিৎসা রহিয়াছে, উহারই অভিব্যক্তি বিশেষ ? তুমি হয়ত' নিজেকে

নামে রুচিবিশিষ্ট নামপরায়ণ মনে কর। অন্ততঃ নামের প্রতি তোমার বিতৃষ্ণা নাই, শ্রদ্ধাই আছে—এইরূপ মনে কর, নাম করিতে করিতে একটু শান্তিও পাও। সময়-সময় বেশ ভালও লাগে, হৃদয় যেন আরও নাম করিতে চায়, ইহাকেই কী তুমি 'নামে রুচি' মনে কর? 'নামে রুচি' কী শ্রীনামপ্রভুর সুখের জন্য, না তোমার সুখশান্তির জন্য? তুমি গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখ ত' শ্রীহরিনাম কীর্তনের প্রতি তোমার এই যে রুচি ইহা তোমার পাপভারাক্রান্ত হৃদয়কে লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে, না ইষ্টদেবকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে? যদি বাস্তবিক ইষ্টদেবের সুখবিধানে তোমার লক্ষ্য থাকিত তাহা হইলে এই নামকীর্তনের সময়ে তুমি অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার সেই সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিতে আবিষ্ট থাকিতে। বল ত' সত্যই এই আবেশ তোমার থাকে কী? শ্রীগুরুবর্গের নিকট পরীক্ষা দিতে গেলে তোমার সব কপটতা ধরা পড়ে। নিজের দেহগেহ-স্মৃতি, নিজের সুখভোগের স্মৃতি জাগরণকালে দূরে থাকুক, নিদ্রাকালেও তোমাকে পরিত্যাগ করে না, কিন্তু যত ভুলভ্রান্তি, অন্যমনস্কতা, অরুচি, অশ্রদ্ধা, শিথিলতা, প্রতিদান-গ্রহণ-পিপাসা, সবই যুগপৎ ভগবৎ সুখকর কার্যের কালেই উপস্থিত হয়। স্বাভাবিকভাবে দূরে থাকুক, লাঠি মারিয়া, তীব্র শাসন করিয়াও তোমাতে শ্রীহরিস্মৃতির উদয় করানো যায় না, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও দেহের কোনও সুখকর ক্রিয়ার প্রতি বিস্মৃতি দূরে থাকুক, অন্যমনস্কতাও তোমার দেখা যায় না। আহার নিদ্রার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলে কিম্বা মর্যাদার কোন লাঘব হইলে তাহাতে তোমার বিন্দুমাত্রও অন্যমনস্কতা বা স্মৃতির অভাব দেখা যায় কী? এইরূপ অবস্থায় তোমার যে কাল্পনিক 'নামে রুচি' তাহা কল্পনাবিলাস ব্যতীত আর কি হইতে পারে?"

বস্তুতঃ মহৎকৃপা ব্যতীত মাদৃশ কর্মাধিকারী স্বসুখকামী জীবের হৃদয়ে কদাপি ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধিৎসা জাগ্রত হওয়া সম্ভব নহে। তজ্জন্য তিনি তাঁহার হৃদয়ের অপ্রাকৃত অনুভূতিরূপ রঞ্জন-রশ্মি (x-ray) বিকীরণদ্বারা আমাদের কর্মাধিকারজনিত স্বার্থপরতাকে বাহ্যে প্রকাশপূর্বক আমাদিগকে শ্রীহরিনামে রুচিসম্পন্ন প্রেমিক ভক্ত না বলিয়া নিপট কর্মীই বলিলেন। একজন দক্ষ চিকিৎসক যদি কুষ্ঠ ব্যাধির মত একটি ঘৃণ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কোন ব্যক্তিকে তাহার রোগ চিনাইয়া উপযুক্ত চিকিৎসার পরামর্শ দেন, তবে তাঁহাকে দোষী বিচার করা উচিত কী? সেইরূপ শ্রীল আচার্য্যদেবের এই গূঢ় উপদেশের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া তিনি ভক্তিকে কর্ম বলিতেছেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে দোষারোপ করিয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের "ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ক্রিয়েত

ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥” (৭।৫।২৪) শ্লোক আলোচনা করিলে স্পষ্ট জানা যায় যে, তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ শাস্ত্রানুমোদিত। “শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যনুষ্ঠানদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর সুখ হইবে”—ঈদৃশ ভাবনাপ্রেরিতা ভক্তিই শুদ্ধভক্তি-পদবাচ্য। যেখানে ভক্তির প্রাণস্বরূপ এই শ্রীকৃষ্ণ-সুখচিন্তা নাই, সেখানে তাহা বিদ্বদ্‌বিচারে পুণ্যকর্মের সঙ্গে সমান।

(২) “ভক্তি জীবের চেষ্টাসাধ্য নহে—একমাত্র মহৎকৃপাসাপেক্ষ।” অতএব রজস্তমোগুণাক্রান্ত কর্মাধিকারী ব্যক্তির পক্ষে গৃহত্যাগপূর্বক বৈষ্ণবপ্রায় হইতে চেষ্টা না করিয়া গৃহস্থাশ্রম স্বীকারপূর্বক বিষয়িপ্রায় থাকিয়া, ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে সর্বভূতাদরপূর্বক কর্মার্পণ করাই তাহার অধিকারোচিত সাধন। তজ্জন্য অপক্ক অবস্থায় ত্যাগিবেশধারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ের আগ্নেয়গিরিগহ্বরসদৃশ দুর্দমনীয় ভোগস্পৃহার কথা তাহাদের আচরণ হইতে দর্শাইয়া কৃত্রিমপন্থী ত্যাগী না হইয়া ক্রমপন্থায় থাকিয়া গৃহস্থ হওয়ার জন্য তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন।

উক্ত উপদেশের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া তিনি গৌড়ীয় মিশনকে ভাঙ্গিতেছেন বলিয়া দোষারোপপূর্বক অনেকে তাঁহার ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করিল। কিন্তু ত্যাগ বা বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া ভক্তি করিতে হইবে—এইরূপ উপদেশ কোন শাস্ত্রেই নাই; বরং “কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥” (শ্রীগী: ৩।৬) শ্লোকে বলা হইয়াছে যে অন্তরে ভোগস্পৃহা থাকা সত্ত্বে ত্যাগিবেশধারী ব্যক্তি ‘মিথ্যাচারী বা কপটাচারী’ বলিয়া গণ্য হয়। এই কারণে শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের উপদেশ অধিকারোচিত এবং ক্রমোন্নতিরই সোপানসদৃশ।

(৩) অনবধানতাযুক্ত শ্রীহরিনামকীর্তনদ্বারা নামাপরাধ বৃদ্ধিকরা অপেক্ষা কায়িক শ্রমদ্বারা শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করা রজস্তমোগুণাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়া তিনি সব সময় বলিতেন। নিজেকে নামকীর্তনের অধিকারী মনে করিয়া অনেকে তাঁহার এই উপদেশ গ্রহণ করিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার উপদেশ যে অধিকারোচিত তাহা শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের ও শ্রীল জীবপাদের উপদেশ হইতে জানা যায়।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভে তাঁহার ভাবার্থদীপিকা-টীকায় লিখিয়াছেন—“সদ্ধর্মশুদ্ধসত্ত্বানামন্তরঙ্গেশসৎকথা।” অর্থাৎ সদ্ধর্মাচরণদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে ভগবৎ কথা অন্তরে প্রবেশ করে। ‘সদ্ধর্মাচরণ’ অর্থ শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষের উদ্দেশ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম পালন। এখানে

শ্রীস্বামিপাদ সৎকথা, (ভগবৎ-কথা) শ্রবণের পূর্বে সৎধর্মপালনের উপদেশ দিয়াছেন। এপ্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদও উল্লেখ করিয়াছেন—"তদেবং মহদাদিসেবা দর্শিতা। অস্যাশ্চ শ্রবণাদিতঃ পূর্বত্বম্ ॥" (শ্রীভ: স: ২৪৭ অনু:) অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে প্রথমেই মহতের পরিচর্যা আবশ্যক।

শ্রীল জীবপাদ ও শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের উপদেশ হইতে জানাযায় যে বর্ণাশ্রমধর্মে ব্যবস্থিত ভাগবতধর্মের প্রথম সোপানরূপ কর্মার্পণের সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতধর্মের পূর্বাঙ্গরূপা মহৎপরিচর্যাদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে মহতের প্রসঙ্গরূপা সেবার অর্থাৎ বাণীশ্রবণের যোগ্যতা লাভ হইবে। তজ্জন্য শ্রবণ-কীর্তনের পূর্বেই কায়িক সেবার উপদেশ এখানে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীল পুরীদাস গোস্মামী ঠাকুরও অনবধানতাযুক্ত শ্রীহরিনামগ্রহণ অপেক্ষা কায়দ্বারা মহৎসেবার উপাদেয়তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার এইসব উপদেশ যে শাস্ত্রানুমোদিত ও অধিকারোচিত ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

(৪) "অজাতরতি ব্যক্তি গৌড়ীয় গুরু হইবার যোগ্য নহে"—শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর কখনও অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে শিষ্য করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। মিশন রক্ষা করিতে হইলে শিষ্য করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া তাহাকে বাধ্য করা হইলে তিনি তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বে খুব কম ব্যক্তিকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা দৈন্য করিয়া বলিতেন—"অজাতরতি ব্যক্তি গৌড়ীয় গুরু হইবার যোগ্য নহে।" এইরূপ বলার যথেষ্ট কারণ আছে। গৌড়ীয় গুরুর ভূমিকা কি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিম্ন উক্তি হইতে তাহার সূচনা পাওয়া যায়।

"নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৯১)

শিষ্য নিজের অভীষ্ট (অর্থাৎ নিজে যে রসে উপাসনা করিতেছে সে রসের উপাস্য) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম জনগণের আনুগত্যে নিরন্তর অন্তর্মনা হইয়া (শ্রীগুরুপ্রদত্ত সিদ্ধ দেহে নিজের অবস্থিতি চিন্তা করিয়া) শ্রীকৃষ্ণের সেবাচিন্তায় নিরন্তর (অষ্টকাল) নিমগ্ন থাকে।

গৌড়ীয় গুরু বা রাগমার্গীয় গুরু শিষ্যকে যে সিদ্ধ দেহের দিগ্‌দর্শন দেন, শিষ্য সাধনকালে সেই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে শ্রীকৃষ্ণের সেবাচিন্তা করিয়া তাহাতেই অষ্টকাল তন্ময় থাকে এবং সিদ্ধিলাভের পর উক্ত দেহই প্রাপ্ত হয়।

ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে যে সিদ্ধদেহের দিগ্‌দর্শন দেন, তাহা তাঁহার কল্পনাপ্রসূত নহে—তাহা অপ্রাকৃত, বাস্তব। স্বরূপশক্তি তাঁহার হৃদয়ে উক্ত দেহসম্বন্ধে প্রেরণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ শিষ্যকেও তদনুরূপ প্রেরণা দিয়া থাকেন। শিষ্য তৎক্ষণাৎ শ্রীগুরুদেবের উপদেশ শিরোধার্য করিয়া তদনুযায়ী ভজনে প্রবৃত্ত হয়। ইহা হইতে জানা যায় যে জাতরতি ব্যক্তিই রাগমার্গীয় গুরু বা গৌড়ীয় গুরু হওয়ার যোগ্য। এইরূপ গুরু হইতে ভজনপ্রণালী শিক্ষাকারী শিষ্যও জাতরতি হওয়া আবশ্যক।

রাগমার্গীয় সাধন সম্পর্কে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এখানে উল্লেখযোগ্য—

'বাহ্য' 'অন্তর' ইহার দুই ত সাধন।
বাহ্য—সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্তন ॥
মনে—নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৮৯-৯০)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ হইতে বুঝাযায় যে, জিহ্বায় শ্রীহরিনামগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যকে শ্রীগুরুপ্রদত্ত সিদ্ধদেহে স্বীয় অবস্থিতি অনুক্ষণ চিন্তা করিয়া অষ্টপ্রহর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাচিন্তায় আবিষ্ট থাকিতে হইবে। হৃদয়ে রজস্তমোগুণ থাকা পর্যন্ত এইরূপ চিন্তা অসম্ভব। সুতরাং রজস্তমোগুণমুক্ত জাতরতি সাধকই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট রাগমার্গীয় ভক্তিসাধনের উপযুক্ত পাত্র।

রাগমার্গীয় ভক্তিসাধকের ভূমিকাসম্পর্কে শ্রীল রূপপাদ নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—"উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্‌নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ (শ্রীভ: র: সি: ২।১।২৭৬) অর্থাৎ যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণরতি জাত হইয়াছে অথচ বিঘ্ন (অনর্থ) সম্যক্‌রূপে দূর হয় নাই, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা হইয়াছে, তাঁহারাই (রাগমার্গীয়) ভক্তিসাধক বলিয়া কীর্তিত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশ হইতে রাগমার্গীয় গুরু ও শিষ্যের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইল। বস্তুতঃ এইরূপ জাতরতি গুরু পাওয়া গেলেও জাতরতি শিষ্য পাওয়া দুর্লভ।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ১৯।১৩৩)—শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপর্যুক্ত বচন হইতে ভাগ্যবান্

অর্থাৎ যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাপ্রাপ্ত কর্মাধিকারী অজাতরতি ব্যক্তিকেও শিষ্য করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এখানে শিষ্য অজাতরতি হইলেও যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাপ্রাপ্ত হওয়ায় শ্রীগুরুদেব উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া তাহাকে ভক্তিলতাবীজ (শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার বাসনা) দেন। শ্রীগুরুদেব জাতরতি না হইলে শিষ্যের হৃদয়ে এইরূপ বাসনা সঞ্চার করিতে পারেন না। এই ভক্তিবাসনা বা ভক্তিলতাবীজ স্বরূপশক্তির বৃত্তি হওয়ায় ইহা স্বরূপতঃ শুদ্ধ। কিন্তু কর্মাধিকারী সাধকহৃদয়স্থ রজস্তমোগুণদ্বারা রঞ্জিত হইয়া প্রাথমিক অবস্থায় ইহা প্রীণনাভাসরূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু শ্রীগুরুকৃপায় কর্মাধিকারী সাধক তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত শ্রীহরিনামকীর্তনরূপ ভক্তিকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ তৎফলের প্রতি আকাংক্ষা না রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উদ্দেশ্যেই অর্পণ করে। এই শ্রীহরিনাম-কীর্তন অহংকারযুক্ত অবস্থায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্বরূপতঃ পুণ্যকর্ম হইলেও তাহাতে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিউদ্দেশ্যে অর্পণ করায় তাহা ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে পরিণত হয়। শ্রীগুরুকৃপাপ্রেরিত সাধক শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগ করায় তাহার অনুষ্ঠিত কর্মার্পণকে ভক্তির পূর্বাঙ্গ বলা যায়। সে এইরূপ কর্মার্পণপূর্বক অন্তর্যামিদৃষ্টিতে ভূতাদর করিতে থাকিলে ভক্তির প্রধান অন্তরায়স্বরূপ রজস্তমোগুণ সত্বর তাহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় এবং সে দৈন্যযুক্ত হইয়া সর্বদা শ্রীগুরুকৃপালাভের জন্য সক্রন্দন প্রার্থনা করে। ফলে সে শ্রীগুরুকৃপায় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রতি লাভ করে।

অতএব রাগমার্গীয় গুরু অজাতরতি হইলে শিষ্যকে শ্রীকৃষ্ণরতিরূপ সম্পত্তি দিবেন কিরূপে ? এই কারণেই শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর বলিলেন—"অজাতরতি ব্যক্তি গৌড়ীয় গুরু হইবার যোগ্য নহে।" এইরূপ শাস্ত্রানুমোদিত ও গোস্বামিগণের সমর্থিত শত-সহস্র উপদেশ দ্বারা ক্রমপন্থায় কিরূপে জীব কর্মাধিকার হইতে ভক্ত্যধিকারে উন্নীত হইবে, তাহা তিনি শিক্ষা দিয়াছেন।

(৫) শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদই তাৎকালিক আবশ্যকতানুরোধে সর্বপ্রথমে গৌড়ীয়সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রচার করেন। ইহার যৌক্তিকতা বিচার না করিয়া অধিকাংশই এই অবান্তর মতবাদকে গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে কি সিংহশাবকের ন্যায় বজ্রনির্ঘোষস্বরে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শনপূর্বক গৌড়ীয়সম্প্রদায় যে কোনমতেই মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারে না, তাহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার এতাদৃশ সিদ্ধান্ত যে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-

সমাজে প্রচলিত উক্ত ভ্রান্ত ধারণার মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া সারগ্রাহী সাধকগণের চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিয়াছে, ইহা অনস্বীকার্য।

(৬) তাঁহার একটি দুর্বোধ্য আচরণ হইল গৃহস্থাশ্রম স্বীকার। মঠবাসিগণের রুচি পরীক্ষা করতঃ কাহারও গৃহত্যাগে অধিকার নাই বলিয়া যখন তিনি অনুভব করিলেন, তখন তাহাদিগকে বলিলেন যে, মহতের বিশেষ কৃপায় যাহাদের শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে রতি জাত হয় নাই, আগ্নেয়গিরি-গহ্বরস্থ-প্রচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় উৎকট ভোগবাসনা অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া বাহিরে ত্যাগিবেশ ধারণপূর্বক অধোগামী হওয়ার পরিবর্তে গৃহস্থাশ্রম স্বীকারপূর্বক ক্রমপন্থায় সাধন করাই তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। তাঁহার এইরূপ উপদেশ সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় ও অধিকারোচিত হইলেও আত্মসম্মানহানির আশঙ্কায় অনেকেই ইহা গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হইল। তখন শ্রীহ্লাদিনীশক্তির প্রেরণায় তাহাদের শিক্ষার নিমিত্ত নিজের সমস্ত প্রতিষ্ঠাকে জলাঞ্জলি দিয়া তিনি দারপরিগ্রহপূর্বক গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ গৃহস্থের যাবতীয় আচরণ জগতে প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অনেকে ত্যাগিবেশ পরিহারপূর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অত্যল্প দিনের জন্য গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া বিরহবিধুর হইয়া নিষ্কিঞ্চনবেশে একাকী শ্রীব্রজধামে শ্রীরাধারমণদেবের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীমৎ পুরুষোত্তম লাল গোস্বামী মহাশয়ের একটি ছোট বাগান বাটীতে স্বভজনে রত থাকিলেন। পক্ষান্তরে গৃহস্থাশ্রম স্বীকার হেতু তাঁহার স্খলন হইল বলিয়া অন্যাভিলাষিগণ চিত্রণ করিলেন।

মহতের আচরণে যে এইরূপ অসঙ্গতি থাকিতে পারে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। আপাততঃ অসঙ্গত প্রতীত হইলেও এইরূপ আচরণ তাঁহার মহত্ত্বে সামান্যতম মলিনতা আনিতে পারে না। কারণ মহৎ হ্লাদিনীশক্তির দূত। তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। হ্লাদিনীশক্তির ইচ্ছার দ্বারাই তিনি চালিত। আর্তিবৃদ্ধিপূর্বক ভজনকে পরিপুষ্ট করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিবার উদ্দেশ্যেই হ্লাদিনীশক্তি কদাচিৎ তাঁহার নিজজনের দ্বারা এইরূপ অসংগত আচরণ(?) করাইয়া থাকেন। ইহার বহু উদাহরণ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ইহাতে তাঁহাদের কোনও হানি হয় না, বরং আর্তিবৃদ্ধি হেতু ইহা ভজনের সহায়কই হইয়া থাকে। ইহাতে তাঁহাদের কোন অভিনিবেশও থাকে না। কিন্তু যাহারা ইহাতে দোষ দর্শন করে তাহারা অপরাধী হইয়া নিজের সর্বনাশ সাধন করে। শ্রীভরত মহারাজের হরিণশিশুর প্রতি আসক্তি, ক্ষাত্রধর্মে

শ্রীমুচুকুন্দের মৃগয়াজনিত পাপ, পরিব্রাজকের কার্য করিবার পরও শ্রীল শ্রীনিবাসচার্য প্রভুর বিবাহ ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর দারপরিগ্রহাদি দ্বারা কি তাঁহাদের পতন হইয়াছে বলা যাইবে ? যদি তাহাই হইত তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে নিম্ন অভিমত প্রকাশ পাইত না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।৮।২৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর শ্রীভরত মহারাজের মৃগশিশুর প্রতি আসক্তিকে তাঁহার প্রারব্ধ প্রাকৃত কর্মের ফল বলিয়া উল্লেখ না করিয়া তাঁহার আর্তিবৃদ্ধির জন্য পরমকরুণাময় ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের ইচ্ছায়ই তিনি মৃগশিশুর প্রতি আসক্তবৎ প্রতিভাত হইয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীমুচুকুন্দের সম্বন্ধে শ্রীভা: ১০।৫১।৬২ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত স্নেহ ও কৃপাপরবশ হইয়া প্রেমলাভের জন্য শ্রীমুচুকুন্দের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই মৃগয়াজনিত পাপক্ষয় নিমিত্ত তপশ্চরণে কালাতিপাতের কথা বলিয়াছেন। অথচ শ্রীভা: ১০।৫১।৫৮ শ্লোকে সেই শ্রীকৃষ্ণই পূর্বে শ্রীমুচুকুন্দের বুদ্ধিকে প্রাকৃত মলরহিত বলিয়া উল্লেখ করায় মৃগয়াজনিত পাপ তাঁহার ছিল না বলিয়া স্পষ্টই জানা যায়। সুতরাং প্রেমপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থই শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ উক্তি। আকুমার-ব্রহ্মচারী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার 'প্রার্থনা'য় "দয়া কর শ্রীআচার্য প্রভু শ্রীনিবাস।" উল্লেখ করিয়া শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর কৃপাপ্রার্থনা করিয়াছেন। যদি বিবাহ করিয়া তাঁহার পতন হইত, তাহা হইলে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এইরূপে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতেন কী ? শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধেও স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে। তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিলুঁ তোমারে॥" (শ্রীচৈ: ভা: অন্ত্য ৭।১২৩)

যে শ্রীপুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর ভূরি ভূরি আচরণদ্বারা কোটি কোটি জন্মের অপরাধজর্জরিত মাদৃশ নরপশুকেও রাগানুগা ভক্তির সন্ধান দেওয়ার নিমিত্ত সতত ব্যাকুল হইয়াছেন, নিজের উপদেশকে শিষ্যগণ সম্যগ্‌রূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া যিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিয়াছেন, কিরূপে সকলেই তাঁহাকে সম্যক্ অনুসরণ করিতে পারিবে তদুদ্দেশ্যে যিনি অকথনীয় ক্লেশস্বীকারপূর্বক পানাহার ভুলিয়া কি মঠবাসী, কি গৃহস্থ, সকলের নিকট শ্রীজীবপাদের রচিত শ্রীভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত অনর্গল কীর্তন করিয়াছেন, বিষয়ীর অন্নগ্রহণ যে ভজনের ঘোর প্রতিবন্ধক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা হইতে ইহা প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া যিনি নিজে আচরণপূর্বক তাহা স্পর্শ

না করিতে সকলকে উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিই ভক্তিলতাবীজ বলিয়া যিনি বজ্রনির্ঘোষস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, যিনি একাদশীতে নির্জল উপবাস, শ্রীহরিকীর্তনসহ রাত্রি জাগরণ ও দ্বাদশীতে দিবানিদ্রা ত্যাগপূর্বক শ্রীহরিবাসর-তিথিপালনের আদর্শ আচরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগঙ্গা, শ্রীতুলসী, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবৈষ্ণবসেবার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, গৌড়ীয়সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও ভ্রান্ত মতবাদ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ হইতে এযাবৎ গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত ছিল, বহু প্রমাণ প্রদর্শনপূর্বক সিংহশাবকের ন্যায় যিনি তাহা নিরাসপূর্বক সারগ্রাহী শুদ্ধভক্তিসাধকগণের চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিয়াছেন, কেবল গৃহস্থাশ্রমস্বীকার এতাদৃশ অদ্বিতীয় সিদ্ধান্তবিৎ, সদাচারনিষ্ঠ তথা ইষ্টাবিষ্টচেতা মহতের মহত্ত্বে কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে কী ? শ্রীজীবপাদের অনুসরণে তিনি যে বিলক্ষণ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুসরণ করা ত' দূরের কথা, কয় জন বা তাহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিয়াছে ? বস্তুতঃ পূর্ব যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপা না থাকিলে তাঁহার আচরণ ও তাঁহার কীর্তিত সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করা রজস্তমোগুণাবিষ্ট স্বসুখকামী জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর যদি এই জগতে আবির্ভূত না হইতেন তাহা হইলে শ্রীজীবপাদ সমস্ত শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া শ্রীভাগবতসন্দর্ভে যেসমস্ত বিজ্ঞানভিত্তিক বিপ্লবাত্মক সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা জগদ্বাসীর অবিদিত থাকিত। অবশ্য শ্রীজীবপাদের পর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্যপ্রভু প্রমুখ মহাজনগণ বিপুলভাবে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়া বিশ্বকে প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ বিনাসাধনে জগদ্বাসীকে প্রেম দিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ বিরলোদয় কৃপাবলে যথেচ্ছ প্রেমদান করিয়াছেন। তাঁহাদের সময়ে ক্রমপন্থায় সাধন করিয়া কাহারও প্রেম লাভ করিবার দৃষ্টান্ত নাই। বিরলোদয় কৃপাসম্পর্কে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১।৩।৬ শ্লোক আলোচ্য।

অতএব সাধু সাবধান! যে মহানুভবের শিক্ষা তাঁহার অনুগামিদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানস্পৃহা জাগ্রত করাইয়া তাহাদিগকে দৈন্যসমুদ্রে নিমজ্জিত করাইয়াছে এবং যাঁহার প্রেরণায় তাহারা নিজ নিজ অধিকার বিষয়ে সচেতন থাকিয়া ও অনিন্দুক হইয়া ভূতাদরপূর্বক কর্মার্পণ করিয়া মহৎকৃপার বলে ভক্ত্যধিকারে উন্নীত হইবার জন্য সতত চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিতে করিতে কাতরস্বরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গৌরগুণধাম' 'শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ' মহাবদান্য-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-প্রেমামৃত-মহাম্বুধি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের এই নাম-

কীর্তনমুখে দিনাতিপাত করিতেছেন, তিনি কি আমাদের মত একজন কর্মফলবাধ্য সাধারণ মনুষ্যবিশেষ ? হ্লাদিনীশক্তির প্রেরিত দূত ব্যতীত হ্লাদিনীশক্তির সম্পর্কশূন্য তটস্থশক্তিপ্রসূত কর্মফলবাধ্য স্বসুখকামী সাধারণ জীব কি কখনও অন্য জীবের হৃদয়ে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপা শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি জাগ্রত করাইতে পারে ? সুতরাং যে কেবল নিজের অপস্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইবে, সে দুর্ভাগা ব্যতীত আর কি হইতে পারে ?

সমস্ত শাস্ত্রে পরনিন্দা ও পরদোষদর্শন বর্জনের উপদেশ থাকা সত্ত্বেও ভগবদ্‌বিমুখ পরশ্রীকাতর মানব কেবল পরনিন্দাকেই উপজীব্য করিয়া এই সংসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সতত ব্যাকুল। তাহার এই ব্যাকুলতা যে কেবল মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে, শাস্ত্র ও মহাজনগণের বাণী অনুসরণ করিলে ইহা স্বতঃই অনুভূত হয়। পরনিন্দা করিয়া কেহ কখনও উপকৃত হইবার উদাহরণ জগতে নাই। সাধারণ জীবের নিন্দা করিলেও শ্রীবিষ্ণু রুষ্ট হন বলিয়া যখন শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তখন মহৎবিনিন্দা যে একটি মারাত্মক অপরাধ ইহা সহজেই বুঝা যায়। একজন সতত ইষ্টসেবাবিষ্টমনা ও একজন পরচর্চক—এ দুইয়ের মধ্যে কোন তুলনা হইতে পারে কী ?

সুতরাং যাহারা সরল, নিষ্কপট ও প্রকৃতপক্ষে মহৎকৃপাভিক্ষু তাহারা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের দোষ দর্শন ত' দূরের কথা প্রাণিমাত্রে কাহারও দোষ দর্শন না করিয়া স্বদোষদর্শী হইয়া মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিলে তাঁহাদের কৃপায় শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে। অধিকন্তু এই জন্মেই তাঁহার কৃপাবরণপূর্বক ভক্ত্যধিকারে উন্নীত হইবার জন্য সতত যত্নবান্ হইবে।

যে মহাপুরুষের অনুভবসিদ্ধা বীর্যবতী বাণী-কাদম্বিনী অনাদি-স্বসুখবাসনা-জ্বালা-সংতপ্ত জীবের হৃদয়মরুকে দৈন্য-বারিবর্ষণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানরূপ হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিভূতা ভক্তিলতাবীজ-বপনযোগ্য করাইয়াছে, যাঁহার অনাবিল অনন্যসাধারণ আচরণ ও শিক্ষা সতত পরদোষদর্শীকে স্বদোষদর্শী করাইয়া অনুতাপানলে দগ্ধীভূত করাইয়াছে, যাঁহার উপদেশ কর্মফল-আত্মসাৎকারী রজস্তমোগুণাক্রান্ত হৃদয়ে ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণের অকপট স্পৃহা জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছে, নিজের জ্বলন্ত আচরণদ্বারা যিনি প্রতিষ্ঠাকে সর্বতোভাবে বর্জনপূর্বক তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া অনুক্ষণ শ্রীনামকীর্তনদ্বারা শুদ্ধভক্তিপথের পথিক হইতে প্রণোদিত করিয়াছেন, ইষ্টদেবের সুখবাসনা রাগানুগা ভক্তির প্রাণ বলিয়া নিজ অনুগত ভক্তগণের হৃদ্‌বোধ করাইবার নিমিত্ত যিনি পানাহার ভুলিয়া

অসহনীয় ক্লেশ স্বীকারপূর্বক শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন, কর্মাধিকারী জীব হৃদয় হইতে রজস্তমোগুণকে বিতাড়নপূর্বক কিরূপে গাঢ় আবেশ ও আর্তিযুক্ত হইয়া শ্রীহরিনাম কীর্তনের যোগ্যতা লাভ করিবে, তজ্জন্য যিনি নিজে আচরণপূর্বক অন্তর্যামিদৃষ্টিতে ভূতাদর করিতে তাঁহার অনুগতবর্গকে শিক্ষা দিয়াছেন, যিনি নিজে ক্লেশ বরণ করিয়াও নিজ সেবায় নিযুক্ত শিষ্যকে তাহার মঙ্গলের জন্য নিজ-সেবা ছাড়াইয়া ক্রমপন্থায় ভজন করিতে গৃহস্থাশ্রমে পাঠাইয়াছেন, যিনি স্বসুখকামী কর্মাসক্ত জীবকে রাগানুগভক্তিপথের পথিক করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজনের অশেষ মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত করাইতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং নানাবিধ সুমধুর স্বরে নিজরচিত শ্রীগৌরনাম নিজে পরমাবিষ্ট হৃদয়ে কীর্তনপূর্বক সতত তাহাতে মগ্ন থাকিতে সকলকে উপদেশ দিয়াছেন, যিনি নিজ অপ্রকট সময়েও তাঁহার অনুগতগণের বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপালাভের উদ্দেশ্যে চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গৌরগুণধাম" নাম কীর্তন করিতে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকটলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহার মত আশ্রিতবৎসল, অদোষদর্শী, পরদুঃখদুঃখী, হীনার্থাধিকসাধক আর কে আছে? শ্রীহ্লাদিনীশক্তির দূত না হইলে এতাদৃশ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে তিনি সমর্থ হইতেন কী?

তাঁহার পদাঙ্কানুসারিণী পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণী

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে শ্রীল আচার্যদেব অপ্রকট লীলাবিষ্কার করেন। তাহার পর হইতে ১৯৮৬ আষাঢ় পূর্ণিমা (গুরু পূর্ণিমা) পর্যন্ত দীর্ঘ ২৮ বৎসর কাল নিজের কোন আত্মীয়ের নিকট না গিয়া পরমারাধ্যা শ্রীমাতাঠাকুরাণী অপতিতভাবে শ্রীব্রজধাম আশ্রয় করিয়া শ্রীল আচার্যদেবের একান্ত আনুগত্যে শ্রীগোস্বামিগ্রন্থ-মুদ্রণরূপ সেবায় ও স্বভজনে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার অপ্রকটকালে তিনি প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, যেকোনভাবে মহৎ পাদপদ্মে মমতা হইলেই তাঁহার কৃপালাভ সুনিশ্চিত।

১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ জুলাই ১৪ তারিখে শ্রীমাতাঠাকুরাণীর অসুস্থতার খবর পাইয়া এ বিনীত লেখক শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া ১৫ই জুলাই সকাল ১০টার সময় তথায় পৌঁছাইল। সেসময় শ্রীমাতাঠাকুরাণী ঘরের মধ্যে রক্তচাপে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। শুশ্রূষার নিমিত্ত তাঁহার নিকট কোন সেবকই ছিল না। আবার ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। তাঁহাকে ডাকা মাত্রই তিনি সাড়া দিলেন এবং কিরূপে আসিলাম বলিয়া জিজ্ঞাসাও করিলেন;

কিন্তু দরজা খুলিলেন না। দরজায় বহু সময় ধরিয়া ধাক্কা মারিয়া ও প্রায় একঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার পরও দরজা না খোলায় খুব চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পাশের বাড়ির বারান্দায় বসিয়া থাকিলাম। এইসময় হঠাৎ একজন প্রতিবেশী স্ত্রীলোক দরজায় হাত দিয়া দেখেন যে দরজা খোলা। তারপর দরজা খুলিয়াছে বলিয়া তিনি আমাকে ভিতরে যাইতে ডাকিলেন। ভিতরে যাওয়া মাত্রই দেখিলাম যে, মাতা ঠাকুরাণী সংজ্ঞাহীনা। দরজা কে খুলিল এবং কিভাবে খুলিল তাহা আমার পক্ষে এক রহস্য হইয়া রহিল। যে দরজায় ধাক্কা মারিয়াও খুলিল না, তাহা কিরূপে হাত দেওয়া মাত্রই খুলিয়া গেল ?

যাহাই হউক, তার পর তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করা হইল। চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হইল। কিন্তু যখন তাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইত, তখন তিনি বলিতেন—"না, কোন চিকিৎসার আবশ্যকতা নাই। প্রভু (শ্রীল আচার্যদেব) ভাল করিয়া দিবেন। ইহা বলিয়া সেই অবস্থায় তিনি (জ্ঞান থাকার সময়) সুর করিয়া "আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি" পদটি গাহিতেছিলেন। তারপর ডাক্তারকে ডাকা হইল। ডাক্তার বলিলেন যে, শেষ অবস্থা। তথাপি চিকিৎসা চলিল। আমার সহধর্মিণী, জ্যেষ্ঠা কন্যা বসুধা ও অন্যান্য গুরুভাইগণও আসিয়া পৌঁছিয়া গেলেন। বহু ব্রজবাসী মা'র দর্শনের জন্য আসিতেন। সকলের মুখে একই কথা—"মা যেরূপ নিষ্ঠাসহকারে ভজন করিয়া গিয়াছেন, তিনি শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথি 'শ্রীগুরু পূর্ণিমা' ব্যতীত অন্য দিনে যাইবেন না।" ১৯শে জুলাই হইতে তিনি সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীনা হইয়া পড়িলেন। ঐ দিবস শ্রীমুরলীধর দাসজী (জনৈক গুরুভ্রাতা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মায়ে'র সংজ্ঞা নাই, শেষ অবস্থায় ত তিনি শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিযুক্ত হইয়া যাইতে পারিবেন না ?" তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম—"না, তাঁহার বাহ্য ইন্দ্রিয় অপটু হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্তরে তাঁ'র ভগবৎস্মৃতি অক্ষুণ্ণ আছে। মহৎ যাঁহাকে পত্নীরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার যে উদ্ধার সুনিশ্চিত, ইহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে ?" জুলাই ২১ তারিখ, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথি; সকাল আটটা। সকলের মনে আশঙ্কা, আজ মাতাঠাকুরাণী নিশ্চয় চলিয়া যাইবেন। বসুধা তাঁহার গা' মুছিয়া দিল ও আমি তিলক করিয়া দিলাম এবং সকাল ৮।২০ মিনিটের সময় খোলকরতাল সহযোগে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গৌরগুণধাম" কীর্তন শুরু করা হইল। তখন বৃদ্ধ ব্রজবাসী গুরুভ্রাতা শ্রীজ্ঞান দাসজী, শ্রীরাজুগোপালজী, শ্রীমুরলীধর দাসজী ও অন্য সকলের সহিত আমিও সেই কীর্তনে যোগ দিয়া ছিলাম। মাত্র

দশ মিনিটের পর অর্থাৎ সকাল ৮।৩০ মিনিটের সময় যখন "শ্রীল পুরীদাস ঠাকুরের দেওয়া নাম গৌরগুণধাম" কীর্তন হইতেছিল, ঠিক সেই সময় দুইদিন পূর্ব হইতে পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণীর যে হাত দুইটি সম্পূর্ণ অবশ হইয়া গিয়াছিল, যাহা চেষ্টা করিয়াও বাঁকানো যাইত না, তাহা হঠাৎ যন্ত্রচালিতবৎ যুক্ত হইয়া তাঁহার মস্তকের নিকট চলিয়া আসিল এবং তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শেষ প্রণতি জানাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু শেষ হইয়া গেল। এই দৃশ্য দেখিয়া উপস্থিত সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন। শ্রীমুরলীধর দাসজী দুইদিন পূর্বে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহার উত্তর পাইয়া বিস্মিত-নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। যে হাত দুইটি দুইদিন পূর্বে কাষ্ঠবৎ সম্পূর্ণ অনমনীয় (stiff) হইয়া গিয়াছিল, তাহা কিরূপে আপনা হইতেই পরিষ্কারভাবে নমস্কার করিবার ন্যায় যুক্ত হইয়া সোজাসুজি ভাবে মস্তকের নিকট চলিয়া আসিল, এই আশ্চর্য ব্যাপার কেহই বুঝিতে পারিলেন না। তাহার পর বাম হাতটি বুকের উপরে রহিয়াগেল ও ডান হাতটি সোজা হইয়া বিছানায় পড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাতাঠাকুরাণী নিজের শ্রীগুরুপাদপদ্মে শেষ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্বক "প্রণতি" নাম সার্থক করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নিকট চলিয়া গেলেন।

এতদ্দ্বারা তিনি মাদৃশ স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিয়া গেলেন যে, "যিনি নিষ্কপটভাবে নিষ্ঠাসহকারে মহতের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকিবেন, তিনি নিশ্চিতরূপে তাঁহার কৃপায় ভক্তিলাভের অধিকারী হইতে পারিবেন।"

তিনি প্রচার করিতে বাহিরে যান নাই। কঠোর বৈরাগ্য* অবলম্বনপূর্বক দীর্ঘ ২৮ বৎসর কাল রুদ্ধদ্বার কক্ষে অবস্থান করত সর্বতোভাবে শ্রীল আচার্যদেবের আদর্শ অনুসরণ করিয়া পড়িয়া ছিলেন। তাঁহার অপ্রকটকালীন এই অদ্ভুত আচরণের দ্বারা কেবল মহতের অনুসরণ করিলে কিরূপে নিজের প্রকৃষ্ট মঙ্গল

---

* তাঁহার অসুস্থতার সময় প্রথমে যখন তাঁহাকে দর্শন করিলাম, তখন তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নীচে পড়িয়া ছিলেন। তারপর তাঁহার গা'হাত মুছিয়া দিয়া শোয়াইবার সময় জানা গেল যে, তাঁহার কোন তোষক বা বালিশ নাই। তিনি বিনা বিছানায় ও বিনা বালিশে নীচে কিম্বা তাঁহার গৃহস্থিত একটি কাঠের খাটের খালি পাটার উপর বিশ্রাম করিতেন। বৃন্দাবনের প্রবল শীতেও তাঁহার কোন কম্বল কিম্বা লেপ ছিল না। পরিধানের জন্য মাত্র অতি মোটা তিনখানা শাড়ী ও অন্তর্বাস ছিল। তাই বাধ্য হইয়া তত্রস্থ অন্য সেবকগণের একটি লেপ ও একটি বালিশ পাতিয়া তাঁহাকে শোয়ানো হইল।

সাধিত হইতে পারে, তাহাই জগৎকে দেখাইয়া তিনি আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের চক্ষু খুলিয়া দিলেন। তাঁহার এই আচরণের দ্বারা স্পষ্ট জানা গেল যে, মহতের প্রীতির উদ্দেশ্যে যাবতীয় অনুষ্ঠান করাই প্রকৃত প্রচার। মহতের আনুগত্য বাদ দিয়া জীবমঙ্গলের ছলনায় শুদ্ধভক্তি-প্রচারের অভিনয় করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের দ্বারা কাহারও নিত্যমঙ্গল সাধিত হইতে পারিবে না। মহতের হৃদয় সর্বদা ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানাবেশে ভরপুর। এই আবেশই তাঁহার সর্বস্ব। যিনি তাঁহার আশ্রয়ে সারা জীবন পড়িয়া থাকিবেন, তিনি নিশ্চিতরূপে তাহাকে তাঁহার হৃদয়ের এই আবেশ দান করিয়া কৃতার্থ করিবেন। এই আবেশলাভই সাধনের চরম ফল এবং একমাত্র মহৎকৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ইহা লভ্য নহে। তাঁহার এই আদর্শ মাদৃশ পতিতান্ধ জীবের অনুসরণীয় হউক, তাঁহার শ্রীচরণে এই সদৈন্য নিবেদন।

মিশনরক্ষা সম্পর্কে আলোচনা

শ্রীল আচার্যদেব গৃহস্থলীলা করিবার সময় তাঁহার বহু গুরুভ্রাতা মিশনরক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"শ্রীল প্রভুপাদ এত কষ্ট করিয়া জীবমঙ্গলের জন্য এই মিশন গড়িয়াছিলেন; আপনি তাহাকে ভাঙ্গিতেছেন কেন ? ইহার প্রত্যুত্তরে শ্রীল আচার্যদেব তাহাদিগকে বলিলেন—"আপনারা সকলেই জানেন যে শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে শ্রীরূপরঘুনাথের বাণী কীর্তন করিতে আদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমি সেই শ্রীরূপরঘুনাথের বাণী বলিতে গেলে মিশন ভাঙ্গিতেছে। এখন আপনারা বলুন কি কাজ করিলে আমার শ্রীগুরুদেবের আদেশ-পালন হইবে ?" তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতে পারিলেন না। তখন তিনি বলিলেন—"মিশন ভাঙ্গিয়া দেওয়া আমার অভিপ্রায় নহে। শ্রীল প্রভুপাদের দোহাই দিয়া বহু ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য মিশনে করা হইতেছে। সেসব প্রকাশ করায় সাধনানুরাগী লোকের মিশনের প্রতি অশ্রদ্ধা আসিতেছে। ইহা বলিয়া কি আমি লোককে ভক্তিবিরুদ্ধ কথার দ্বারা ভুলাইয়া মিশনের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া বিপথগামী করাইব ? আমি আমার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মিশনকে রক্ষা করিতে গিয়া শ্রীরূপসনাতনের চরণে অপরাধী হইতে চাহি না।" তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ স্পষ্ট উত্তর শুনিয়া সকলে নীরবে তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

শ্রীব্রজধামে স্বভজনে রত

শ্রীল আচার্যদেব যখন ব্রজধামে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি অধিকাংশ সময় শ্রীরাধারমণ দেবের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীমৎ পুরুষোত্তম লাল গোস্বামী

মহাশয়ের বাগানের মধ্যে একটি ছোট ঘরে স্বভজনে রত থাকিতেন। সেসময় তাঁহার জীর্ণশীর্ণ দেহ, শ্মশ্রুযুক্ত মুখ, ছিন্ন মলিন পরিধান ও অনুক্ষণ বিরহব্যথিত ভাব দেখিলে মহা পাষণ্ডের চক্ষু হইতেও স্বতঃ অশ্রু বিগলিত হইত। কোথায় গেল সে আচার্যত্ব, কোথায় গেল সে গৃহস্থলীলার ছলনা, কোথায় গেল খাওয়া পরার সুখ, সেসব দিকে দৃক্‌পাতও না করিয়া, বহির্মুখ সঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকিয়া তিনি অনুক্ষণ বিরহ-বিধুর-ভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম ও শ্রীগৌরনাম কীর্তনপূর্বক কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার সেই বিরহবিধুর ভাব দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইয়া যাইবে। হে হ্লাদিনীশক্তির দূত! হে ইষ্টসুখৈকনিষ্ঠ! হে শ্রীরূপসনাতনানুগ শ্রীজীবাভিন্নবিগ্রহ! হে অদ্বিতীয় সিদ্ধান্তবিৎ! জীবকল্যাণের জন্য ব্যথিতচিত্ত তোমার অহৈতুককৃপাময় দৃষ্টি সংসারদাবানলদগ্ধ দুরিত জীবের প্রতি পতিত হউক; জন্ম-জন্মান্তরের অপরাধপঙ্কে নিমজ্জমান, ম্রিয়মাণ বিমুখ জীব তোমার সেই কৃপাবারিসিঞ্চনে নবজীবন লাভ করিয়া ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধিৎসা লইয়া তাঁহার সেবায় ব্রতী হউক ও অনুক্ষণ চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে কাতর আহ্বানপূর্বক কালাতিপাত করুক।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ

শ্রীকৃষ্ণ সর্বেশ্বরেশ্বর, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতাদি সমস্ত শাস্ত্র তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন। সর্বাদ্ভুত-চমৎকারকারিণী লীলামাধুরী, অতুল্যা প্রেমমাধুরী, ত্রিজগন্মানসা-কর্ষিণী বেণুমাধুরী ও অনুপমা রূপমাধুরী শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ব্যতীত অন্য কোন ভগবৎস্বরূপে নাই। এইসব মাধুরী শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের রসিকশেখরত্বের পরিচায়িকা। রসিকশেখরত্ব ও পরমকরুণত্ব—এই দুইটি তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি গুণ বলিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু উল্লেখ করিয়াছেন।

"রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্‌গম॥"

(শ্রীচৈ: চ: আদি ৪।১৫)

এই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ হইয়া লীলামাধ্যমে ব্রজবাসিগণের স্বসুখবাসনাশূন্য প্রেমরসনির্যাস আস্বাদন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। দ্বাপরের শেষভাগে তিনি যখন তাঁহার প্রকটলীলা সংগোপন করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন পরমকরুণত্ববশতঃ তাঁহার আস্বাদিত অপূর্ব ব্রজপ্রেমের সন্ধান অনাদিবহির্মুখ জগদ্‌বাসী জীব কিরূপে পাইতে পারিবে, সেই চিন্তায় ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। ব্রজজীবন তাঁহার বিনা অন্য কোন অবতার এই প্রেম দান করিতে পারিবেন না, এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি তাঁহার রসিকশেখরত্বের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া পরমকারুণিকতায় বিভোর হইলেন। রসিকরূপে তিনি ভক্তের

প্রেমরস আস্বাদনপূর্বক তাহাকে আনন্দ দান করিতে পারেন, ইহা সত্য; কিন্তু ভক্ত তাঁহাকে কিরূপ প্রেম করে সেবিষয়ে তো কোন জ্ঞান বা অনুভূতি তাঁহার নাই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রেমদান বিষয়ে তাঁহার পূর্ণ অসামর্থ্য তিনি অনুভব করিলেন। কারণ এই প্রেমসম্পত্তিতে তাঁহার কোন স্বত্বাধিকার নাই। তাঁহার পরমস্বাতন্ত্র্য হেতু রসাস্বাদনের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির মূর্তি শ্রীরাধারাণীকে এই প্রেমসম্পত্তির মূল স্বত্বাধিকারিণী করিয়া দিয়াছেন। ইহার পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিয়া শ্রীরাধারাণী নিত্য নব নব সেবাদ্বারা তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রীতিবিধানে তৎপরা। এতদ্‌ব্যতীত তিনিও পরমকরুণাময়ী। সেজন্য ভক্তগণকে কৃতার্থ করিবার মানসে তাহাদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবা সম্পাদন করাইয়া যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্ত উভয়কে সুখী করানো তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি গুণ। শ্রীরাধারাণীর সেই গুণের কথা চিন্তা করিতে করিতে করুণার মূর্তি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেই ভাবসমুদ্রে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হইলেন। সেই শ্রীরাধাভাবের আবেশে তাঁহার শ্যামসুন্দররূপ ও রসিকশেখরত্ব-গুণ তাঁহার স্মৃতিপট হইতে সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল। এইভাবে আবিষ্ট অবস্থায় তিনি নির্বিচারে সকলকে ব্রজপ্রেম দান করিতে সমর্থ বলিয়া স্বয়ং অনুভব করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই স্বরূপই "শ্রীগৌরস্বরূপ"। এই মহাবদান্য শ্রীগৌরস্বরূপের মহিমা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। তিনি রাধাভাবে এরূপ আবিষ্ট থাকিতেন যে, সেই ভাবের তরঙ্গ অনুক্ষণ তাঁহা হইতে উত্থিত হইত। তাঁহার দর্শন মাত্রে সেই তরঙ্গের প্রভাবে লোকে প্রেমাবিষ্ট হইয়া যাইতেন এবং উক্ত প্রেমাবিষ্ট ব্যক্তির সংস্পর্শে যে আসিত সেও সেইরূপ প্রেমাবিষ্ট হইত। ইহাতে তৃপ্ত না হইয়া এই প্রেমদান কার্যকে আরও ব্যাপক করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার অনুগত অমলাশয় ভক্তগণের হস্তে নিত্যকাল এই যথেচ্ছ প্রেমদানের ভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। জগদ্বাসিগণকে প্রেমদান করিতে তিনি কিরূপ ব্যগ্র, তাঁহার এইসব কার্যই তাহার প্রমাণ।

শ্রীগৌরচন্দ্র জগজ্জীবকে যে অপূর্ব প্রেমসম্পত্তি দান করিয়া গেলেন, যাহা লাভ করিয়া মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-লতা পর্যন্ত প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই প্রেম তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত কোটি কোটি জন্মের সাধনের দ্বারাও লভ্য নহে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এসম্পর্কে শ্রীচৈ: চ: আদি (১।৫৬-৫৮) যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ, এই দুই ভাই। শ্রীগৌর হইলেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাতা। তাঁহাকে "শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-প্রেমামৃত-মহাম্বুধি" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবে (৪০৬)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী অভিহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মবিষয়ক প্রেমামৃতের মহাসিন্ধু। আর শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন শ্রীগৌরদাতা প্রভু। তিনি আর্ত বিষয়ীর বিষয়বাসনা দূর করিয়া তাহাকে শ্রীগৌরচন্দ্রের ভজনে প্রবৃত্ত করান। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ জীবহৃদয়ের অবিদ্যারূপ অন্ধকার দূর করিয়া ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন। ভক্তিরসপাত্র ভক্তভাগবত গ্রন্থভাগবতের বাণী শুনাইয়া জীবহৃদয়কে ভক্তিরসে বা প্রেমরসে পরিপূর্ণ করিয়া দেন। প্রেমরসলোলুপ উক্ত দুই প্রভু জীব-হৃদয়ের (ভক্তপ্রদত্ত) সেই প্রেমরস আস্বাদন করিতে গিয়া তাহাতে বন্দী হইয়া যান। দাতা ত' অনেক দেখা যায়, কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ন্যায় দাতা দুর্লভ। কারণ যে সুদুর্লভ প্রেমসম্পত্তি তাঁহাদের পরম আস্বাদ্য, তাহা যোগ্যাযোগ্য নির্বিশেষে সর্বত্র বিতরণান্তে তাহার আস্বাদনের দুর্দমনীয় পিপাসা সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহারা সেই প্রেমগ্রহীতার পুনঃ বশীভূত হইয়া যান। ইহাই তাঁহাদের করুণার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যে ব্রজপ্রেম জগৎকে দান করিয়া গেলেন, তাঁহার পূর্বে কোন অবতার তাহা দেন নাই কিম্বা দেওয়ার অধিকারও তাঁহাদের নাই। এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও এই প্রেমদানবিষয়ে নিজেকে অসমর্থ মনে করিয়াছেন। সেইহেতু এই ব্রজপ্রেম সুদুর্লভ এবং ইহা একমাত্র শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীগৌরচন্দ্রের কিম্বা তাঁহার নিজজনের কৃপা ব্যতীত কোনও সাধনের দ্বারা লভ্য নহে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাধনদ্বারা যদি ভক্তি লভ্য নহে, তবে স্বয়ং শ্রীগৌরচন্দ্র ভক্তিসাধনের উপদেশ দিলেন কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে শ্রীগৌরচন্দ্র যে ভক্তিসাধনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কেবল ভক্ত্যধিকারীর জন্য উদ্দিষ্ট; সর্বসাধারণের জন্য নহে। 'ভক্ত্যধিকারী' বলিতে কাহাকে বুঝায়? এ সম্পর্কে "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।" (শ্রীভা: ১১।২০।৮) শ্লোক আলোচ্য। অর্থাৎ ভক্তমহতের যাদৃচ্ছিকী কৃপায় যাহার আমার কথা (ভগবৎকথা) শ্রবণকীর্তনাদিতে শ্রদ্ধা জাত হইয়াছে, সেই ভক্তিযোগের অধিকারী। কোন বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা হইলে তবে তো তাহা পাইবার জন্য সাধন করিতে আগ্রহ হইবে। সেই জন্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৩৮)। শ্রীভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা হইলেই তাঁহাকে পাইবার বাসনা জাগে। সেই বাসনাই জীবকে সাধনে প্রবৃত্ত করায়। এই ভক্তিবাসনার মূল হইল মহৎকৃপা। ভক্তি একমাত্র স্বরূপশক্তির দূত মহতেরই নিজস্ব সম্পত্তি হওয়ায় কেবল তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপায়ই ইহা লাভ করিবার বাসনা যাহার হৃদয়ে

জাগে তাহাকেই ভক্ত্যধিকারী বলা হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, যে মহতের কৃপায় জীবহৃদয়ে ভক্তিবাসনা জাগে, তাঁহাকে চিনিব কিরূপে ? তাঁহাকে চিনিবার একমাত্র উপায় শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা। যে তাঁহার কৃপালাভের আশায় অনুক্ষণ চোখের জলে বুক ভাসাইয়া তাঁহার নাম কীর্তন করিবে, সে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারিবে এবং তাঁহার কৃপায় তদীয় নিজজনের স্বরূপও উপলব্ধি করিতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ হওয়ায় প্রেমরূপ তাঁহার নিজ গুপ্ত সম্পত্তির কথা শ্রীগৌররূপে অকাতরে জগদ্‌বাসীকে জানাইলেন। স্বয়ংরূপ ব্যতীত নিজের গোপনীয় কথা আর কে বলিতে পারিবে ? শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপায় যখন তাঁহাকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিতে পারিলেন তখন এইরূপে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন—

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢং গাঢং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ৬।২১)

অর্থাৎ কালপ্রভাবে বিনষ্টপ্রায় (অপ্রচারিত) স্ববিষয়ক নিজ ভক্তিযোগকে পুনর্বার প্রকট করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়া যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণকমলে আমার মনোভৃঙ্গ গাঢ়রূপে আসক্ত হউক।

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবলমাত্র প্রীতিযুক্ত ভজনেই বশ হন, এই কথা জগজ্জীবকে শিক্ষা দেওয়া শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারের একটি প্রধান কারণ।

নাম-নামীর অভিন্নতা হেতু শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরের নামে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাবেশ পরিপূর্ণরূপে রহিয়াছে। এজন্য এই শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিলে কি অপরাধী কি নিরপরাধ সকলেই তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইবেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু নিম্নমতে শ্রীগৌরনাম-কীর্তনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥
চৈতন্যে-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥"

(শ্রীচৈ: চ: আদি ৮।২১, ২৭)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর উপরোক্ত উক্তি হইতে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার আছে। সুতরাং বহুবার এই শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেও নামাপরাধীর চিত্তবিকারের অভাবে অশ্রু, কম্প, পুলক ইত্যাদি ভাবোদয়ের

চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু সেই অপরাধী ব্যক্তিও শ্রদ্ধাসহকারে মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নাম কীর্তন করিলে তাঁহার পরমোদারতারূপ মহিমার স্মরণে তাহার দেহে পুলক জাত হয় ও নয়ন হইতে অশ্রুগঙ্গার প্রবাহ ছুটে। এইরূপে সে অনায়াসে প্রেমলাভের অধিকারী হইতে পারে। এই শ্রীগৌরনামকীর্তন ব্যতীত ব্রজের মধুর প্রেমলাভ ত' দূরের কথা, রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণভজনের প্রবৃত্তিও জাগিবে না। সুতরাং শ্রীগৌরনাম যে অদ্ভুত মহিমাময় এবং কলিজীবের ব্রজপ্রেমপ্রাপ্তিরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গললাভের একমাত্র হেতু, ইহা উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে জানা যায়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের নিম্ন উক্তিতে শ্রীগৌরভজনের উপাদেয়তা পরিস্ফুট হইয়াছে—

"গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতিরস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর-লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি-অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেমরসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥"

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের উপর্যুক্ত কীর্তনের মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল—যিনি শ্রীগৌরভজন করেন, শুদ্ধভক্তি সম্পর্কে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞানলাভ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা শ্রবণ করিলে হৃদয় নির্মল হয় অর্থাৎ হৃদয় হইতে ভোগমোক্ষবাসনা দূর হয়। শ্রীগৌরনামকীর্তন করিলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের গুণ যাঁহার হৃদয়ে সর্বক্ষণ বিরাজিত থাকে, তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা

স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয় এবং তিনিই ভক্তিলাভের অধিকারী হন। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গিগণকে যিনি নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান করেন তিনি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করেন। যিনি শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমিকে চিন্তামণি জ্ঞান করেন, তাঁহার ব্রজবাস লাভ হয়। যিনি শ্রীগৌরপ্রেমরসার্ণবে নিমগ্ন হন, তিনি শ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গ। তিনি গৃহস্থ হউন বা গৃহত্যাগীই হউন শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতাগুণ অনুভব করিয়া তাঁহার কৃপাকণালাভের আশায় সর্বদা 'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া ব্যাকুল ক্রন্দন করেন। এইরূপ ব্যক্তি যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভের সর্বোত্তম পাত্র, ইহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে কর্মাধিকারীর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণভজন অপেক্ষা শ্রীগৌরভজনেরই উপাদেয়তা অধিক। **শ্রীগৌরভজন করিলে জীব ক্রমশঃ কর্মাধিকার অতিক্রমপূর্বক রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রেমলাভের যোগ্য হইবে।**

শ্রীগৌরসুন্দর জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিবার পর তাঁহারা যে হৃদয়স্পর্শী স্তব করিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীচরণে নিজেদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে পূর্ব পূর্ব সকল অবতার হইতে শ্রীগৌরাবতারের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীজগাই-মাধাই বলিলেন—"হে প্রভো! আমাদের মত দুই পাপীকে উদ্ধার করিবার পর তুমি পূর্ব অবতারে পাপিগণকে উদ্ধার করিয়া যে মহিমার অধিকারী হইয়াছিলে তাহা খর্ব হইয়া গেল। অজামিল 'নারায়ণ-নাম' উচ্চারণ করিয়া চারিজন মহাজন(বিষ্ণুদূত)কে দেখিয়াছিল। কিন্তু আমরা তোমার অঙ্গে রক্তপাত করিয়াও সপার্ষদ তোমার দর্শন পাইলাম। কংস ইত্যাদি দৈত্যগণ সর্বদা ভয়ে তোমার চিন্তা করিয়াছিল, তোমাকে দেখিয়াছিল এবং তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। তবুও তোমার প্রতি দ্রোহরূপ অপরাধের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিল না। সবংশে তোমার হাতে প্রাণবিসর্জন করিল। সাক্ষাৎ তোমাকে দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেও সেই সময়ে কোন মহাজন তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিলেন কী? যে মহাজনগণ আমাদের ছায়া স্পর্শ করিলে গঙ্গাস্নান করিতেন, আমরা তোমার অঙ্গে রক্তপাত করিলেও তাঁহারা এখন মহানন্দে আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছেন। মহাভক্ত গজরাজ তোমার একান্ত শরণাগত হইয়া তোমাকে স্তব করিয়াছিল। তাই তুমি তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলে। অঘ, বক, পূতনা ও কংস ইত্যাদি তোমার হস্তে মৃত্যুবরণ করিবার পর মুক্তিলাভ করিয়াছিল। আমরা যে হস্তে তোমার অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছিলাম এখন তুমি সেই ঘৃণ্য দেহকে

প্রেমপরিপ্লুত করিলে! সুতরাং তোমার এই অদ্ভুত মহিমা তুমি পূর্ব হইতে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলে, এই গৌর অবতারে তাহা ব্যক্ত করিলে।"

শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর সর্বদা বলিতেন—"শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজ স্বরূপে ভোক্তা ও শ্রীগৌরস্বরূপে দাতাশিরোমণি। তিনি চিরকাল হইতে অদত্ত ভক্তিরূপ তাঁহার গুপ্ত সম্পত্তি অকাতরে জীবকুলকে বিতরণ করিয়া তাহাদের বশীভূত হইয়াছিলেন ও তাহাদের নিকট নিজেকে ঋণী বলিয়া অভিমান করিয়াছিলেন। এইহেতু শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা শ্রীগৌরস্বরূপের মাহাত্ম্য অনেক বেশি। যে শ্রীগৌরআনা ঠাকুর শ্রীসীতানাথ (শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু) ও শ্রীগৌরদাতা ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরকে (শ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথকে) অনুক্ষণ চোখের জলে বুক ভাসাইয়া ডাকিবে, অতি শীঘ্রই সে শুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভের অধিকারী হইতে পারিবে।"

তিনি যে কেবল অন্য সকলকে শ্রীগৌরনামকীর্তনের উপদেশ দিতেন, তাহা নহে, নিজেও অনুক্ষণ তাহা কীর্তন করিতেন। শ্রীব্রজধামে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্বরে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাসূচক যেসকল নাম তিনি আর্তস্বরে কীর্তন করিতেন, তাহা শ্রবণ করিলে দুরন্ত অপরাধীর পাষাণ-হৃদয়েও ভক্তিভাব সঞ্চারিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাস্মৃতিতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া তিনি যেরূপভাবে সেইসকল লীলাসূচক নাম কীর্তন করিতেন, তাহা শুনিলে মনে হইত যে সত্যই যেন সেইসব লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি তাহা কীর্তন করিতেছেন।

তাঁর অনুগত ব্যক্তিগণের সঙ্গে যখন তাঁহার দেখা হইত, তখন সকলকে তিনি এই একটি মাত্র উপদেশ দিতেন—"সবসময় চোখের জলে বুক ভাসাইয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গৌরগুণধাম' ও 'শ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ' এই নাম কীর্তন করিবে; তাঁহারা অবশ্যই কৃপা করিবেন।" এই কথা বলিবার সময় তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইত।

তাঁহার এইসব আচরণ হইতে তিনি যে মাদৃশ জন্মান্তরীণ অপরাধী, অনভীপ্সু, কামুক ও অজ্ঞানান্ধকে রাগমার্গরূপ সর্বোচ্চ সোপানে আরূঢ় করাইতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন, তাহা স্পষ্ট অনুমিত হয়। এমন কি তিনি তাঁহার অপ্রকটকালেও এই শ্রীগৌরনামকীর্তনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে সূচিত হইতেছে যে, তিনি অপ্রকটপ্রকাশেও তাঁহার অনুসরণকারী শ্রীগৌরনামাশ্রয়ীর প্রতি কৃপোন্মুখ থাকিয়া তাহাকে রাগানুগভক্তিপথারূঢ় করাইতে ব্যগ্র। সুতরাং শত অযোগ্য হইলেও তাঁহার অনুসরণকারীর চিন্তা করিবার কিছুই নাই। অদোষদর্শী হীনার্থাধিকসাধক সেই মহতের কৃপাবরণ উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হইয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ডাকিতে পারিলে এই জন্মেই প্রেমলাভের পথ উন্মোচিত হইয়া যাইবে।

বিপ্রলম্ভময় তীব্র বৈরাগ্য

তিনি শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিবার পর হইতেই কখনও মিশনের বাহ্য আড়ম্বরের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া সর্বদা গোপনে নিজ ভজনে ব্রতী থাকিতেন। ভজনের ব্যাঘাতক কোন আচরণকে তিনি একদিনের জন্যও প্রশ্রয় দেন নাই। আচার্যপদে অধিষ্ঠিত হইবার পর হইতে তাঁহার পদমর্যাদার পরিবর্তে কোন রকম ভোগ বা প্রতিষ্ঠালাভের বাসনা তাঁহাতে বিন্দুমাত্রও পরিলক্ষিত হয় নাই; বরং বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত থাকিয়া তিনি সর্বদা স্বভজনে তৎপর ছিলেন। ব্রহ্মচারিলীলায় তাঁহার গুরুভ্রাতাগণকে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে ব্যঙ্গ করিয়া অনেকবার বলিতে শোনা গিয়াছে—"তোমাদের কোন্ আশ্রম ? প্রসাদের নামে অন্যাভিলাষী বিষয়ীর প্রদত্ত দ্রব্য সাদরে গ্রহণ করিয়া রাজপ্রাসাদোপম শঙ্খমর্মর-প্রস্তর-গৃহে অবস্থান করিয়া নিজেকে ব্রহ্মচারী বোলাইবার কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে ?" উপরোক্ত প্রশ্ন হইতে তাঁহার বিচারধারা যে কি ছিল, তাহা সুব্যক্ত হইয়া যাইতেছে। তিনি বরং উপবাসে থাকিতে পচ্ছন্দ করিতেন, কিন্তু কখনও প্রসাদের নামে অন্যাভিলাষী বিষয়ীর প্রদত্ত কোন বস্তু স্পর্শ করেন নাই।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর কেবল একখানি বহির্বাস ও উত্তরীয়কে সম্বল করিয়া তিনি একাকী নগ্নপদে ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন বন ভ্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণান্বেষণের যে অদ্ভুত আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রীষড়গোস্বামিগণের বিপ্রলম্ভময় ভজনের স্মৃতি জাগ্রত করিয়া দেয়।

শেষকালে যখন ব্রজে শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমলাল গোস্বামী মহাশয়ের বাগানে থাকিয়া ভজন করিতেন, তখন বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণের প্রদত্ত বহু মূল্যবান্ আসবাবপত্র, কম্বল, সোয়েটার ও শাল প্রভৃতি তিনি অকাতরে অতি গোপনে শ্রীব্রজবাসী বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া দিতেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা সর্বদা বারিপাদার একখানি ডুরে গামছা ছিল তাঁহার বহির্বাস ও আর একখানি গামছা উত্তরীয়। ইহা ব্যতীত তিনি কোন পশমবস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। কখন ইচ্ছা হইলে একখানা সুতীচাদর গায়ে দিতেন। ব্রজের প্রবল শীতের মধ্যেও তিনি কিরূপে কোন পশমী শীতবস্ত্র ব্যবহার না করিয়া থাকিতেন বলিয়া স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে। উত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে, তিনি সর্বক্ষণ বিপ্রলম্ভময় ভজনে এরূপ মগ্ন থাকিতেন যে দেহের প্রতি তাঁহার কোনওরূপ অভিনিবেশ থাকিত না। এরূপ অবস্থায় তিনি কোন্ সময়ে কি বস্ত্র ব্যবহার করিবেন তাহা চিন্তা করিবার অবকাশ ছিল না।

শ্রীগোস্বামিগ্রন্থসেবা

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তিনি কেবল আচরণ করিয়া ভক্তিধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার অনুগত গোস্বামিগণের মধ্যে শক্তি সঞ্চারপূর্বক তিনি তাঁহাদের দ্বারা শুদ্ধভক্তিসম্পর্কীয় রাশি রাশি গ্রন্থ রচনা করাইয়াছেন। প্রকাশন অভাবে সেইসকল গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় হইতেছিল। কেহ কেহ তাহা হইতে কিছু কিছু প্রকাশ করিয়া থাকিলেও তাহা নির্ভুল ছিল না। শ্রীল আচার্যদেব তাঁহার অনুগত বহু বিদ্বান্ সেবকগণকে নিযুক্ত করিয়া ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গচ্ছিত পুঁথি হইতে শুদ্ধ পাঠ সংগ্রহপূর্বক সেইসমস্ত গ্রন্থ (কেবল মূল সংস্কৃত) বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। গোস্বামিগ্রন্থসমূহের শুদ্ধসংস্করণ-প্রকাশনকে তিনি তাঁহার জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অজস্র অর্থব্যয়ে সেইসব গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া পৃথিবীর বহু গ্রন্থাগারকে ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তিবিশেষকে তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন।

অধুনা গোস্বামিগ্রন্থের শুদ্ধসংস্করণ বলিলে সমগ্র পৃথিবীর লোকে শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামীর প্রকাশিত সংস্করণকেই বুঝেন।

তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী—(১) শ্রীমদ্ভাগবত, (২) শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকসূচী, (৩) শ্রীভাবার্থদীপিকা (শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীধর-স্বামিপাদবিরচিত টীকা), (৪) শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত, (৫) শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (৬) শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি (শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিকৃত শ্রীমদানন্দচন্দ্রিকাটীকা সহ), (৭) শ্রীললিতমাধব নাটক, (৮) শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটক, (৯) শ্রীদানকেলিকৌমুদী, (১০) শ্রীনাটকচন্দ্রিকা, (১১) শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশ, (১২) শ্রীহংসদূত, (১৩) শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথিবিধি, (১৪) শ্রীসামান্যবিরুদাবলীলক্ষণ, (১৫) শ্রীস্তবমালা, (১৬) শ্রীপদ্যাবলী, (১৭) শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, (১৮) শ্রীমথুরামাহাত্ম্য, (১৯) শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব, (২০) শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত (দিগ্‌দর্শিনীটীকা সহ), (২১) শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী, (২২) শ্রীহরিভক্তিবিলাস, (২৩) শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, (২৪) শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ, (২৫) শ্রীভগবৎসন্দর্ভ, (২৬) শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ, (২৭) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, (২৮) শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, (২৯) শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ, (৩০) শ্রীভক্তিসন্দর্ভের শ্লোকসূচী, (৩১) শ্রীসর্বসম্বাদিনী, (৩২) শ্রীক্রমসন্দর্ভ, (৩৩) শ্রীব্রহ্মসংহিতা টীকা, (৩৪) শ্রীগোপালতাপনী টীকা, (৩৫) শ্রীযোগসারস্তোত্রটীকা, (৩৬) শ্রীগায়ত্রীব্যাখ্যাবিবৃতি, (৩৭) শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা, (৩৮) শ্রীগোপালচম্পূ, (৩৯) শ্রীমাধবমহোৎসব, (৪০) শ্রীগোপালবিরুদাবলী, (৪১) শ্রীসংকল্পকল্পদ্রুম, (৪২) শ্রীসংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী, (৪৩) শ্রীদানকেলিচিন্তামণি, (৪৪) শ্রীমুক্তাচরিত,

(৪৫) শ্রীস্তবাবলী, (৪৬) সটীক শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভ, (৪৭) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, (৪৮) শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূ (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুরবিরচিত সুখবর্তিনী টীকাসহ), (৪৯) শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী, (৫০) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, (৫১) শ্রীরাধারসসুধানিধি, (৫২) শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত, (৫৩) শ্রীসংগীতমাধব, (৫৪) শ্রীরাসপ্রবন্ধ, (৫৫) শ্রীশ্রুতিস্তুতিব্যাখ্যা, (৫৬) শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত, (৫৭) শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটক, (৫৮) শ্রীমদ্ভাগবতদশমৈকাদশস্কন্ধ (শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীনামক পদ্যানুবাদ সহিত), (৫৯) শ্রীকৃষ্ণবিজয়, (৬০) শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, (৬১) শ্রীহরিভক্তিতত্ত্বসার সংগ্রহ, (৬২) শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ, (৬৩) শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা, (৬৪) শ্রীবৃহৎক্রমসন্দর্ভ, (৬৫) শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারম্।

উক্ত গ্রন্থের মধ্যে (৪-১৮) শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিত, (১৯-২২) শ্রীল-সনাতনগোস্বামিবিরচিত, (২৩-৪২) শ্রীজীবগোস্বামিবিরচিত, (৪৩-৪৫) শ্রীরঘুনাথ-দাসগোস্বামিবিরচিত, (৪৬-৪৯) শ্রীকবিকর্ণপূরগোস্বামিবিরচিত, (৫০-৫৫) শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীবিরচিত, (৫৬) শ্রীনরহরিসরকারঠাকুরবিরচিত, (৫৭) শ্রীরায়-রামানন্দবিরচিত, (৫৯) শ্রীগুণরাজখানবিরচিত, (৬০) শ্রীরঘুনাথভাগবতাচার্যবিরচিত, (৬১) শ্রীপাদ পুরুষোত্তম শর্মা সংকলিত, (৬২) শ্রীরাঘব পণ্ডিত গোস্বামি বিরচিত, (৬৩) শ্রীনাথচক্রবর্তিপাদবিরচিত, (৬৫) শ্রীল পুরীদাস ঠাকুরের স্বরচিত।

এতদ্ব্যতীত তিনি উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ হইতে অধিকাংশের অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা এপর্যন্ত মুদ্রিত হইতে পারে নাই। পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণীর উদ্যমে তন্মধ্য হইতে ৮।১০ খানি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীল আচার্যদেব কিভাবে যে এইসব গ্রন্থের সম্পাদন ও প্রুফ সংশোধনাদি কার্য করিতে পারিলেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠা-বিসর্জনকারী

শ্রীল আচার্যদেবের একটি অত্যাশ্চর্য স্বভাবসিদ্ধ গুণ হইল প্রতিষ্ঠাশূন্যতা। তিনি আচার্য হইবার পর হইতে কখনও কোন সাধারণ সভায় ভাষণ দিতে আগ্রহী হন নাই কিম্বা কোন দিন কোন সংবাদপত্রে তাঁহার ছবি বা তাঁহার বিষয়ে কিছু প্রকাশ করিতে অনুমতি দেন নাই। তাঁহাকে অনেক সময় বলিতে শোনা গিয়াছে—"যেদিন সংবাদপত্রের প্রতিপৃষ্ঠায় আমার নিন্দাসূচক সংবাদ প্রকাশিত হইবে, সেদিন জানিব সত্য সত্যই শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ আমাকে কৃপা করিয়াছেন।"

তিনি আচার্য হইবার সময় একবার মাত্র তাঁহার ফটো তোলা হইয়াছে, তাহাও তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের একান্ত অনুরোধে। সেই হইতেই তাঁহার ফটো তোলা শেষ। ইহা ব্যতীত তাঁহার প্রকটকালে তিনি কখনও তাঁহার ফটো তুলিতে কাহাকেও অনুমতি দেন নাই।

কোথায় তথাকথিত প্রচারকগণের নিজের ছবির সহিত নিজ-কথিত বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য উৎকণ্ঠা, আর কোথায় সংবাদপত্রে নিজের ছবি বা নামগন্ধ প্রকাশনে একান্ত অনিচ্ছা! এই উভয় আচরণের কি তুলনা আছে ? এইরূপ অলৌকিক ও অনন্যসাধারণ আচরণ আজকাল বিরল নহে কী ?

শ্রীল প্রভুপাদ দেশবিদেশে ভক্তিকথা প্রচারের উপর খুব গুরুত্ব দিয়াছিলেন। তিনি ভারতের বাহিরে ইংলণ্ড ও জার্মানী প্রভৃতি দেশে প্রচারের উদ্দেশ্যে মঠবাসী ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণকে পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। প্রতিষ্ঠা ও বিদেশভ্রমণের সুখলাভের উদ্দেশ্যে অনেকে শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত আদেশ অনুযায়ী বিদেশে যাইতে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শ্রীল আচার্যদেব (তদানীন্তন শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী) শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রস্তাবে কোনই আগ্রহ দেখাইলেন না। যাহারা বিদেশে গিয়াছিলেন তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রীল আচার্যদেবের সিদ্ধান্তজ্ঞান যথেষ্ট বেশি ছিল এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রবন্ধাদি লিখাইয়া লইয়া তথায় বক্তৃতা দিয়া তাহারা প্রশংসার পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল আচার্যদেব নিজে বিদেশে যাইবার জন্য বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। প্রতিষ্ঠাকে পদাঘাত করিবার ইহা একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

শ্রীল আচার্যদেব সর্বদা নিজের ভজনে রত থাকিতেন। কোন ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে তিনি সহসা তাঁহার সহিত দেখা করিতেন না। উক্ত ব্যক্তি যতই খ্যাতিসম্পন্ন হউন না কেন খুব নিষ্কপট ভজনপিপাসু না হইলে তিনি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিতেন না।

রাস্তায় যাইবার সময় বা সর্বসাধারণ স্থানে কেহ তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলে তিনি খুব বিরক্তি প্রকাশ করিতেন।

তিনি গ্রন্থ-প্রকাশনের উদ্দেশ্যে বহু লোককে প্রচুর অর্থসাহায্য দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে সকলকে নিষেধ করায় কেহই তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। সকলেরই গ্রন্থের প্রাক্কথনে লিখা আছে—"নিজের নাম-প্রকাশে একান্ত অনিচ্ছুক উত্তর-প্রদেশনিবাসী কোন সজ্জন এত পরিমাণ অর্থ

দিয়া এই গ্রন্থ-প্রকাশের আনুকূল্য করিয়াছেন।” প্রতিষ্ঠালাভের প্রতি তাঁহার কিরূপ বিতৃষ্ণা ছিল, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সেসময় তিনি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে অবস্থান করিতেন। সেই সময় এ বিনীত লেখককে কৃপা করিয়া তিনি শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি যেদিন মঠ হইতে বিদায় লইলেন, সেইদিন আমি রেলস্টেশনে গিয়াছিলাম। রেলগাড়িতে যখন তাঁহার পদতলে প্রণাম করিলাম, তখন তিনি খুবই বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, আমি বাংলাভাষা বুঝিতে পারিব না, সেই আশঙ্কায় ইংরাজীতে বলিলেন—Am I an exhibit ? Don't make me an exhibit.” অর্থাৎ আমি কি একটি প্রদর্শনীর বস্তু ? আমাকে প্রদর্শনীর বস্তু করিবে না। তাঁহার এইরূপ কথার মর্ম কিছু বুঝিতে না পারিয়া আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর তিনি রাস্তাঘাটে এইরূপ প্রণাম করিয়া লোকের নিকট তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত না করিতেই খুব স্নেহশীল ভাষায় বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। তাঁহার সেই মেঘগম্ভীর স্বর আজও হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হইয়া সতর্ক করাইয়া দিতেছে—“সাবধান! প্রতিষ্ঠাকে সুদূরে বিসর্জন দিয়া নিরন্তর দৈন্যভরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ইষ্টদেবের কৃপাভিক্ষা কর। তাহা হইলে ভক্তিলাভের পথ সুগম হইবে।”

অপ্রাকৃত দৈন্যের মূর্তি

শ্রীল আচার্যদেব অপ্রাকৃত দৈন্যের মূর্তি ছিলেন। তিনি এতসব আলৌকিক কার্য করিলেও একদিনের জন্য তাঁহাকে কাহারও নিকট আত্মশ্লাঘা করিতে শোনা যায় নাই। বরং নিজের ভজন হইল না বলিয়া তিনি সর্বদা ব্যথিত হইতেন এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগকে পত্র দিলে এইরূপভাবে লিখিতেন—“হরিভজন ত' হইল না, এই দুঃসহ জীবনভার বৃথায় বহন করিতেছি। এ লজ্জা কাহার সম্মুখেই বা প্রকাশ করিব ?” তাঁহার পত্রের এই ভাষা হইতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব সহজেই অনুমেয়। এতদ্ব্যতীত ব্যবহার, কথাবার্তা ও চালচলনে সর্বদা তাঁহার অপ্রাকৃত দৈন্যই প্রকাশ পাইত।

তাঁহার সহিত বিরোধ করিয়া যাঁহারা মকদ্দমা করিয়াছিলেন, তাঁহারা যখন তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, তিনি যে কিভাবে তাঁহাদের আদরযত্ন করিয়া নিজের দৈন্যভাব প্রকাশপূর্বক তাঁহাদিগকে সম্মান দিতেন ও অভ্যর্থনা করিতেন, প্রত্যক্ষদর্শিগণই তাহার সাক্ষী। বিরোধিগণ অন্যাভিলাষের বশবর্তী হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিলেও এইরূপ অনন্যসাধারণ আচরণে

মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অন্তরে যথেষ্ট সম্ভ্রমযুক্ত ছিলেন। তাই অনেক সময় তাঁহাদিগকে তাঁহার নিকট আসিয়া সিদ্ধান্ত বিষয়ে আলোচনা করিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার এইরূপ অমানিত্ব ও মানদত্ব এজগতে বিরল।

ব্রাহ্মণগণের মর্যাদাস্থাপন

তিনি সর্বদা ব্রাহ্মণগণকে মর্যাদা দিতেন। মঠে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষালাভ করিলেও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও তিনি শ্রীবিগ্রহ-অর্চন করিতে দিতেন না। আবার কোন ব্রাহ্মণকে দেখিলে বর্ণাশ্রমধর্মের বিধানানুযায়ী তিনি যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং ব্রাহ্মণগণকে সম্মান দিবার জন্য কি গৃহস্থ, কি মঠবাসী সকলকে শিক্ষা দিতেন।

অকপট ভজনপিপাসুর পরম বন্ধু

যে অকপট ভজনপিপাসু, শ্রীল আচার্যদেব তাহাকে খুব স্নেহ করিতেন। সে তাঁহার নিকট কোন পত্র দিলে ফেরৎ ডাকে তাহার উত্তর দিতেন এবং সে কিভাবে সত্য সত্য ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারিবে, সেজন্য প্রত্যেক পত্রে তাহাকে উপদেশও দিতেন। কিন্তু যে কপটী, তিনি তাহাকে দেখামাত্রই গম্ভীর হইয়া যাইতেন ও তাহার সঙ্গে কোন কথা বলিতেন না। সে চিঠি দিলেও তা'র উত্তর দিতেন না। তাই তাহারা তাঁহাকে দোষারোপ করিয়া বলিত—"চিঠি দিলে ত আচার্যদেব উত্তর দেন না।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে সরল, সে ছোট বালক হইলেও তিনি তাহার নিকট ফেরৎ ডাকে উত্তর দিতেন। কেবল তাহাই নহে, কোন শিষ্যের সঙ্গে দেখা হইলে, সে যেখান হইতে আসিয়াছে, তথাকার নিষ্কপট শিষ্যগণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত খবর সংগ্রহ করিতেন ও তাহার মাধ্যমে তাহাদিগকে উপদেশও দিতেন। তিনি যে চিরদিন অকপট ভজনপিপাসুর বন্ধু তাঁহার এতাদৃশ আচরণই তাহার প্রমাণ।

পার্থিব যোগ্যতাকে উপেক্ষা ও ভজননিষ্ঠার প্রতি আদর

শ্রীল আচার্যদেবকে কখনও কোন বহির্মুখ প্রাকৃত আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে আদর করিতে দেখা যায় নাই। যে বাস্তবিক হরিভজনপিপাসু সে নিপট মূর্খ ও নিতান্ত দরিদ্র হইলেও তিনি তাহাকে স্নেহ করিতেন, তাহার প্রদত্ত দ্রব্য বা অর্থ আদরসহকারে গ্রহণ করিতেন এবং তাহাকে ভজনোন্নতিকর উপদেশও দিতেন। ভজন করিতে করিতে তাহার কোনপ্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি হইয়া গেলেও তিনি তৎপ্রতি গুরুত্ব না দিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপালাভের জন্য অনুক্ষণ

ক্রন্দন করিতে তাহাকে উপদেশ দিতেন। কিন্তু যাহার ভজনপিপাসা নাই, যে অন্যাভিলাষী, তিনি তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন না। সে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বা পত্র দিলে তাহার উত্তর দিতেন না কিম্বা অর্থ বা কোন দ্রব্য দিলে তাহা ভুলক্রমেও গ্রহণ করিতেন না। কেবল তাহাই নহে, যাহারা সরল, তাহাদিগকে এই অন্যাভিলাষিগণের সঙ্গ হইতে সর্বদা দূরে থাকিতে উপদেশ দিতেন।

গুর্বভিমান খর্বীকরণ

তাঁহার সতীর্থ মঠবাসী অধিকাংশের গুরু হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি তাহা খর্ব করিবার মানসে কাহাকেও শিষ্য করিলেন না। তাঁহাকে যখন্ জিজ্ঞাসা করা হইল যে তিনি এতবড় একটি সম্প্রদায়ের আচার্য হইয়াও শিষ্য করিতেছেন না কেন? তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন—“আমার গুরু হইবার অধিকার নাই। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে যাঁহাদের রতি জাত হইয়াছে, তাঁহারাই গুরু হইবার অধিকারী। আমার তাহা হয় নাই। অতএব আমি গুরু হইবার যোগ্য নহি।” তিনি যে অন্যের গুর্বভিমান খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে দৈন্য করিয়া ইহা বলিতেন, একথা অনেকে বুঝিতে পারিলেন না। তাই তাহারা তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্য গুরু গ্রহণ করিলন। তাহাদের কি বিচার করা উচিত ছিল না যে, নিজেকে এইরূপ অযোগ্য বলিয়া যিনি অনুভব করিতে পারিতেছেন তিনি কত মহান্!

যে সত্য সত্য নিষ্কপট, শ্রীল আচার্যদেব তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্বক্ষণ তাহার ভজনোন্নতি বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

পরবর্তিকালে দেখা গেল যে মুষ্টিমেয় কয়েক জন ব্যতীত গুর্বভিমানী অন্য সকলেই তাহাদের অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার মানসে গুরু সাজিয়া হাজার হাজার শিষ্য করিয়া প্রচুর অর্থ ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হইয়াছে। তাহাদিগকে এই বিপথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি দৈন্যপূর্বক নিজের গুরু হইবার যোগ্যতা নাই বলিয়া বলিতেন। কিন্তু তাঁহার এই দৈন্যোক্তির মর্ম তাহারা বুঝিতে না পারিয়া বঞ্চিত হইয়া গেল।

শাস্ত্রসম্মত আচরণ

শ্রীল আচার্যদেবের প্রত্যেকটি আচরণ শাস্ত্রসম্মত। তাঁহার কোন একটি আচরণ অশাস্ত্রীয়, এইরূপ বলিবার সাহস কাহারও নাই, এমনকি তাঁহার শত্রুরও নাই। আচার্য হইবার পূর্ব হইতেই শাস্ত্রীয় আচরণের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা সর্বদা

পরিলক্ষিত হইত। সেইজন্য অন্যাভিলাষিগণ তাঁহাকে যমের মত ভয় করিত। তিনি মিশনের দায়িত্বে থাকা কালে মিশনে যাহা কিছু নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছেন, প্রথমে শাস্ত্রোক্তিদ্বারা সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া তারপর তাহা করাইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ, পূর্বে মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণ ত্রিকচ্ছ কষায়বস্ত্র পরিধান করিতেন। তিনি শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা ইহাকে অশাস্ত্রীয় সিদ্ধ করিয়া কৌপীন ও বহির্বাসের প্রচলন করাইলেন। পূর্বে মিশনে সকলে বস্ত্রাবৃত দেহে শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিতেন। ইহা যে সেবাপরাধ, তাহা শ্রীল আচার্যদেব শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া দেখাইয়া দিলেন এবং 'গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত আগে পেটাঙ্গি উতার'—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই শিক্ষার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অনাবৃত দেহে দণ্ডবৎপ্রণাম করিতে সকলকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। পূর্বে মঠে অসংখ্যাত শ্রীমহামন্ত্র কীর্তন করা হইত। তিনি শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া তাহা বন্ধ করিলেন। সেই উদ্দেশ্যে 'শ্রীমহামন্ত্র' নামক একখানি পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রসাদের নামে বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ না করিতে তিনি সাধনানুরাগী সকলকে উপদেশ দিয়াছেন। বৈষ্ণববেশধারিমাত্রে সকলকে সম্মান করিতে নিজে আচরণপূর্বক শিক্ষা দিয়াছেন। যেকোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের কীর্তিত শ্রীহরিনামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে তিনি শিক্ষা দিয়াছেন। গোস্বামিবংশীয়গণের প্রতি সম্মানদান বিষয়ে এবং সাধারণ শ্রীবিগ্রহ হইতে স্বয়ম্ভূ ও মহৎপ্রকটিত শ্রীবিগ্রহের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে তিনি শিক্ষা দিয়াছেন। সর্বোপরি ইষ্টস্মৃতিহীন শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তিসাধনের পরিবর্তে ভক্তির প্রাণস্বরূপ শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানে সর্বক্ষণ আবিষ্ট থাকিতে তিনি সকলকে নির্দেশ দিয়াছেন। এইভাবে তিনি বহু সংস্কার করিয়াছেন। তিনি কখনও তাঁহার মন হইতে কোন নিয়ম প্রবর্তন করেন নাই; যখন যাহা করিয়াছেন বা করিতে বলিয়াছেন তাহার পূর্বে তৎসম্পর্কে অবশ্যই শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়াছেন। এইরূপ একনিষ্ঠভাবে শাস্ত্রানুশাসনে চালিত ব্যক্তি এযুগে বিরল।

অপ্রকট-লীলা

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের দোলপূর্ণিমার কিছু দিন আগের কথা। তাঁহার কোন এক শিষ্য বৃন্দাবনে (১১নং ছিপিগলিতে) পরমারাধ্যা শ্রীমাতাঠাকুরাণীর নামে একখানি পুরাতন ঘর কিনিয়া দিলেন। শ্রীল আচার্যদেব নির্দেশ দিলেন যে দোলপূর্ণিমার পূর্বে যেন এই ঘর মেরামতের কার্য শেষ হয়। তাঁহার আদেশানুসারে দিনরাত কার্য করিয়া দোলপূর্ণিমার পূর্বেই উহা শেষ করা হইল। তিনি যে কেন এইরূপ আদেশ দিলেন তাহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। দোলপূর্ণিমা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি। সে দিন ত' উপবাস। ঐ দিন হইতেই তিনি সামান্য জ্বরে পীড়িত হইবার অভিনয় করিয়া কোন খাদ্য গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু অনুক্ষণ নাম কীর্তন করিতেন। একদিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন গেল। কোন খাদ্য গ্রহণ করিতে সকলের অনুরোধ কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইল। কে জানিত তাঁহার মনে কি আছে!

প্রতিপদের দিন শ্রীমাতাঠাকুরাণীকে ডাকিয়া বলিলেন—"ফটো তুলিতে বলেছিলে না? চল, আজ মথুরা গিয়া ফটো তুলিব।" বিবাহলীলা করিবার পর হইতে দু'জনের ফটো তোলার জন্য শ্রীমাতাঠাকুরাণী বহুবার শ্রীল আচার্যদেবকে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি শুনিয়াও না শোনার মত গম্ভীর হইয়া যাইতেন। সেইজন্য তাঁহার বোধ হয় ফটো তুলিবার ইচ্ছা নাই জানিয়া মাতাঠাকুরাণী ভয়ে আর কিছু বলিতেন না। তিনি ত' জানিতেন তিনি চলিয়া যাইবেন, তাই ফটো তুলিতে মাতাঠাকুরাণীকে সেদিন বলিলেন। মাতাঠাকুরাণী বলিলেন—"বর্তমানে ত শরীর অসুস্থ। এইরূপ অবস্থায় কিরূপে ফটো তুলিতে যাইবেন? শরীর ভাল হউক যাইব।" এ কথা শুনিয়া শ্রীল আচার্যদেব বলিলেন—"শরীর ভাল হ'লে, তুমি যাবে! ঠিক আছে।" এইটুকু বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। তাঁহার এই উত্তরে অবশ্য শ্রীমাতাঠাকুরাণীর মনে একটু খটকা লাগিল। তিনি কি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন যে এতশীঘ্র শ্রীল আচার্যদেব চলিয়া যাইবেন।*

চতুর্থীর দিন তাঁহার নিকট যে কয়েকজন সেবক ছিলেন, তাহাদিগকে ডাকিয়া নিকটে বসাইয়া বলিলেন—"আমার আর সময় নাই। সকলকে বলিয়া দিবে, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গৌরগুণধাম' ও 'শ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ'—এই নাম চোখের জলে বুক ভাসাইয়া কীর্তন করিবে।" এইটুকু বলার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া দুই চক্ষু হইতে দুই ধার অশ্রু গড়াইয়া "জয় নিতাইগৌরসীতানাথ, জয় নিতাইগৌরসীতানাথ" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার অনুগত সম্প্রদায়কে শোকসাগরে ভাসাইয়া মর্ত্যলীলা সমাপনপূর্বক নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। তথায় উপস্থিত শিষ্যগণ শ্রীরাধাকুণ্ডে তাঁহার সমাধি দিলেন।

---

* ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ ২০ তারিখে শ্রীল আচার্যদেবের তিরোভাব উৎসব শ্রীধাম বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেসময়ে শ্রীল আচার্যদেবের আলেখ্যের কথা উঠায় শ্রীমাতাঠাকুরাণী কাঁদিতে কাঁদিতে উপরোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছিলেন।

সেসময় এ বিনীত লেখক কটকস্থ গোস্বামী প্রেসে অবস্থান করিতেছিল। তাঁহার অপ্রকটের ৬।৭ দিনের পর এক দিন ঐ সংবাদ জানাইয়া শ্রীব্রজসুন্দর দাসজীর* হাতের লেখা একটি পোষ্টকার্ড় পোষ্টম্যান্ হাতে ধরিয়া অফিসে প্রবেশ করিল। তখন শ্রীহরিগোপালজী, শ্রীমুরলীধরজী ও আমি প্রেস অফিসে বসিয়াছিলাম। ৪।৫ মিটার দূর হইতে চিঠিটি দেখিয়া হঠাৎ আমার হৃদয়ে একটা ধাক্কা লাগিল। আমি সঙ্গে সঙ্গেই মনে করিলাম "আচার্যদেব কি অপ্রকট হইয়া গেলেন!" কেন যে মনে এইরূপ ধারণা জন্মিল, তাহার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। কারণ তখন পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন বলিয়াই জানিতাম। পরে পত্র পাঠ করিয়া মস্তকে বজ্রপাত হইল। তিনি এত শীঘ্র আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা আমরা কেহই ধারণা করিতে পারি নাই। পত্র না পড়িয়াও তিনি অপ্রকট হইয়া গেলেন বলিয়া আমার মনে যে ধারণা জাত হইল, ইহা তাঁহারই অহৈতুকী কৃপার প্রভাব। তিনি যে কিরূপ অনুগতবৎসল তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত কৃপাই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধন্য করুণার মূর্তি প্রণতকরুণ শ্রীগুরুদেব! অপ্রকটের পরও অনুগতবর্গকে যেকোনপ্রকারে তোমার পাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য তোমার কি দুর্দমনীয় পিপাসা! কোন্ কৃতঘ্ন শিষ্য এইরূপ কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দি স্নেহশীল হীনার্থাধিকসাধক শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ত্যাগ করিতে পারে!

তিনি আপাততঃ এ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেও যাহারা তাঁহার অনুগত, তাহাদের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি সর্বক্ষণ রহিয়াছে। তিনি অপ্রকটপ্রকাশেও নিত্য বিরাজমান থাকিয়া তাঁহার অনুগামিদের প্রতি অজস্র কৃপাবর্ষণ করিতেছেন। তিনি হ্লাদিনীশক্তির দূত। প্রকট ও অপ্রকট উভয় অবস্থায় তিনি নিত্য। এখনও যে তাঁহার অনুসরণ করিবে, সে তাঁহার কৃপাইঙ্গিত লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইবে।

তিনি অপ্রকট হইয়া গেলেও তাঁহার বীর্যবতী বাণী এই জগৎ হইতে অপ্রকট হয় নাই। সেই বাণী তাঁহার প্রত্যেক অকপট অনুগামীর কর্ণকুহরে অনুক্ষণ ঝঙ্কৃত হইয়া "সে যে আশ্রয়হীন হয় নাই, বন্ধুহীন হয় নাই, এখনও তাঁহার অনুসরণ করিলে তাঁহাকে পাইবে"—এই চেতনা তাহার হৃদয়ে জাগ্রত করিতেছে।

---

* শ্রীব্রজসুন্দর দাসজী একজন উৎকলবাসী বৈষ্ণব। তিনি তখন শ্রীল আচার্যদেবের নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন।

তাঁহার স্মৃতি প্রতিক্ষণ, প্রতিমুহূর্তে অগ্নিশিখার ন্যায় আমাদের হৃদয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। তিনি যে আদর্শ-আচরণময় চরিত্র আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণের জন্য আমাদের দৃঢ় তীব্র আন্তরিক স্পৃহা জাগ্রত হউক। তাহা হইলেই তিনি অপ্রকটপ্রকাশেও আমাদের প্রতি করুণা করিবেন।

অনন্যসাধারণ উপদেশ ও আচরণ

অন্যাভিলাষী ও অনর্থগ্রস্ত সাধকের ত্রুটি দেখাইয়া দিয়া তাহাকে সাধনপথে অগ্রসর করাইবার জন্য তাঁহার যে কিরূপ ব্যাকুলতা ছিল, তাহা তাঁহার সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের অবিদিত নাই।

তাঁহার উপদেশসমূহকে সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য তিনি যে কিরূপ ব্যাকুল হইতেন এবং তজ্জন্য কিরূপ আকাশপাতাল আলোড়ন করিতেন, তাঁহার নিম্ন উক্তি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

"**সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে সর্বত্র সর্বপাত্রে সর্বস্বদ্বারা ভগবৎসুখচিন্তাই এই অকিঞ্চন শ্রীপুরীদাসের মত। যেকোন দেশে বা বেশে আবদ্ধ থাকা কিম্বা কোন দেশ বা বেশের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা আমার মত নহে। দেশাতীত ও বেশাতীত ভগবদাবেশে অভিনিবিষ্ট হইবার জন্য যে আনুকূল্যময় দৈন্য, যে অশ্রু, যে অনুশীলন, যে ধ্যান, তাহাই আমার মত।** তুমি আচরণের দ্বারা অর্থাৎ হৃদয়ের দ্বারা আমার নিকট পরীক্ষা দিয়া যদি কৃতকার্য হইতে পার, তবে জানিব তুমি শ্রীগৌড়ীয় গুরুবর্গের মত বুঝিতে পারিয়াছ।"

** ** ** ** ** ** **

"তোমার হৃদয়ে কি আত্মধিক্কার বা যথার্থ দৈন্যের উদয় হইয়াছে? অথবা তুমি যাহাকে আত্মধিক্কার বা দৈন্য মনে করিতেছ, সেইগুলি তোমার প্রচ্ছন্ন নিজ শান্তি বা সুখের সন্ধানী সৈন্য? তুমি যে সময় সময় অশ্রুমোচন কর, হয় ত' তাহা নির্জনেও করিতে পার, তাহা কি তোমার নিত্য দেবতার সেবা বা সুখানুসন্ধানের প্রকৃত আর্তিজ্ঞাপক, অথবা নিজ পাপভারাক্রান্ত হৃদয়কে কিছুটা লাঘব করিবার মূলে যে আত্মসুখানুসন্ধিৎসা রহিয়াছে, উহারই অভিব্যক্তিবিশেষ? হয় ত' তুমি নিজেকে নামে রুচিবিশিষ্ট, নামপরায়ণ মনে কর, অন্ততঃ নামের প্রতি তোমার বিতৃষ্ণা নাই, শ্রদ্ধাই আছে—এইরূপ মনে কর, নাম করিতে করিতে একটু শান্তিও পাও, সময় সময় ইহা তোমাকে বেশ ভালও লাগে, হৃদয় যেন আরও নাম করিতে চায়; ইহাকেই কি তুমি

'নামে রুচি' মনে কর ? **'নামে রুচি' কি শ্রীনামপ্রভুর সুখের জন্য, না তোমার সুখশান্তির জন্য ?** শ্রীনামে রুচির অঙ্কুরমাত্রও যাহার হইয়াছে, শ্রীরূপপ্রভু তাহার কি কি লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাও হয় ত' তুমি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছ, কিন্তু তোমার নিজমুখে কথিত 'আমার নাম করিতে ভাল লাগে, নামে আমি বেশ শান্তি পাই, আমি নিয়মিতভাবে নাম করি,' ইত্যাদি অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও তুমি যে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর ঐ আদর্শের নিকট পরীক্ষা দিয়া pass mark রাখিতে পার না। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সুখানুসন্ধানস্মৃতির পরীক্ষা দিবার সময় তোমার সব কপটতা ধরা পড়ে। নিজের দেহগেহ-স্মৃতি, নিজের সুখভোগের স্মৃতি, জাগরণকালে দূরে থাকুক, নিদ্রাকালেও তোমাকে পরিত্যাগ করে না। আহার-নিদ্রার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলে, মর্যাদার কোন লাঘব হইলে তোমার বিন্দুমাত্রও অন্যমনস্কতা আসে না। কিন্তু যত ভুলভ্রান্তি, অন্যমনস্কতা, অরুচি, অশ্রদ্ধা ও শিথিলতা সব যুগপৎ ভগবৎসুখকর কার্যের কালেই আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বাভাবিকভাবে দূরে থাকুক, লাঠি মারিয়া তীব্র শাসন করিয়াও তোমার চিত্তে শ্রীহরিস্মৃতির উদয় সম্ভব হয় না; কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও দেহের কোন সুখকর কার্যের প্রতি বিস্মৃতি দূরে থাকুক, অন্যমনস্কতাও তোমার দেখা যায় না।"

তাঁহার উপরোক্ত উপদেশ অনুশীলন করিলে জানা যায় তিনি কিরূপে তাঁহার সুতীব্র রঞ্জনরশ্মি (x-ray) সদৃশ অপ্রাকৃত দর্শনদ্বারা জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধপঙ্কে নিমজ্জমান, অন্যাভিলাষের উত্তুঙ্গশিখরে আরূঢ় বিমুখ জীবকুলের ত্রুটি প্রদর্শনপূর্বক তাহাদিগকে অকপটভাবে ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানে ব্রতী করাইতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এইরূপ উপদেশ ও আচরণ বর্তমান যুগে বিরল নহে কী ?

কেবল এইটুকুই নয়, অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, বসিয়া ভজন করিবার সময়, প্রসাদ পাইবার সময় বা কাহাকেও হরিকথা বলিবার সময় তিনি মাদৃশ অপরাধী, অনভীপ্সুর কথা চিন্তা করিয়া অজস্র অশ্রুপাতপূর্বক বলিতেন—"হায়! হায়! এতগুলি লোক আসিয়াছিল, একজনও এই শুদ্ধভক্তির কথা ধরিতে পারিল না! কপাল, কপাল!"

কোথায় শিষ্য গুরুর কৃপা পাইতে পারিল না বলিয়া কাঁদিবার কথা, এখানে শ্রীগুরুদেবের কথা শিষ্য গ্রহণ করিতে পারিল না বলিয়া তিনি ব্যথিত হইয়া কাঁদিতেছেন! তাঁহার এই আচরণ হইতে তিনি যে কিরূপ পরদুঃখদুঃখী এবং নিজের সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়া অন্যের মঙ্গলবিধানের জন্য কিরূপ ব্যাকুল

তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অন্যের মঙ্গলবিধানের জন্য তিনি কত যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, নিম্ন উদাহরণ হইতে তাহা জানা যাইবে।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা; এ বিনীত লেখক সেসময় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে অবস্থান করিত। তখন আমার বয়স বিশ বৎসর। হঠাৎ শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে চিঠি আসিল শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা শুনিতে শ্রীমায়াপুরে যাইতে হইবে। তাঁহার কৃপাদেশ পালন করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে যাত্রা করিলাম। বৈশাখ মাস। বেলা একটার সময় শ্রীধাম মায়াপুরে পৌঁছাইয়া শ্রীল আচার্যদেবের দর্শনের জন্য তাঁহার ভজনকুটীরের নিকট গেলাম। তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উঠিতে না উঠিতেই তথায় দণ্ডায়মান জনৈক গুরুভ্রাতা আমাকে শীঘ্র গিয়া প্রসাদ পাইতে বলিলেন। তাহাতে আমি মনে মনে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া ভাবিলাম—"এতদিনের পর আসিয়াছি; শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে কিছু কথা না বলিয়া আগে প্রসাদ পাইতে যাইব ?" আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া উক্ত গুরুভ্রাতা বলিলেন—"আপনি রাগ করিতেছেন কি ? সকলে প্রসাদ পাইবার পর শ্রীল আচার্যদেব প্রসাদ পাইবেন।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কোথায় শিষ্য শ্রীগুরুদেবের অবশেষ পাইবার কথা, অথচ এখানে শিষ্য প্রসাদ পাইবার পর শ্রীগুরুদেব প্রসাদ পাইবেন! যাহাই হউক তাঁহার কথা অনুসারে আমি যথাশীঘ্র গিয়া প্রসাদ পাইলাম। কিছু সময়ের পর দেখিলাম যে, আমি যেখানে প্রসাদ পাইলাম (সর্বসাধারণের প্রসাদ পাইবার প্রকোষ্ঠ), সেই স্থানে শ্রীল আচার্যদেব গেলেন এবং খুব্ কম সময়ের মধ্যে যৎসামান্য প্রসাদ পাইয়া নিজের উচ্ছিষ্টপত্র নিজে উঠাইয়া উচ্ছিষ্টগর্তে নিক্ষেপ করিলেন। তারপর হাত মুখ ধুইয়া তথা হইতে সোজা নাটমন্দিরে পাঠ করিতে গেলেন। তাঁহার সেই কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দী কারুণ্যঘনমূর্ত্তি এখনও চোখের সামনে ভাসিতেছে এবং নিত্যকাল যেন তাঁহার সেই বিমল স্নেহসিক্ত হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পন্থায় অগ্রসর হইতে পারি, তজ্জন্য অন্তরে প্রেরণা দিতেছে। ধন্য সেই করুণাময় প্রভু!

তাঁহার এইরূপ করিবার কারণ পরে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম যে, যাহারা রন্ধন, বাসনমাজা, গোসেবা ইত্যাদিতে নিযুক্ত থাকেন অনেক সময় তাহাদের সেবাকার্য শেষ করিয়া পাঠ শুনিতে বিলম্ব হইয়া যায়। সুতরাং তাহাদিগকে পাঠ শুনিবার সুযোগ দেওয়ার জন্য তিনি জল স্পর্শ না করিয়াও দিবা দুইটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকেন। সকলের প্রসাদ পাওয়া হইয়াছে, এই সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হইলে তিনি প্রসাদ পাইয়া পাঠ করিতে যান।

তিনি তাঁহার নিজের উচ্ছিষ্ট-পত্র নিজে উঠাইবার তাৎপর্য হইল কেহ যেন তাঁহার উচ্ছিষ্ট পাইতে না পারে। সেবিষয়ে তাঁহার এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যে, কেহ তাঁহার উচ্ছিষ্ট নিতে সাহস করিত না। তিনি একসময়ে জানিতে পারিলেন যে, তিনি উচ্ছিষ্টগর্তে নিজের পাতা ফেলিয়া আসিবার পর কেহ কেহ গর্ত মধ্য হইতে তাঁহার উচ্ছিষ্ট লইয়া আসিতেছে। এজন্য তিনি খুব্ দুঃখিত হইয়াছিলেন। তা'র পর হইতে চিঠিবাক্সের মত একটি বাক্স প্রস্তুত করা হইল এবং তার দরজায় তালা ফেলিয়া শ্রীনারায়ণ দাস নামক একজন সেবককে তার চাবি দেওয়া হইল। তাহাকে শপথ করাইয়া বলা হইল যেন তাঁহার উচ্ছিষ্ট কেহ না নিয়ে যায়।

এইরূপ তাঁহার সকল উপদেশ ও আচরণ অনন্যসাধারণ। শিষ্যের মঙ্গলের জন্য এইরূপ অদ্ভুত স্বার্থত্যাগের কথা কেহ কখনও শুনিয়াছেন কী ?

এসম্পর্কে আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীল আচার্যদেব গৃহস্থলীলা করিবার দিন হইতে চার বৎসর পর্যন্ত শ্রীরাধামোহন দাস নামক জনৈক ব্রহ্মচারী (উড়িশ্যাবাসী) তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার কয়েকটি অনুভূতির কথা এ বিনীত লেখকের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একদিন শ্রীল আচার্যদেব শ্রীরাধামোহনজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাকে আমি একটি কথা বলিব, তুমি আমার কথা শুনিবে ত ?

শ্রীরাধামোহনজী—আপনার কথা শুনিব না ত' আর কা'র কথা শুনিব ?

শ্রীল আচার্যদেব—তুমি আমাকে চাও না মিশনকে চাও ?

শ্রীরাধামোহনজী—মিশন বলিতে আমি আপনাকেই বুঝি। মিশনের জাঁকজমকে আকৃষ্ট হইয়া ত' আমি আসি নাই; আপনার শ্রীপাদপদ্মই মাদৃশ অধমকে এখানে আকৃষ্ট করিয়া আনিয়াছে।

শ্রীল আচার্যদেব—দেখ রাধামোহন! তুমি যদি সত্য সত্যই আমার নিকটে আসিয়াছ, তবে আমি বলিব তুমি বাড়ী গিয়া গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিয়া থাক।

শ্রীরাধামোহন জী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—প্রভো ! আমার ন্যায় অধমকে পরীক্ষা করিয়া আপনার লাভ কি ?

শ্রীল আচার্যদেব—না না, তুমি আমায় ভুল বুঝিও না। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতেছি না। আচ্ছা বল দেখি তোমার কি নিবৃত্তিমার্গে অধিকার হইয়াছে ? যদি হইয়া থাকে, তবে তুমি জনবসতি ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে চলিয়া যাও।

শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করিয়া থাক। তিনি অযাচিতভাবে শাকপত্র যাহা দিবেন, তাহাতেই উদরনিষ্পত্তি করিয়া অনুক্ষণ "হা গৌরনিতাই!" বলিয়া কাঁদ। যদি তাহা না হইয়াছে, তবে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী ক্রমপন্থায় অর্থাৎ স্বভাববিহিত পন্থায় বিবাহাদি করিয়া গৃহস্থাশ্রম স্বীকারপূর্বক অন্য কোন ব্যক্তির ধন গ্রহণ না করিয়া স্বোপার্জিত শুক্লবিত্তদ্বারা শাকান্ন যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেই জীবনধারণ কর। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণু অন্তর্যামিরূপে আছেন—এই বিচারে প্রত্যেক জীবকে আদর ও অতিথি প্রভৃতির চর্চাদ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য চেষ্টাযুক্ত হইয়া সর্বদা "হা গৌরনিতাই!" বলিয়া কাঁদ। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই কৃপা করিবেন।

শ্রীরাধামোহনজী—সব হইবে, কিন্তু আপনার সেবা কি আর পাওয়া যাইবে ?

শ্রীল আচার্যদেব—বল কী ? "ভজ গৌরাঙ্গ, স্মর গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই ত আমার প্রাণ রে॥" তুমি যদি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে আশ্রয় করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি যেখানেই থাক না কেন আমি তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। তুমি আমাকে ছাড়িয়া দিতে পার, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি কিন্তু কখনও তোমাকে ছাড়িতে পারিব না, ছাড়িতে পারিব না। তুমি কি মনে করিতেছ তোমাকে আমি বাড়ীতে পাঠাইতেছি তুমি সেখানে ভজন করিয়া বৈষ্ণব হইয়া যাইবে বলিয়া? না, তোমাকে কেবল অপরাধ হইতে বাঁচাইবার জন্য বাড়ীতে পাঠাইতেছি। দেখিলে ত' কত লোক মঠবাস করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু শেষে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হইয়া গেল। সেই অপরাধ হইতে তোমাকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে মিশন ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে যাইতে বলিতেছি। তুমি বলিতে পার যে, ইঁহারা ত' ভজন করিতে আসিয়াছিলেন, অপরাধ করিলেন কেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছি যে ইহারা কর্মাধিকারী হইয়াও স্বভাববিহিত পন্থায় কর্মার্পণ না করিয়া ক্রম উল্লঙ্ঘনপূর্বক ভক্তিমার্গের আশ্রয় নিল। এই অধিকারে রজস্তমোগুণের প্রাবল্য হেতু অনুষ্ঠিত ভক্তি রাজসী ও তামসীরূপ সকামা ভক্তিতেই পরিণত হইয়া যায়। ফলে দৈন্যের পরিবর্তে দম্ভবৃদ্ধিই সার হয়। সেই দম্ভের বশবর্তী হইয়া ইহারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিয়া ভক্তিপথচ্যুত হইয়া গেল। পরিণামে প্রত্যেকে ভক্তির ছলনায় গুরু সাজিয়া কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার কিঙ্কর হইল। তুমি তাহাদের সঙ্গে থাকিলে পরম্পরাক্রমে উক্ত অপরাধের

ভাগী হইবে। তাই তোমাকে সেই অপরাধ হইতে বাঁচাইবার জন্য বাড়ী পাঠাইতেছি। নিষ্কপট ও নিরপরাধ হইলে নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা পাইবে।

সব সময়ে শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি পাঠ করিবে ও "হা গৌরনিতাই!" বলিয়া কাঁদিবে। তাঁহারা অবশ্যই কৃপা করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। গুরুবৈষ্ণবের কথা দূরে থাকুক, কোন সাধারণ জীবেরও সমালোচনা করিবে না; করিলে শ্রীভগবানের চরণে অপরাধী হইয়া যাইবে। কারণ শ্রীভগবান্ প্রত্যেক জীবহৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন। নিজেকে সর্বদা দীনহীন কাঙ্গাল জ্ঞান করিবে এবং "আমার জীবন সদা পাপে রত" সর্বদা হৃদয়ের ভাবের সহিত মিলাইয়া এই কীর্তন করিবে। কাহারও দোষ দেখিবে না। তাহাদের দোষের কথা শ্রীগৌরসুন্দর বুঝিবেন। আমার তাহাতে মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। কাহারও সঙ্গ না করিয়া একমাত্র নিত্যপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিবে।

তোমার অনেক বিপদ আসিতে পারে। তাহাতে একটুও বিচলিত হইবে না। শ্রীভগবানের রাজ্যে যাইতে হইলে এক একটি বিপদ হইল এক একটি সোপান। প্রাণ খুলিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইলে তিনি সমস্ত বিপদ হইতে অবশ্যই রক্ষা করিবেন।

পরের দ্রব্য কখনই গ্রহণ করিবে না। কাহারও নিকট ঋণী হইবে না। ঋণগ্রস্ত হইলে ঋণ শোধ করিবার জন্য আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীভাগবতধর্মের রাস্তা অতি প্রশস্ত; ইহাতে স্খলনপতনের সম্ভাবনা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৩৫ এ বলা হইয়াছে—

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥

পতনের দু'টি রাস্তা—(১) বৈষ্ণব-অপরাধ (২) পরদ্রব্য-গ্রহণ। জীব ভক্তিসাধন করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পরজন্মে আবার ঐ স্থান হইতেই সাধন আরম্ভ করিবে। কিন্তু অন্যের নিকট ঋণী হইলে ভক্তিসাধন সেইখানেই স্থগিত থাকিবে ও তাহার ঋণ শোধ করিতে তাহাকে তদনুযায়ী তথায় জন্ম লইতে হইবে। তাই সাবধান!

এইপ্রকার সান্ত্বনা ও উপদেশ দিয়া শ্রীল আচার্যদেব শ্রীরাধামোহন জীকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। সেসময়ে একমাত্র তিনিই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনিও শ্রীল আচার্যদেবের মন জানিয়া খুব যত্নসহকারে তাঁহার সেবা করিতেন। এইরূপ অবস্থায় তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়ায় অবশ্যই তাঁহার সেবায় ঘোর

অসুবিধা সৃষ্টি হইল। তিনি সেবকের মঙ্গলের জন্য নিজে উক্ত অসুবিধা বরণ করিয়াও তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। নিজ-স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে তিনি তাহাকে বাড়ীতে পাঠাইতে পারিতেন না।

এইরূপে অনুগতগণের মঙ্গলের জন্য তাঁহার স্বার্থত্যাগের বহু উদাহরণ আছে। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে তাহা এখানে বর্ণিত হইল না।

তাঁহার অলৌকিক আচরণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে শ্রীরাধামোহনজীর উক্তি নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

অধিকাংশ সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণাবেশে আবিষ্ট থাকিতেন। তিনি যেসময় আবেশে থাকিতেন তাঁহার বাহিরের চালচলন হইতে তাহা জানা যাইত। তিনি আবেশে থাকাকালে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে তাঁহার নিকট গেলে তিনি বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতেন। সেই আবেশে তিনি কখনও আর্তস্বরে কীর্তন করিয়া চক্ষুর জলে বক্ষ সিক্ত করিতেন, কখনও একাকী নৃত্য করিতেন, কখনও বাৎসল্যভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীবালগোপালকে হিতোপদেশ দিতেন ও কখনও মৌনাবলম্বন করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিতেন।

তিনি বাৎসল্যভাবে বিভাবিত হইয়া কিপ্রকার আচরণ করিতেন নিম্নে তা'র একটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

একদিন রাত্রি দুইটার সময় উঠিয়া নিম্নলিখিত গানটি গাইতেছিলেন—

মাখন চোরী ছোড় কহ্নৈয়া মৈঁ সমুঝাঙ্গী তোয়
কহ্নৈয়া মৈঁ সমুঝাঙ্গী তোয় কহ্নৈয়া মৈঁ সমুঝাঙ্গী তোয়।
মাখন চোরী ছোড় দো
নন্দরাজা কা নবলখ গায় নিতদিন মাখন হোয়
কহ্নৈয়া নিতদিন মাখন হোয়।
মাখন চোরী ছোড় দো
মাখন চোরী ছোড় কহ্নৈয়া মৈঁ সমুঝাঙ্গী তোয়॥

এই গানটি গাইবার পর মা ছেলেকে বুঝাইবার ন্যায় একাকী মনে মনে বলিতেছিলেন—"কহ্নৈয়ালাল! তুমি ত নন্দরাজার একটি মাত্র ছেলে। তোমার কি অভাব হয়েছে? তুমি কেন চুরি করিতেছ বল দেখি? যে নন্দরাজার নয় লাখ গাঈ; দুধ, দই, মাখনে যাঁহার বাড়ী ভাসিতেছে; তাঁ'র ছেলে হয়ে তোমার চুরি করা কি শোভা পাইতেছে? যা করেছ, করেছ; আর করিও না। আমি তোমাকে বারম্বার বুঝাইয়া বলিতেছি আর চুরি করিও না।"

তাঁহার এইসব কথা যে দূর হইতে শুনিবে, তিনি যে একাকী ভাবাবেশে এইরূপ বলিতেছেন, এ কথা সে কখনই বিশ্বাস করিতে পারিবে না। সে মনে করিবে সত্যই যেন তিনি একটি ছোট বালককে বুঝাইতেছেন।

অন্য একদিন সেইরূপ শবরীর শ্রীরামচন্দ্রকে সুমিষ্ট ফল চাখিয়া চাখিয়া দেওয়া সম্পর্কীয় গান গাহিয়া নাচিতেছিলেন ও শবরী শ্রীরামচন্দ্রকে ডাকিয়া বলার ন্যায় বলিতেছিলেন—"হে রাম! এই ফলগুলি আমি চেখে চেখে তোমার জন্য রেখেছি। এগুলি খুব মিষ্টি। তুমি খাওত' দেখি!"

আর একবার রাত্রি দুইটার সময় উঠিয়া বলিলেন, "আমি বৃন্দাবনে যাইব।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধামোহনজী বলিলেন—"আপনার পূর্ব হইতে কোন কার্যক্রম (programme) নাই, হঠাৎ এই দারুণ শীতে এই গভীর রাত্রে কি করে বৃন্দাবনে বাহির হইতেছেন ?"

শ্রীল আচার্যদেব—"আরে তোমরা সকলে তো ঠেকায় পড় নাই, এই সমস্ত কথা জানবে কি করে ? এই শীতে এত রাত্রে কেউ কি বাহির হইতে চায় ? আমি কি করিব ? আমাকে তিনি চাবুক মারিয়া উঠাইয়া যাইতে বলিতেছেন।"

শ্রীরাধামোহনজী তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বৃন্দাবন যাত্রার যোগাড় করিয়া দিলেন।

এইরূপে সর্বদা ভাবাবেশে থাকিয়া তিনি কখন যে কি করিতেন ও কি বলিতেন তাহা বোঝা দুষ্কর।

তাঁহার আর একটি অলৌকিক আচরণ এই যে, তিনি কোন দিন কি খাইবেন, কখনই আগে বলিতেন না। কিন্তু প্রসাদ পাইতে বসিয়া সেদিন যাহা রান্না হইয়া থাকে ঠিক ঐ জিনিষই চাহিতেন। তিনি কখনও রান্নাঘরে আসেন না কিম্বা কি রান্না হইয়াছে জানেনও না। কিন্তু হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া যাহা রান্না করাইয়া থাকেন, ঠিক তাহাই চাহিতেন। এইরূপ আচরণ তাঁহার সর্বজ্ঞতার পরিচয় দেয় না কী ?

কে তাঁহাকে কিরূপে দেখিয়াছেন

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ—শ্রীল প্রভুপাদের অগণিত শিষ্য ছিলেন। তিনি সকল শিষ্যকে যেভাবে দেখিতেন, শ্রীল আচার্যদেবকে কখনই সেইভাবে অর্থাৎ সাধারণ শিষ্যভাবে দেখেন নাই। নিম্ন উদাহরণসকল হইতে উহা প্রমাণিত হইবে।

শ্রীল আচার্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া মঠে অবস্থান করিবার কিছুদিন পর শ্রীল প্রভুপাদ একদিন শ্রীল আচার্যদেবকে কৃষ্ণনগরে লইয়া গেলেন এবং তথায় একটি ঘোড়ার গাড়িতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই কার্যে সুখী হইতে না পারিয়া শ্রীল আচার্যদেব তাঁহাকে বলিলেন—"প্রভো! আপনি কি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন? আমি ঐকান্তিকভাবে আপনার শ্রীচরণাশ্রয় করিতে আসিয়াছি। আপনার দ্বারা আমার ব্যাবহারিক বা ব্যক্তিগত সুবিধা করাইয়া লইবার জঘন্যতম দুর্বুদ্ধি যেন আমার না হয়, ইহাই আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি।" মঠে যোগদানের আরম্ভ হইতেই শ্রীল আচার্যদেবের এইপ্রকার নিষ্কপট চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অনুভব করিতে পারিলেন যে, তাঁহার এই নিষ্কপট শিষ্যকে একমাত্র অহৈতুকী সেবা ব্যতীত আর কিছু দিতে চাহিলেও সে তাহা গ্রহণ করিবে না। "দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।"—শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাক্য ইহাঁতে রূপ ধারণ করিয়া নিত্য প্রকাশিত। সেইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সমগ্র প্রকটকালের মধ্যে শ্রীল আচার্যদেবকে কোন জড় স্বার্থদ্বারা বঞ্চনা না করিয়া অপ্রকট হইবার অব্যবহিত পূর্বে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে বহু বৈষ্ণবের উপস্থিতিতে শ্রীরূপরঘুনাথের বাণী প্রচার করিতে ও শ্রীরূপের পদাঙ্কানুসরণে ভক্তিসিদ্ধান্তগ্রন্থাদি প্রকাশনের অধ্যক্ষতা করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, ইহার বহু পূর্ব হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের 'গৌড়ীয়ভাষ্য' রচনাকালে তাহার 'অনন্তগোপাল তথ্যে'র মঙ্গলাচরণে আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁহার আনুগত্যে শ্রীহরিনাম কীর্তনের নিম্ন প্রভূপদেশ দিয়া গিয়াছেন—

"শ্রীরামগোপাল আস্যে **বাসুদেবানন্ত-দাস্যে**
থাকিয়া তো সদা লহ নাম।"

এই উক্তির দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যেক নিষ্কপট ভজনপিপাসু ব্যক্তিকে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের আনুগত্যে থাকিয়া শ্রীহরিনামকীর্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

উপরোক্ত পদ্যের অন্বয় এইপ্রকার হইবে—"বাসুদেবানন্ত-দাস্যে থাকিয়া তো আস্যে সদা শ্রীরামগোপাল নাম লও।" অর্থাৎ শ্রীঅনন্তবাসুদেবের দাস্যে (আনুগত্যে) থাকিয়া আস্যে (মুখে বা জিহ্বায়) সর্বদা 'শ্রীরামগোপাল' নাম কীর্তন কর। এখানে শ্রীঅনন্তবাসুদেবকে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব অর্থ না করিয়া বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবান্ অর্থ করিলে অর্থের কোন সংগতি থাকে না। অতএব

শ্রীঅনন্তবাসুদেবরূপী শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে থাকিয়া শ্রীরামগোপাল নাম কীর্তন করিতে বলা যে শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য, ইহা এখানে স্পষ্ট হইতেছে। এইরূপ উল্লেখের দ্বারা তিনি তাঁহার প্রকটকাল হইতেই শ্রীঅনন্তবাসুদেবকে তাঁহার অধস্তন আচার্যরূপে মনোনীত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে। কোন সময়ে পাছে কোন অন্যাভিলাষী তাঁহার এই উদ্দেশ্যে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, সেই আশঙ্কায় তিনি একথা মুখে বলার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থে লিপিবদ্ধও করিয়া গেলেন। তাঁহার উপরোক্ত কার্য হইতে তিনি শ্রীল আচার্যদেবকে সাধারণ সাধকরূপে না দেখিয়া নিত্যসিদ্ধ পার্ষদরূপেই যে দেখিতেন, ইহা স্পষ্ট হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত তিনি কখনও শ্রীল আচার্যদেবের কোন আচরণে দোষদর্শন করেন নাই; বরং তাঁহার প্রত্যেক আচরণ অনন্যসাধারণ এবং তাহা সকলের অন্বেষণীয়, সেই কথাই সর্বদা বলিয়াছেন। সেইজন্য অনেক সময়ে অনেক ব্যক্তি শ্রীল আচার্যদেবের বিরুদ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অভিযোগ করিতে গিয়া ঘোর লজ্জিত ও অপমানিতই হইয়াছে। নিম্ন উদাহরণ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

একবার "গৌড়ীয়" পত্রিকায় "সেবার খতিয়ান" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত নেমি মহারাজ প্রমুখ মিশনের কয়েক জন খ্যাতনামা ব্যক্তির আচরণে দোষারোপ করিয়া লেখা হইয়াছিল। একদিন শ্রীল প্রভুপাদ বহু ভক্তের সঙ্গে বসিয়াছিলেন, এই সময় শ্রীযুক্ত নেমি মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অভিযোগ করিলেন, "গৌড়ীয় পত্রিকায় 'সেবার খতিয়ান' প্রবন্ধে আমাদিগকে দোষারোপ করিয়া লেখা হইয়াছে।" তার উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—"বাসুদেব যদি সুন্দরানন্দকে (গৌড়ীয় পত্রিকার সংপাদক) দিয়া এইসব কথা লিখাইয়া থাকে, তবে সে ঠিকই করিয়াছে। আমার সম্বন্ধে যদি বাসুদেব সত্য কথা লেখে, তাহা হইলে আমিও অসন্তুষ্ট হইব না। কুঞ্জবাবুর বা আপনাদের যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কি কেহ ছাড়িয়া দিবে? শ্রীল প্রভুপাদ যে শ্রীল আচার্যদেবকে প্রেরণা দিয়া তাঁহার দ্বারা উহাদের সংশোধনের চেষ্টা করিতেন, তাঁহার উক্তি হইতে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। (গৌড়ীয় ১৬শ খণ্ড ১০ম সংখ্যা ১৬৩ পৃষ্ঠা)।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যেক আচরণে অতি প্রাথমিক অবস্থা হইতেই তিনি যে শ্রীল আচার্যদেবের নিত্যসিদ্ধ আচার্যত্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে সহস্রবার শুনিতে

পাওয়া গিয়াছে—"বাসুদেবের ন্যায় আমার কথা আর কেহ বুঝে নাই। তা'র ন্যায় অকপট বৈরাগ্যবান্, নির্মলতম আদর্শচরিত্র ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাশূন্য ব্যক্তি এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত আর কোথায়ও নাই।" এই উদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠানের কি ব্রহ্মচারী, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ সকলকে তাহাদের আত্মমঙ্গলের উদ্দেশ্যে শ্রীল আচার্যদেবের দ্বারা শাসন ও সংশোধন করাইতেন। প্রত্যেকের ঐকান্তিক পারমার্থিক জীবন শ্রীল আচার্যদেবের হস্তে সমর্পণ করিলেই শ্রীল প্রভুপাদ নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হইতেন।

শ্রীল প্রভুপাদ যখন তাঁহার লিখিত কোন প্রবন্ধ কিম্বা শ্রীমদ্ভাগবতের কোন ভাষ্য পাঠ করেন, তখন শ্রীল আচার্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুযায়ী উক্ত বিষয়ের পরিপূরণ ও সংবর্ধন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার এইরূপ অসাধারণ কার্যে শ্রীল প্রভুপাদ খুব আনন্দিত হইয়া বহুবার বলিয়াছেন—"একমাত্র বাসুদেবই আমার অন্তরের উদ্দেশ্য বুঝে।" শ্রীল প্রভুপাদের এই উক্তি হইতে সকলের হৃদ্‌বোধ হইয়াছিল যে, শ্রীল আচার্যদেব না থাকিলে শ্রীল প্রভুপাদের কোন লেখা তাঁহার মনের মত হইতে পারিত না।

শ্রীল প্রভুপাদ অনেক বার বলিয়াছেন যে, তিনি যেসব সিদ্ধান্ত বলিতে চা'ন, তাহা একমাত্র বাসুদেব ব্যতীত আর কেহ ধরিতে পারে না। "সরস্বতী-জয়শ্রী" নামক পুস্তকের বিষয়বস্তু লিখাইবার সময় একদিন এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত যে, বাসুদেব সকলের প্রুফরিডার। তাই সে সকলকে শুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের সমালোচনা করে।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সেসময় শ্রীল প্রভুপাদ দার্জিলিংএ অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় তিনি একটি প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীল আচার্যদেবকে দেখিতে দিলেন। শ্রীল আচার্যদেব উক্ত প্রবন্ধের অনেক স্থানে সংশোধন করিয়া উহা শ্রীল প্রভুপাদকে দিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঐসব সংশোধন দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি, এখন আর সমস্ত কথা গুছাইয়া বলিতে বা লিখিতে পারি না, কিন্তু **একমাত্র বাসুদেবই আমার বক্তব্যসকল ঠিকভাবে গুছাইয়া দিতে পারে ও ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে**।" (গৌড়ীয় ১৬শ খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৯১ পৃষ্ঠা)।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্যদেবকে যে গৌরাশীর্বাদপত্র প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার ইতিহাসে ঐরূপ গৌরাশীর্বাদপত্র

আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। শ্রীল আচার্যদেবের সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের এইসব উক্তি তাঁহার (শ্রীল আচার্যদেবের) নিত্যসিদ্ধ আচার্যত্বের অকাট্য প্রমাণ। যথা—

"সিদ্ধান্তবাণী শ্রুতিসন্নিবিষ্টা কলৌ বিবাদেন প্রচাল্যমানা।
ধর্মং দিশত্যাচরণক্রমেণ যস্মিন্ প্রতিষ্ঠাং ভজতে চিরেণ ॥
সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞং দৃষ্টাদৃষ্টপরীক্ষকম্।
নিষ্ঠিতং পরমে তত্ত্বে যুক্তবৈরাগ্যবিগ্রহম্ ॥
বজ্রাদপি কঠোরত্বমসত্যে সমুপাগতে।
মৃদুত্বং কুসুমাচ্চাপি সত্যসন্ধে সমাশ্রিতে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গগুরুপ্রেষ্ঠং তদভীষ্টপ্রপূরকম্।
হরিপ্রিয়জনৈর্গম্যং ব্রহ্মচর্যপ্রবর্ধকম্ ॥
ভূষয়ন্তং পরাং বিদ্যাং সদানন্দরসাপ্লুতম্।
বৈকুণ্ঠজ্ঞানদীপেন ভাসয়ন্তং দিশো দশ ॥
অনন্তবাসুদেবাখ্যমনন্তগুণমণ্ডিতম্।
শ্রীমন্তং তং সমাসাদ্য স্বাশ্রয়ং পরমোত্তমম্ ॥
লভতাং পরমাং কান্তিং মহামহোপদেশকঃ।
ইত্যেষা মহতী খ্যাতিঃ শ্রীকান্তং কৌস্তুভো যথা ॥"

যে মহাপুরুষ আচরণদ্বারা ধর্ম উপদেশ করিবার ফলে, কলিযুগে বিবাদদ্বারা দোদুল্যমানা শ্রুতিপ্রতিপাদিত সিদ্ধান্তবাণী অচিরে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইল, যিনি সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ব জানেন, যিনি দৃষ্ট ও অদৃষ্টের পরীক্ষক, পরমতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত, যুক্তবৈরাগ্যের মূর্তিমন্ত বিগ্রহ, অসত্য দেখিলে যিনি বজ্র হইতেও কঠোর হন, সত্যসন্ধ ব্যক্তি দেখিলে যিনি কুসুম হইতেও মৃদু হইয়া যান, যিনি শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেষ্ঠ, যিনি প্রকৃষ্টরূপে সেই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অভীষ্ট পূরণ করেন, শ্রীহরির প্রিয়জনগণ যাঁহাকে বুঝিতে পারেন, যিনি প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মচর্য বর্ধন করেন, পরা বিদ্যাকে যিনি বিভূষিত করিতেছেন, যিনি সদানন্দরসে আপ্লুত, ভগবজ্জ্ঞানরূপ প্রদীপের দ্বারা যিনি দশ দিগ উদ্ভাসিত করিতেছেন, সেই অনন্তগুণমণ্ডিত, পরম উত্তম, স্বনিষ্ঠ শ্রীমান্ অনন্তবাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া, কৌস্তুভমণি শ্রীকান্ত ভগবানকে আশ্রয় করিয়া পরম কান্তি লাভ করিবার ন্যায় মহামহোপদেশক মাত্রে পরম কান্তি লাভ করুন। ইহাই মহনীয় প্রশস্তি।

একবার (কলিকাতাস্থ) ১নং উলটাডিঙ্গি জংসন রোড়ে শ্রীগৌড়ীয় মঠে কোন উৎসব উপলক্ষে জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রসাদসেবা করিতেছিলেন। তিনি একজন ভোজনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে মালপোয়া প্রসাদ পরিবেষণ করিবার পর তিনি যখন উহা ভোজন করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীল আচার্যদেব তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পণ্ডিত মহাশয়! আপনি মালপোয়া খাইতেছেন না মালপোয়া আপনাকে খাইতেছে, ইহা বিচার করিবেন। 'পণ্ডিত হইয়া কেন না কর বিচার।' প্রসাদ পাইবার সময় এই বিচারে অধিষ্ঠিত থাকিবার জন্য বৈষ্ণবগণ 'সাধু সাবধান!' বলিয়া গান করিয়া থাকেন।"

শ্রীল আচার্যদেবের এই কথা শুনিয়া ইহার প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না পারিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের অন্তরে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। তিনি বাড়ী ফিরিয়া গিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট একটি সুদীর্ঘ পত্রে লিখিলেন—"আমি শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহোৎসবে গিয়াছিলাম, কিন্তু প্রসাদ সেবনের সময়ে আমি হৃদয়ে খুবই দুঃখ পাইয়াছি। আমি অভাবগ্রস্ত লোক নই; আমি সরকারের নিকট হইতে পেনসন পাই। আমার দুই পুত্র বহু রোজগার করে। আমার গৃহিণীও সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্যনির্মাণে নিপুণা। আমি অনেক মালপোয়া খাইয়াছি। মঠে মালপোয়া খাইতে যাই নাই। কিন্তু আপনার শিষ্য অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ আমাকে বলিলেন—'মালপোয়া আপনি খাইতেছেন না মালপোয়া আপনাকে খাইতেছে ?'—এই কথাতে আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। আমি কি এত লোভী যে আমাকে মালপোয়া খাইয়া ফেলিবে ?"

শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত পত্রটি পাঠ করিয়া উপস্থিত ভক্তগণকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বাসুদেবের বিচার কি জগতের পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিবে ? আমাদের মধ্যেই বা কয়জন আছেন যাহারা বাসুদেবের এইসমস্ত সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারিবে ? কৃষ্ণকৃপা না হইলে এইসব কথা বোঝা দুষ্কর।"

পণ্ডিত মহাশয়কে এইসব কথার মর্ম বুঝাইয়া পত্র লেখা হইল। ভগবৎপ্রসাদকে ভক্ষণ করা যায় না, মাপা যায় না; ভগবৎপ্রসাদ যদি আমাদিগকে ভক্ষণ করে, গ্রাস করে, আত্মসাৎ করে, তবে আমাদের প্রপঞ্চ দূর হইবে, মঙ্গল হইবে। 'প্রসাদ'এর অর্থ 'অনুগ্রহ', 'কৃপা'। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট মহামহাপ্রসাদ। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৬।৪৬) উক্ত হইয়াছে—

"ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥"

নিজেকে ভগবৎপ্রসাদের বা বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের দৃশ্য বা ভোগ্য জ্ঞান করিতে হইবে। দ্রষ্টা বা ভোক্তৃবুদ্ধি হইলে আরও অধিকতর মায়াগ্রস্ত হইতে হইবে।

"ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।"

পণ্ডিত মহাশয়কে এইসব কথা লিখা হইল সত্য, কিন্তু তিনি উক্ত চিঠির মর্ম ঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেন বলিয়া মনে হইল না।

এইভাবে শ্রীল আচার্যদেবের কোনও আচরণে শ্রীল প্রভুপাদ দোষারোপ না করিয়া উহার ভূরি ভূরি প্রশংসাই করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রত্যেক আচরণ যে সকলের আদর্শ, ইহা সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন।

একবার শ্রীল প্রভুপাদ 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' নামক পত্রিকায় প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভক্তগণের প্রশংসাসূচক বিবরণ লিখাইতেছিলেন। শ্রীল আচার্যদেবের ভক্তিসিদ্ধান্তে অদ্বিতীয় পারদর্শিতা, নির্মলতম অনুসরণযোগ্য আদর্শ চরিত্র, জড়প্রতিষ্ঠার প্রতি একান্ত নিঃস্পৃহতা, দুঃসঙ্গবর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অন্যাভিলাষনির্মুক্ত শ্রীরূপানুগভজনে স্বাভাবিক অনুরক্তি ও আদর্শ বৈষ্ণবোচিত যাবতীয় লক্ষণ বর্ণনা করিয়া (শ্রীল আচার্যদেব নিজের প্রশস্তি নিজে লিখিতে অনিচ্ছুক হইবেন ভাবিয়া) শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারীর দ্বারা উক্ত প্রবন্ধটি স্বয়ং লিখাইয়াছিলেন। শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী উক্ত প্রবন্ধটি শ্রীল আচার্যদেবকে দেখাইলে তিনি কৌশলক্রমে ইহাকে হস্তগত করিয়া এইরূপে লুকাইয়া রাখিলেন যেন ইহা কেহ কোনও দিন কোন পত্রিকায় প্রকাশ করিতে না পারে। ইহা লুকাইয়া দিয়া শ্রীল আচার্যদেব বলিলেন—"আমি শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা আমার বিজ্ঞাপন প্রচার করাইয়া তাঁহার দাস্য হইতে যেন বঞ্চিত না হই, তাঁহার শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা। তাঁহার নিত্য শাসিত শিষ্য হওয়ার পরিবর্তে তাঁহার দ্বারা আমার প্রশংসাসূচক গোলামী (?) করাইয়া নেওয়ার পাষণ্ডতা ও দুর্বুদ্ধি যেন স্বপ্নেও আমার উদিত না হয়।"

একথা যখন শ্রীল প্রভুপাদের কানে গেল, তিনি শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন।

এইরূপে শ্রীল আচার্যদেবের প্রত্যেক আচার ও বিচার যে অনন্যসাধারণ, ইহা শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সহিত প্রথম সম্পর্ক হইতেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া কখনও তাঁহার কোন আচরণে দোষ দেখেন নাই এবং তাহার প্রত্যেকটি আচরণ যে সকলের অন্বেষণীয়, ইহা বহুবার সকলকে উপদেশছলে জানাইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদই শ্রীল আচার্যদেবের নিত্যসিদ্ধ আচার্যত্বের কথা জানাইয়া জগদ্‌বাসীকে ধন্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীল আচার্যদেবের মহিমাজ্ঞাপনই শ্রীল প্রভুপাদের জগৎকে একটি অতুলনীয় দান।

শ্রীল আচার্যদেবই যে শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন, এ কথা শ্রীল প্রভুপাদের উল্লিখিত উক্তি হইতে প্রমাণিত হইতেছে। সেইজন্য শ্রীল আচার্যদেব বহুবার তাঁহার সতীর্থ(গুরুভ্রাতা)গণকে বলিতে শুনাগিয়াছে— "তোমাদের প্রভুপাদ ও আমার প্রভুপাদ এক নহেন।" তাঁহার কথার মর্ম ইঁহারা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার চরণে অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছে। কিন্তু একথা যে সম্পূর্ণ সত্য, নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসুমাত্রেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু—শ্রীল নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর পূর্ব নাম ছিল শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল। তিনি রেভেন্‌সা মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের মুখ্য অধ্যাপক ছিলেন। কাঠযোড়ি নদীতে স্নান করিতে যাওয়ার সময় তাঁহার প্রথম বার শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও তাঁহার অনুরোধক্রমে তিনি কটকস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে আসিয়া গৌড়ীয় মঠের সম্পর্কে জানিতে পারিলেন। তাহার পর সেই বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে তিনি কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে গিয়াছিলেন এবং তথায় শ্রীল আচার্যদেবের (সেসময়ে শ্রীঅনন্তবাসুদেব প্রভুর) শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শুনিয়া এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি শরণাগতির মূর্তবিগ্রহরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। সেসময়ে শ্রীল আচার্যদেব ব্রহ্মচারিলীলা করিলেও ইনি তাঁহার নিকট হইতে হরিকথা শুনিবার সপ্তমদিন রাত্রে তাঁহাকে সন্ন্যাসিরূপে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। সেইদিন হইতেই তিনি শ্রীল আচার্যদেবকে নিত্যসিদ্ধ আচার্যরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর যখন শ্রীল আচার্যদেব আচার্যপদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন মিশনের তথাকথিত বহু প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি তাঁহার ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া গৌড়ীয় মিশন ত্যাগ করিলেন। সেই সময় শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু গৌড়ীয় মিশনের সম্পাদক ছিলেন। তিনি কোনও বাধাবিঘ্নে বিচলিত না হইয়া নির্ভীক চিত্তে মিশনের পরিচালনা করিতেন। তিনি শ্রীল আচার্যদেবের শিক্ষায় এইরূপ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার উপদেশসমূহ শরণাগত চিত্তে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে কখনও ভুলেন নাই।

শ্রীল আচার্যদেবের শিক্ষার প্রভাব তাঁহার উপর কিরূপে পড়িয়াছিল, নিম্নোক্ত উদাহরণ হইতে তাহা জানা যাইবে।

শ্রীল আচার্যদেব আচার্য হইবার পর যাহারা অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার বিদ্বেষ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের এক পার্শ্বে থাকিতেন। মঠের কোনও সেবায় সহায়তা না করিলেও শ্রীবিগ্রহকে ভোগ সমর্পণ হওয়ার পর তাঁহারা দৈনিক জোর করিয়া প্রসাদ পাইতেন। তাহাদের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া শ্রীল আচার্যদেবের অনুগত কতিপয় ব্রহ্মচারী শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুর নিকট অভিযোগ করিলেন। শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভু তাহাদিগকে ধীরচিত্তে বুঝাইয়া বলিলেন—"তাহারা যদি প্রসাদ পাইতে চান, তাহাদিগকে সসম্মানে পাইতে দাও। তাহাদের পাওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তোমরা পাইবে। না কুলাইলে চিড়া-মুড়ি যা' থাকে খাইবে, কিন্তু প্রসাদ পাইতে তাহাদিগকে কোন বাধা দিবে না।" শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর এই উপদেশে অভিযোক্তাগণ বিস্মিত হইয়া গেলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য করিলেন। তাঁহার এইপ্রকার উপদেশের তাৎপর্য এই যে, শিষ্যের আচরণ হইতেই গুরুর মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে। ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে প্রত্যেক জীবকে সম্মান দিতে শ্রীল আচার্যদেব ত' সর্বদা শিক্ষা দিতেন, তাই শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার সেই শিক্ষানুসরণে তাহাদিগকে সম্মান করিতে বলিয়াছিলেন।

শ্রীআচার্যপাদপদ্মে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর যে দৃঢ়নিষ্ঠা, যে শরণাগতি ও যে প্রীতি, তাহা প্রত্যেক শিষ্যের অনুসরণীয়।

শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ—শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গৌড়ীয় মিশনের সর্বপ্রথম ও বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী। তিনি পূর্বাশ্রমে শ্রীল আচার্যদেবের সহোদর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। শ্রীল আচার্যদেব সর্বকনিষ্ঠ হিসাবে উভয়ের মধ্যে বয়সের তারতম্যও বহুত ছিল। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীল আচার্যদেবকে কাঁখে-কোলে লইয়া লালনপালন করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি কখনও তাঁহাকে ছোটভাই হিসাবে দেখেন নাই বরং সর্বদা শিক্ষাগুরুরূপে দেখিয়াছেন এবং শিক্ষাগুরুর মর্যাদাও দিয়াছেন। তাঁহার আদেশ ব্যতীত কোন কার্য তিনি করেন নাই।

শ্রীল মহারাজ শ্রীল আচার্যদেবের বাল্যচরিত সম্পর্কে নিম্নমতে বলিয়াছেন—

"শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বাল্যকাল হইতেই মুক্তপুরুষোচিত গুণাবলিতে সর্বক্ষণ ভূষিত। বাল্যকাল হইতে তাঁহার কথাবার্তা, আচারব্যবহার

ও অধ্যয়নাদি যাবতীয় কার্যে আমরা সকলে তাঁহার ভাবী মাহাত্ম্যের সুলক্ষণগুলি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অত্যল্পবয়স হইতেই তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত, শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহে অসাধারণ অধিকার দেখিয়া আমরা সকলে বিস্মিত হইতাম। তিনি নোয়াখালী অন্তর্গত 'হাতীয়া' দ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কারণ আমাদের পিতৃদেব সেই সময়ে রাজকার্য উপলক্ষে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। বর্তমানে ইহা মেঘনা নদীর গর্ভগত। ইঁহার কোষ্ঠী (জন্মপত্রিকা) দেখিয়া জ্যেতির্বিদ্‌গণ বলিয়া ছিলেন যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যেরূপ দ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবালকও সেইরূপ দ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং ইহাঁর দ্বারা ভবিষ্যতে শ্রীব্যাসের কার্য হইবে, ইনি অনেক ভগবদ্ভক্তিবিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করিবেন ও বহু ব্যক্তিকে পরমার্থপথে চালিত করিবেন। *

তাঁহার আবির্ভাবকালে ভাদ্রমাসের ভরা মেঘনার প্লাবনে উদ্‌বেলিত দ্বীপটি গুরু গুরু গর্জনে ও আত্মীয়স্বজনের 'হরিবোল' ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার আবির্ভাবের ছয়মাস পরেই মেঘনা সেই স্থানকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলে। ইনি জননীর অষ্টমগর্ভসম্ভূত। শ্রীহরিসেবাপরায়ণ আত্মীয়স্বজন ইহাঁর নাম 'শ্রীঅনন্তবাস' রাখিয়াছিলেন। অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার নৃত্য ও কীর্তনের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। তিনি কোনদিনই শ্রীভগবন্নৈবেদ্য ব্যতীত অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করিতেন না এবং প্রসাদ পাইবার সময় ও অধ্যয়নের সময় পদ্মাসনে বসিতেন।

তিনি ছাত্রাবস্থায় যাহা একবার পড়িতেন কিম্বা শিক্ষকগণের নিকট শুনিতেন, তাহার একটি শব্দও বিস্মৃত হইতেন না। পঠনীয় বিষয় ব্যতীত শ্রীরামায়ণ ও শ্রীমহাভারতের গল্পগুলি আদ্যপ্রান্ত ধারাবাহিকভাবে অপূর্ব মৌলিকতার সহিত আবৃত্তি করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। কলেজে অধ্যয়নের সময় অদ্বিতীয় শ্রুতিধর বলিয়া অধ্যাপক ও সহপাঠিগণের নিকট তাঁ'র খ্যাতি ছিল। কি স্কুলে, কি কলেজে শিক্ষক ও ছাত্রগণ তাঁহার সুমধুর চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বেচ্ছায় নেতৃপদে বরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন।

---

* প্রকাশযোগ্য এই যে, সেসময় শ্রীল আচার্যদেব কোন গ্রন্থাদি রচনা করেন নাই। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ একথা বলার অনেক দিন পরে শ্রীল আচার্যদেব শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর প্রবর্তিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারে এবং গোস্বামিগ্রন্থ-সম্পাদনে ও মুদ্রণে ব্রতী হইলেন।

কাজেই পারমার্থিক জীবনে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী অপার করুণা-বারিসিঞ্চনে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার অবিস্মৃতি ফুলফলে সুশোভিতা হইয়া দিক্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীল আচার্যদেবের ছাত্রাবস্থায় লিখিত শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের উপাখ্যান-মণ্ডিত প্রবন্ধগুলি আজ রক্ষিত থাকিলে সাহিত্য ভাণ্ডারের অপূর্ব রত্নরূপে বহুমানিত হইত।

আপনারা কৃপা করুন যেন তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবায় আত্মাহুতি প্রদান করিতে পারি।" (গৌড়ীয় ১৬শ খণ্ড ৯ম সংখ্যা ১৪২ পৃষ্ঠা)।

এক দিনের ঘটনা। এ দীন লেখক তখন পুরীর শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ছিল এবং শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজও তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। এইসময় শ্রীল আচার্যদেব তথায় আসিয়া পৌঁছাইলেন এবং কিছুদিন অবস্থান করিলেন। একদিন শ্রীল মহারাজের নামে একটি মনিঅর্ডার আসিয়াছিল। মিশনের নিয়মানুযায়ী মঠরক্ষক ব্যতীত অন্য কাহারও নামে স্বতন্ত্রভাবে টাকাপয়সা আসা উচিত নহে। যদি কখনও আসে তখন সংপৃক্ত ব্যক্তি তাহা নিজে না রাখিয়া মঠরক্ষককে দিয়ে দেন। কিন্তু শ্রীল মহারাজ উক্ত টাকা মঠরক্ষককে না দিয়া নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন। এবিষয়ে বোধহয় কেহ শ্রীল আচার্যদেবের নিকট অভিযোগ করিয়াছিল। ইহার সত্যাসত্য বুঝিতে শ্রীল আচার্যদেব শ্রীল মহারাজকে ডাকাইয়াছিলেন। সেইসময় এ দীন লেখক শ্রীল মহারাজের নিকট বসিয়াছিল। জনৈক ব্রহ্মচারী আসিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আপনাকে আচার্যদেব ডাকিতেছেন।" মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন ?" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"আপনি কাল বোধহয় একটি মনিঅর্ডার রাখিয়াছেন, সেই বিষয়ে মনে হয় কেহ শ্রীল আচার্যদেবের নিকট অভিযোগ করিয়াছে। ঐ বিষয় বুঝিবার জন্য তিনি আপনাকে ডাকাইয়াছেন।"

একথা শুনিয়া শ্রীল মহারাজ অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে আসিয়া শ্রীল আচার্যদেবের নিকট পৌঁছাইলেন। তাঁহার পৌঁছানো মাত্রে শ্রীল আচার্যদেব তাঁহাকে মঠরক্ষকের বিনানুমতিতে স্বতন্ত্রভাবে মনিঅর্ডার টাকা কেন রাখিয়াছেন বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীল মহারাজ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"প্রভো! ভুল হইয়া গিয়াছে। আর কখনও এইরূপ রাখিব না।" এ দৃশ্য দেখিয়া সকলেই নির্বাক এবং সকলের মুখমণ্ডল বিষণ্ন। শ্রীল মহারাজের আচরণ দেখিয়া মনে হইতেছিল সত্যই যেন পুত্র

তাহার পিতার নিকট নিজের দোষের জন্য ক্ষমা চাহিতেছে। সেই দৃশ্য এখনও চোখের সামনে ভাসিতেছে। ছোট ভাই জ্ঞান থাকিলে কি তাঁহার ঐপ্রকার ভাব আসিত ? তাঁহার এই আচরণ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি কখনও তাঁহাকে ছোট ভাই জ্ঞান করেন নাই বরং সব সময়ে শিক্ষাগুরুর মর্যাদা দিয়াছেন।

ইহা তো একদিনের ঘটনা। এইরূপ বহু ঘটনায় শ্রীল মহারাজ শ্রীল আচার্যদেবকে ভাই বুদ্ধি না করিয়া যে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ জ্ঞান করিতেন, ইহা দেখা গিয়াছে। শ্রীল মহারাজের এইসব আচরণ দেখিয়া মঠবাসিগণের অধিকাংশ বহুদিন পর্যন্ত জানিত না যে, শ্রীল মহারাজ শ্রীল আচার্যদেবের সহোদর জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

এ বিনীত লেখক মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে অবস্থানের সময় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বৎসর শ্রীল মহারাজের সেবায় নিযুক্ত ছিল। শ্রীল আচার্যদেবের প্রতি তাঁহার কিরূপ দৃঢ় আনুগত্য তখন হইতেই সে জানিবার সৌভাগ্য পাইয়াছে। অনেক সময় তিনি কোন ভুল করিয়া থাকিলে শ্রীল আচার্যদেব তীব্র শাসন করিয়া তাঁহাকে পত্র দিতেন। সেইসব পত্র তিনি আমাকে পড়িতে দিয়া বলিতেন—'দেখ, আচার্যদেব কি লিখেছেন।' ঐ পত্রেতে তাঁহার উল্লাসের পরিবর্তে যদি দুঃখ হইত বা তাঁহার সম্মান হানি হইল বলিয়া জ্ঞান থাকিত তবে তিনি সেইসব পত্র আমাকে দেখাইতেন কী ? শ্রীল আচার্যদেবের শাসন শ্রীল মহারাজ কিরূপ পরম উল্লাস-সহকারে বরণ করিতেন তাঁহার এই আচরণই তাহা প্রমাণ করিয়া দেয়।

শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ—শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম সন্ন্যাসী। তাঁহার আচরণ অন্য সকলের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। কোনও ভোগলালসা কিম্বা প্রতিষ্ঠাশা হইতে তিনি বহু দূরে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সরল ও নিষ্কপট ছিলেন। শুদ্ধভক্তি-সাধকের অত্যাবশ্যক গুণ—ভগবদাবেশ তাঁহাতে সর্বদা পরিলক্ষিত হইত। তিনি নীরাগ বক্তার জ্বলন্ত উদাহরণ ছিলেন। কোন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কিম্বা শ্রীহরিকথা কীর্তন করিবার সময়ে তাঁহার সময়জ্ঞান থাকিত না। তিনি আবেশে অনর্গল বলিয়া যাইতেন। শ্রোতা কেহ আছেন কি না, সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পাঠ করিতে করিতে আবেশে ঐ দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক বলিতে থাকেন। কতবার কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে এইরূপ হইয়াছে যে তিনি পাঠ করিতে করিতে রাত্রি ১২টারও ঊর্ধ্ব হইয়া যায়। তাঁহার আবেশ ভাঙ্গিবার

উদ্দেশ্যে ১০টা হইতে ২।৩ বার ঘন্টা পেটান হইত। তবুও তিনি অবিচলিত ভাবে বলিয়া যাইতেন, অথচ শ্রোতা কেহ থাকিত না। ক্ষুধায় শ্রোতাগণ ব্যস্ত হইয়া কে কোথায় ঘুমাইয়া থাকিত। শেষে শ্রীল আচার্যদেব আসিয়া তাঁহাকে বলিলে তিনি পাঠ বন্ধ করিতেন।

মাধুকরী ভিক্ষা নির্গুণ। তাহাতে দাতার অস্মিতা (দাতৃ-অভিমান) থাকে না। তাই তাহাতে উদরপোষণ করা ভজনের অনুকূল। স্থূলভিক্ষা ও মাসিক চাঁদায় দাতার অস্মিতা থাকে। অতএব তাহা গ্রহণ করিলে বিষয়ী-দাতার বিষয়াবেশ হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। ফলে চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়া ভজন হইতে চ্যুতি ঘটে। ইহা জানাইয়া শ্রীল আচার্যদেব তাহা বন্ধ করিতে মিশনের কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এইসব অর্থাগমের পন্থা বন্ধ করিয়া দিলে কেবল মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা মিশন চালানো কষ্টকর হইবে মনে করিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহার এই পরামর্শে একমত হইলেন না। 'বিষ্ণু অবশ্যই রক্ষা করিবেন', এইরূপ শরণাগতিভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে তাহারা একান্ত অনিচ্ছুক জানিয়া শ্রীল আচার্যদেব মিশনের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে স্থির করিলেন।

শ্রীল আচার্যদেবের অভিমত জানিবার পর বিষয়ীর অন্নদ্বারা উদরভরণপূর্বক মিশনে থাকা ভক্তির অনুকূল নহে, ইহা শ্রীল সাগর মহারাজের হৃদ্‌বোধ হইল। তাই তিনি মিশন ত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষভাবে থাকিয়া ভজন করিতে চাহিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল এবং শ্রীসারঙ্গমুরারি ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ অপূজিত ও অবহেলিত অবস্থায় থাকার কথা তিনি পূর্ব হইতেই জানিতেন। মিশন ত্যাগ করিয়া জান্নগরে(মামগাছিতে) শ্রীসারঙ্গমুরারি ঠাকুরের জন্মভিটাস্থ ভাঙ্গাঘরে উক্ত বিগ্রহদ্বয়কে স্থাপন করিয়া সেবা করিতে তাঁহার তীব্র বাসনা হইল। তখন তিনি কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেন এবং শ্রীল আচার্যদেবও তথায় ছিলেন। তিনি নিজ অভিপ্রায় শ্রীল আচার্যদেবকে জানাইলেন এবং মিশন ত্যাগ করিয়া জান্নগর যাইতে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সেই সময়ে জান্নগর ঘোর জঙ্গলদ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। সাপ, কাঁকড়াবিছা ও মশা ইত্যাদির উপদ্রবও তথায় প্রবল ছিল। এইরূপ অবস্থায় এত কষ্টে তথায় থাকিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবা করা শ্রীল মহারাজের পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়া শ্রীল আচার্যদেব তাঁহার প্রস্তাবে একমত হইলেন না। কারণ মিশনে তাঁহার ন্যায় সন্ন্যাসিগণের ৩।৪ জন সেবক সব সময় থাকিত। যিনি নিজের কোন কাজ নিজে কখনও করেন নাই, তাঁহার পক্ষে একাকী এত কষ্ট করিয়া

শ্রীবিগ্রহগণের যাবতীয় সেবা করা কিরূপে সম্ভব হইবে ? কিন্তু শ্রীল মহারাজ তাঁহার সিদ্ধান্তে অটল। তিনি ঐদিন হইতে উপবাসী থাকিলেন। তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিয়া তৃতীয়দিন রাত্রি দুইটার সময় শ্রীল আচার্যদেব তাঁহাকে ডাকিয়া মামগাছি যাইতে আদেশ দিলেন এবং সঙ্গে শ্রীজগবন্ধু পাণ্ডা নামক একজন মঠবাসী ব্রহ্মচারীকে লইয়া যাইতে বলিলেন। শ্রীল আচার্যদেবের আদেশে ঐদিন হইতে (১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে) তিনি মিশন ত্যাগ করিয়া অকথনীয় ক্লেশ স্বীকারপূর্বক উক্ত শ্রীবিগ্রহগণের সেবায় আত্মবিস্মৃত রহিলেন।

তাঁহার সেবানিষ্ঠার কথা শুনিয়া শ্রীল আচার্যদেব যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছিলেন এবং আকৃষ্ট হইয়া মাঝে মাঝে তথায় গিয়া অবস্থান করিতেন। তথায় শ্রীল আচার্যদেব শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের বিগ্রহও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উক্ত শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ ও শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালের সঙ্গে অদ্যাবধি পূজিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীল মহারাজ মাত্র তিন বৎসরের কিছু অধিককাল একনিষ্ঠভাবে এই শ্রীবিগ্রহগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া শ্রীজন্মাষ্টমী তিথির মধ্যরাত্রে প্রকটলীলা সাঙ্গ করিলেন। তাঁহার অন্তে শ্রীজগবন্ধুজী অদ্যাবধি উক্ত সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন।

তথায় ঠাকুরের মন্দিরাদি কিছুই ছিল না। একটি ভাঙ্গা টালির ঘরে শ্রীবিগ্রহগণ থাকিতেন। একবার তিনদিন তিনরাত্রি অনবরত বৃষ্টি হইতে লাগিল। চালের টালি ফাটা থাকায় অনবরত জল গড়াইয়া শ্রীবিগ্রহের উপর পড়িত। শ্রীবিগ্রহগণ ভিজিতেছেন দেখিয়া শ্রীল মহারাজ ও শ্রীজগবন্ধুজী বৃষ্টি থামা পর্যন্ত দিবারাত্র ছাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনদিনের পর বৃষ্টি থামিয়া গেল। শ্রীজগবন্ধুজী শ্রীল মহারাজকে বলিলেন—"মহারাজ! গুরুদেবকে একখানা চিঠি দিলে তিনি কোন গৃহস্থভক্তকে বলিয়া ঠাকুরের জন্য একটি ঘর তৈরি করাইয়া দিতেন না ? বৃষ্টিতে ঠাকুর সবসময় ভিজিতেছেন।" একথা শুনিয়া শ্রীল মহারাজ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"গুরুদেব কি মানুষ ? তিনি কি অন্তর্যামী নন ? তাঁ'কে চিঠি দিলে তিনি জানিবেন ?" শ্রীল মহারাজের নিকট হইতে এইটুকু শুনিয়া শ্রীজগবন্ধুজী নীরব রহিলেন। ঠিক এই কথাবার্তা হইবার দুই তিন দিনের পর শ্রীল আচার্যদেব আসিয়া সেখানে হাজির। শ্রীল মহারাজকে দেখামাত্র বলিলেন—"মহারাজ! এ কুকুরটাকে ডাকিলেন কেন ?" তাঁহাকে দেখিয়া মহারাজের আনন্দ আর ধরে না। তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। শ্রীল আচার্যদেব শ্রীল মহারাজের গুরুভ্রাতা হইলেও তিনি সর্বদা তাঁহাকে শিক্ষাগুরুরূপেই দেখিতেন এবং তাঁহার নির্দেশেই চলিতেন।

শ্রীল আচার্যদেব সেই সময়ে গৃহস্থলীলা করিতেন। তিনি বিশ্রাম করিবার সময় শ্রীল মহারাজ তাঁহাকে পাখা করিতেছিলেন। শ্রীল আচার্যদেব বলিলেন—"মহারাজ! আপনি সন্ন্যাসী, আমি একজন গৃহস্থ। আমাকে পাখা করা আপনার পক্ষে নিতান্ত অশোভনীয়।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া শ্রীল মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আপনি ঠকাইবার জন্য কি আর কাহাকেও পাইলেন না ? নিজেকে গৃহস্থ বলিয়া আমাকেও শেষকালে ঠকাইতে চেষ্টা করিতেছেন ?" ইহাতেই শ্রীল আচার্যদেব হার মানিয়া নীরব থাকিলেন। শ্রীল মহারাজের প্রগাঢ় প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া অবস্থানের কোন সুবিধা না থাকিলেও বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্রীল আচার্যদেব তথায় প্রায় দুইমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। "গুণ চিনে গুণী"—এই ন্যায়ানুসারে শ্রীল মহারাজ শ্রীল আচার্যদেবকে ঠিক চিনিয়াছিলেন এবং শ্রীল আচার্যদেবও শ্রীল মহারাজকে ঠিক চিনিয়াছিলেন। হে পরমকরুণাময় বৈষ্ণব ঠাকুর! এ অধমের মস্তকে পাদপদ্ম ধারণপূর্বক কৃপাশীর্বাদ করুন যেন এ অধম আপনার ঐ আদর্শের অনুসরণে শ্রীল আচার্যদেবের স্বরূপ যথাযথ অবগত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মবিক্রয় করিতে পারে।

শ্রীল আচার্যদেব গৃহস্থলীলা করিবার ৩।৪ বৎসর পূর্বেই শ্রীল মহারাজ একদিন তদানীন্তন শ্রীবাসঅঙ্গনের সেবক শ্রীরাধামোহনজীকে শ্রীধামমায়াপুরে গঙ্গার তীরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—"রাধামোহন! এ মঠমিশন এইরূপ থাকিবে না। শ্রীল আচার্যদেব গৃহস্থলীলা করিবেন। যাহারা খুব ভাগ্যবান্ কেবল তাঁহারাই তাঁহার আশ্রয়ে পড়িয়া রহিবেন। অন্য সকলে তাঁহার এই লীলার রহস্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধী হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিবে। তাই এখন হইতেই সাবধান থাক।" শ্রীল আচার্যদেবের গৃহস্থলীলা প্রকাশের পর শ্রীরাধামোহনজী দীর্ঘ চারি বৎসর কাল শ্রীগুরুমাতাঠাকুরাণীর ও শ্রীল আচার্যদেবের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন এবং শ্রীল আচার্যদেবের কৃপাদেশক্রমে অধুনা গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিয়া ভজন করিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে এইসব কথা শুনিয়া লিখিতেছি। তাই ইহা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী, মনগড়া কথা নহে। শ্রীল সাগর মহারাজের সঙ্গে শ্রীল আচার্যদেবের যেসমস্ত লীলা, শ্রীজগবন্ধুজী তাহার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। তাঁহার নিকট হইতে সেসমস্ত কথা শুনিয়া এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। তাই এখানে উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীর উপর আধারিত নিখুঁত সত্য কথা।

উপরোক্ত বিবরণী হইতে শ্রীল সাগর মহারাজ যে ত্রিকালদর্শী ছিলেন, ইহা জানা যায়। সেইসব লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদ জীবন্মুক্ত

শ্রীল আচার্যদেব সেই সময়ে গৃহস্থলীলা করিতেন। তিনি বিশ্রাম করিবার সময় শ্রীল মহারাজ তাঁহাকে পাখা করিতেছিলেন। শ্রীল আচার্যদেব বলিলেন—"মহারাজ! আপনি সন্ন্যাসী, আমি একজন গৃহস্থ। আমাকে পাখা করা আপনার পক্ষে নিতান্ত অশোভনীয়।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া শ্রীল মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আপনি ঠকাইবার জন্য কি আর কাহাকেও পাইলেন না? নিজেকে গৃহস্থ বলিয়া আমাকেও শেষকালে ঠকাইতে চেষ্টা করিতেছেন?" ইহাতেই শ্রীল আচার্যদেব হার মানিয়া নীরব থাকিলেন। শ্রীল মহারাজের প্রগাঢ় প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া অবস্থানের কোন সুবিধা না থাকিলেও বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্রীল আচার্যদেব তথায় প্রায় দুইমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। "গুণ চিনে গুণী"—এই ন্যায়ানুসারে শ্রীল মহারাজ শ্রীল আচার্যদেবকে ঠিক চিনিয়াছিলেন এবং শ্রীল আচার্যদেবও শ্রীল মহারাজকে ঠিক চিনিয়াছিলেন। হে পরমকরুণাময় বৈষ্ণব ঠাকুর! এ অধমের মস্তকে পাদপদ্ম ধারণপূর্বক কৃপাশীর্বাদ করুন যেন এ অধম আপনার ঐ আদর্শের অনুসরণে শ্রীল আচার্যদেবের স্বরূপ যথাযথ অবগত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মবিক্রয় করিতে পারে।

শ্রীল আচার্যদেব গৃহস্থলীলা করিবার ৩।৪ বৎসর পূর্বেই শ্রীল মহারাজ একদিন তদানীন্তন শ্রীবাসঅঙ্গনের সেবক শ্রীরাধামোহনজীকে শ্রীধামমায়াপুরে গঙ্গার তীরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—"রাধামোহন! এ মঠমিশন এইরূপ থাকিবে না। শ্রীল আচার্যদেব গৃহস্থলীলা করিবেন। যাহারা খুব ভাগ্যবান্ কেবল তাঁহারাই তাঁহার আশ্রয়ে পড়িয়া রহিবেন। অন্য সকলে তাঁহার এই লীলার রহস্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধী হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিবে। তাই এখন হইতেই সাবধান থাক।" শ্রীল আচার্যদেবের গৃহস্থলীলা প্রকাশের পর শ্রীরাধামোহনজী দীর্ঘ চারি বৎসর কাল শ্রীগুরুমাতাঠাকুরাণীর ও শ্রীল আচার্যদেবের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন এবং শ্রীল আচার্যদেবের কৃপাদেশক্রমে অধুনা গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিয়া ভজন করিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে এইসব কথা শুনিয়া লিখিতেছি। তাই ইহা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী, মনগড়া কথা নহে। শ্রীল সাগর মহারাজের সঙ্গে শ্রীল আচার্যদেবের যেসমস্ত লীলা, শ্রীজগবন্ধুজী তাহার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। তাঁহার নিকট হইতে সেসমস্ত কথা শুনিয়া এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। তাই এখানে উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীর উপর আধারিত নিখুঁত সত্য কথা।

উপরোক্ত বিবরণী হইতে শ্রীল সাগর মহারাজ যে ত্রিকালদর্শী ছিলেন, ইহা জানা যায়। সেইসব লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদ জীবন্মুক্ত

মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্যদেবের গৃহস্থলীলা প্রকাশের পর মিশনের কতিপয় মঠবাসী ও গৃহস্থ শিষ্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িল। কিন্তু শ্রীল সাগর মহারাজ পূর্ব হইতেই তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসিত্বের কথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতা হইয়াও তাঁহাকে নিজের শিক্ষাগুরুস্থানে তাঁহারই নির্দেশানুযায়ী ভজন করিতেন এবং তাঁহার প্রত্যেকটি উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন।

নিষ্কপট সাধকগণ — বহু ব্যক্তি মিশনে আসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যাদৃচ্ছিকী মহৎকৃপা না থাকিলে যে মহতের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া অসম্ভব, ইহা তাঁহাদের মধ্য হইতে অনেকের আচরণে প্ররিস্ফুট হইয়া গেল। বহু লোক অনেক দিন শ্রীল আচার্যদেবের সান্নিধ্যে থাকিয়া, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শুনিয়া ও তাঁহার অনন্যসাধারণ শাস্ত্রীয় আচরণ দেখিয়াও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিতে পারিল না। নিজেকে উন্নত অধিকারী বিচারে ক্রমপন্থায় না চলিয়া (অর্থাৎ কর্মাধিকারীর প্রতি তাঁহার উপদিষ্ট ভগবদধিষ্ঠানদৃষ্টিতে ভূতাদরপূর্বক কর্মার্পণের ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া) তাঁহার আনুগত্য ত্যাগ করিয়া অন্য গুরু বরণ করিল।

ভক্তি হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি হওয়ায় সেই হ্লাদিনীশক্তির দূত মহতের কৃপা ব্যতীত জীবের শতচেষ্টায়ও তাহা লভ্য নহে। সেইজন্য সর্বদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ডাকিলে তিনি নিশ্চয়ই মহতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া দিবেন। তখন জীব মহতের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সর্বাত্মনিয়োগ করিবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ইহাই একমাত্র পন্থা। এই পন্থার অনুসরণ না করিয়া কেবল মহতের সঙ্গে অবস্থান এবং তাঁহার প্রসঙ্গরূপা ও পরিচর্যারূপা সেবার অভিনয় করিলেও তাঁহার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব নহে। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায়ই যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন পাওয়া যায়, এসম্পর্কে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর নিম্ন উক্তি আলোচ্য।

"দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় — ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত — ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবতদ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তা'র প্রেমে হয় বশ॥"

(শ্রীচৈ: চ: আদি: ১।৫৬-৫৮)

অর্থাৎ শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ এই দুই ভাই বিমুখ জীবের শ্রীকৃষ্ণবিমুখতারূপ অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া ভক্তিপ্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র ও ভক্তিরসের আধার ভক্তভাগবতের বা ভক্তমহতের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন। ভক্তিরসপাত্র অর্থ ভক্তিরসের আধার; অর্থাৎ ভগবান্ তাঁহার ভক্তিরসকে ভক্তরূপ আধারের দ্বারা বিমুখ জগদ্‌বাসীকে বিতরণ করেন। এজন্য তিনি সদনুগ্রহ। অর্থাৎ তাঁহার অনুগ্রহ সাধুকে নিমিত্ত করিয়াই জীবের নিকট পৌঁছায়। এইরূপে ভক্তভাগবতের দ্বারা বিমুখ জীবহৃদয়ে তাঁহার প্রতি প্রীতি জন্মাইয়া প্রীতিরসলোলুপ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরদাতা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার হৃদয়ের সেই প্রীতিরস আস্বাদন করিতে গিয়া মধুলোভে ভ্রমর পদ্মফুলে বন্দী হওয়ার ন্যায় তাহাতেই বন্দী হইয়া যান। অতি ক্ষুদ্র শামুকের মধ্যে সমুদ্রের প্লাবনের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের হৃদয়াধারে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের এই প্রীতিরসপ্লাবনের মহিমা অনির্বচনীয়। এতদ্‌ব্যতীত স্বয়ং পরতত্ত্ব কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুং সমর্থঃ হইয়াও ক্ষুদ্রজীবকে নিজে প্রেম দান করিয়া আবার সেই প্রেমেরই ভিখারী হওয়া তাঁহার মহাবদান্যতারই নিদর্শন। এইরূপ মহান্ দাতা আর কে আছে ? সেইজন্য শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে পরতত্ত্বের সীমা বলিয়া সমস্ত শাস্ত্র ও মহাজনগণ তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন। যে অকপট হৃদয়ে মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের আশ্রয় লইবে সে সর্বসাধনহীন ও অযোগ্যতম হইলেও অনতিবিলম্বে উপযুক্ত রাগানুগ মহতের পদাশ্রয় লাভ করিয়া প্রেমধনের অধিকারী হইতে পারিবে।

যাহারা মহাবদান্য শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপার উপর ভরসা না রাখিয়া শ্রীল আচার্যদেবকে মাপিতে গেল, তাহারা বঞ্চিত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হইতে চ্যুত হইল। কিন্তু যাঁহারা দৈন্যপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শরণাগত হইলেন, তাঁহারা শ্রীল আচার্যদেবের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। বাস্তবিক তাঁহারাই ভাগ্যবান্। কারণ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায়ই শ্রীল আচার্যদেবের সঙ্গে তাঁহাদের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহার বাহ্যদর্শনের সৌভাগ্য লাভ না করিলেও তাঁহার মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। তথাকথিত আনুষ্ঠানিক গুরুকরণের স্পৃহা তাঁহাদিগকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হইতে চ্যুত করিতে পারিল না। অনুগতগণের হৃদয়ে ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান-প্রবৃত্তির উদ্রেককারী শ্রীল আচার্যদেবের আচরণ ও শিক্ষা যে তাঁহাদের একান্ত অনুসরণীয়, ইহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে নিজের নিত্য উপদেষ্টা ও প্রিয়তমজ্ঞানে তাঁহার আনুগত্যে ক্রমপন্থায় সাধন করিতে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার কৃপায়

ভগবদধিষ্ঠানদৃষ্টিতে ভূতাদরপূর্বক কর্মার্পণ করা যে তাঁহাদের অধিকারোচিত সাধন, এই ধারণা তাঁহাদের বলবত্তর হইয়াছে এবং তাঁহারা কিরূপে সর্বতোমুখী চেষ্টার দ্বারা তাঁহার আদেশ পালন করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবেন এই লক্ষ্যে ব্রতী হইয়াছেন।

তাঁহার অনুসরণের চরম ফল

যে কতিপয় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীল আচার্যদেবের অনুসরণ করিয়াছিলেন এই জন্মেই তাঁহারা যে কি অপূর্ব ফল লাভ করিয়াছেন, নিম্ন উদাহরণ হইতে তাহা স্পষ্ট জানা যাইবে।

শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীল আচার্যদেব গৃহস্থলীলা করিবার বহু পূর্ব হইতেই শ্রীল মহারাজ তাঁহার ত্রিকালদর্শিত্বগুণপ্রভাবে ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন এবং কতিপয় স্নিগ্ধ গুরুসেবকের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে ভাবী অপরাধ হইতে বাঁচাইবার প্রযত্ন করিয়াছিলেন। মিশনে থাকা ভজনের অনুকূল হইবে না, ইহা শ্রীল আচার্যদেবের উপদেশ হইতে অবগত হইয়া মিশনত্যাগ বিষয়ে শিক্ষাগুরুজ্ঞানে তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করিলেন। পরিশেষে তাঁহার আদেশে মিশন ত্যাগ করিয়া শ্রীসারঙ্গ-মুরারি-শ্রীপাটে অসহনীয় ক্লেশস্বীকারপূর্বক মহৎপ্রকটিত শ্রীবিগ্রহগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন এবং মিশনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া শেষনিঃশ্বাসপর্যন্ত তাঁহারই একান্ত আনুগত্যে অবস্থানপূর্বক ভজন করিয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীল আচার্যদেবের সহোদর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইয়াও তাঁহাকে শিক্ষাগুরু জানিয়া শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত সর্বতোভাবে তাঁহারই আনুগত্যে ভজন করিয়াছেন।

শ্রীল নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভুও সর্বপ্রথমেই (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রকটকালেই) শ্রীল আচার্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় তাঁহার নিত্যসিদ্ধ আচার্যত্বের প্রতি নিজে আকৃষ্ট হইয়া মিশনের সকলকে আকৃষ্ট করিতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি তাঁ'র যে আনুগত্য, তাহা ভক্তিকামী মাত্রেরই সর্বদা অনুসরণীয়। শ্রীল আচার্যদেবের প্রতি তাঁহার কিরূপ দৃঢ়নিষ্ঠা ছিল, তাঁহার নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী (গৌড়ীয় ১৯শ খণ্ড, ৪৩-৪৪ সংখ্যা, ৬৯১ পৃষ্ঠা) হইতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—"যদি সমস্ত জগৎ তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যদি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ গুণসমূহের বাহ্য প্রকাশকে তিনি সংগোপন করেন, যদি মিশনের সহিত তিনি বাহ্য নিরপেক্ষতা

প্রদর্শন করেন অথবা মিশনের বাহ্য অঙ্গ তাঁহার আনুগত্য না করে, তবুও তাঁহার প্রতি কাহার ব্যক্তিগত টান থাকে, আমি তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছি। সেখানে আমার চিত্ত ও তাঁহার পাদপদ্ম ব্যতীত তৃতীয় বস্তুর অপেক্ষাই নাই।"

পরমারাধ্যা শ্রীমাতাঠাকুরাণীও শ্রীল আচার্যদেবের অপ্রকটের পর তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণের বহু অনুরোধসত্ত্বে তাহাদের নিকট না গিয়া একাকী দীর্ঘ ২৮ বর্ষকাল রুদ্ধদ্বার কক্ষের মধ্যে একান্তভাবে তাঁহার আদর্শের অনুসরণে পড়িয়া রহিলেন।

তাঁহার অনুসরণের ফল কি ইহা উপর্যুক্ত শ্রীগুরুদেবাত্ম বৈষ্ণবগণের অলৌকিক অপ্রকটলীলাই প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। শ্রীল সাগর মহারাজ জন্মাষ্টমী তিথির মধ্যরাত্রে ইষ্টস্মৃতিতে বিভোর থাকিয়া প্রকটলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে কাজী-উদ্ধার-লীলা শ্রবণ করিতে করিতে "হা গৌর!" বলিয়া প্রণাম করিয়াই প্রকটলীলা সাঙ্গ করিলেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুও ইষ্টস্মৃতিতে উৎফুল্ল হইয়া সহর্ষবদনে ইহলীলা সংবরণ করিলেন। পরমারাধ্যা মাতা ঠাকুরাণীও অপ্রকটের অব্যবহিত পূর্বেই শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে শেষ প্রণতি জানাইবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের "প্রণতি" নাম সার্থক করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে চলিয়া গেলেন।

ইঁহাদের এই অলৌকিক নির্যাণ স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দিল যে, যাঁহারা অকপটহৃদয়ে শ্রীল আচার্যদেবের একান্ত অনুসরণ করিবেন, তাঁহাদের অন্তিম গতি এইরূপ অমৃতময়ই হইবে।

সুতরাং যাঁহারা ভাগ্যবান্ তাঁহারা পতনোন্মুখ আধ্যক্ষিকগণের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া উপর্যুক্ত বৈষ্ণব-মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীল আচার্যদেবের প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়া তাঁহার আনুগত্যে পড়িয়া থাকিলে এই জন্মেই যে শুদ্ধভক্তিরত্নলাভের যোগ্য হইবেন, ইহা নিঃসন্দেহ।

তাঁহার সম্বন্ধে আরও কতিপয় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ডোগ্রা—শ্রীডোগ্রার ঠিকানা—গ্রাম: শান্তিপুর, পোষ্ট: মেছেদা, জিলা: মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ। তিনি শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্র ছিলেন। তথা হইতে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে আই. এ. পড়িতেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি তথা হইতে কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে যান। একবার তিনি তথায় গিয়া শুনিলেন যে শ্রীল আচার্যদেব সেখানে আছেন। তখন সকাল আটটা।

তিনি শ্রীল আচার্যদেবের দর্শনের জন্য গেলেন। দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার পর শ্রীল আচার্যদেব তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি স্বীয় পরিচয় প্রসঙ্গে বলিলেন যে তিনি ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিচিউট হইতে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজে আই.এ. পড়িতেছেন। কোথায় থাকিয়া পড়িতেছেন বলিয়া শ্রীল আচার্যদেব জিজ্ঞাসা করায় তিনি রায় বাহাদুর শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া পড়িতেছেন বলিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন তদানীন্তন বিহার-উড়িশ্যার সুপরিন্টেণ্ডিং ইংজিনিয়ার ছিলেন। তিনি শ্রীল আচার্যদেবের আশ্রিতও ছিলেন। চাকরি হইতে অবসর নেওয়ার পর তিনি কৃষ্ণনগরে অবস্থান করিতেছিলেন। অনেক সময়ে শ্রীগুরুদেবের নিকট মঠেও থাকিতেন। তিনি শিশুর ন্যায় অত্যন্ত সরল ও শ্রীগুরুগতপ্রাণ ছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রমথবাবু তাঁহার ঘরেই থাকেন শোনা মাত্রই শ্রীল আচার্যদেব বলিলেন—"রায় বাহাদুরের সঙ্গে অনেক দিন হইল দেখা হয় নাই। তাঁহাকে দেখিতে খুব ইচ্ছা হইতেছে।"

ঠিক এই সময়ে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবাবু তাঁহার কৃষ্ণনগর বাড়ীতে খুব ব্যথিত হইয়া চিন্তা করিতেছেন—"শ্রীগুরুদেব স্বতন্ত্র। তিনি এখন কৃপা করিয়া অতি নিকটে আসিয়াছেন। কখন কোথায় চলিয়া যাইবেন, ঠিক নাই। তাঁহার দর্শন ত হইল না।" বাড়ীতে এইটুকু কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ একটি ব্যাগে তাঁহার কাপড়চোপড় দু'খানি ভরিয়া কলিকাতা যাইবার উদ্দেশ্যে রেলষ্টেসনে আসিলেন। ষ্টেসনে পৌঁছাইয়া প্লাটফর্মের দিকে যাইতে যাইতে কলিকাতাগামী রেলগাড়িটি যাত্রা আরম্ভ করিল। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"ট্রেন ত ছাড়িয়া দিল, শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে কি আর দেখা হইতে পারিবে না!" এইটুকু বলামাত্রই তিনি নীচে পড়িয়া গেলেন। তার পর সব শেষ। কিছু সময়ের পর শ্রীল আচার্যদেব সকাল ৯ ঘটিকায় শ্রীরায় বাহাদুর স্বধামপ্রাপ্ত হইবার সংবাদ পাইলেন।

শ্রীরায়বাহাদুরের এই আকস্মিক বিয়োগ বাস্তবিক বিয়োগ নহে, ইহা শ্রীগুরুপাদপদ্মে যোগযুক্ত হইবার উদ্‌যোগ মাত্র। কারণ যখন শ্রীগুরুদেব শিষ্যের সঙ্গে দেখা হইবার কথা চিন্তা করিতেছেন, ঠিক ঐ সময়ে শিষ্যও শ্রীগুরুদেবের দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া জীবনকে তুচ্ছ করিয়া এই জগত হইতে বিদায় লইয়া যাইতেছেন। কি নিবিড় এ গুরু-শিষ্য সম্পর্ক! শ্রীমন্মহাপ্রভু এই প্রভু-ভৃত্য-সম্পর্ক সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ। সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ জন॥" (শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ৪।৪৫)।

শ্রীল আচার্যদেব যেরূপ শিষ্যবৎসল ছিলেন শ্রীরায়বাহাদুরও সেইরূপ তাঁহার সরলতা, শরণাগতি ও সেবানিষ্ঠাদ্বারা শ্রীগুরুদেবের হৃদয়কে জয় করিয়াছিলেন।

শ্রীগুরুদেব হইলেন শ্রীভগবানের কৃপার মূর্তি। তাই তাঁহার দিক্ হইতে কখনই কৃপার অভাব থাকে না। শিষ্য নিজেকে যতই তাঁহার কৃপাবরণযোগ্য করিতে পারিবে, ততই সেই কৃপালাভের অধিকারী হইতে পারিবে। নিজ অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি হইতে জাত অন্তর্দাহ ও তজ্জনিত অশ্রুই তাঁহার কৃপাবরণের একমাত্র কারণ। কোনও পার্থিব যোগ্যতাদ্বারা ইহা লভ্য নহে।

এবিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। শ্রী * * নামক অপর একজন সুপরিন্টেণ্ডিং ইংজিনিয়ার শ্রীল আচার্যদেবের প্রতি খুব অনুরক্তি প্রকাশ করিতেন। তিনি বেতন পাওয়া মাত্রই প্রত্যেক মাসে চারিশত টাকা তাঁহার সেবার উদ্দেশ্যে দিতেন। চারবৎসর কাল তিনি এইরূপ তাঁহার নিকট আসিতেন এবং সেবার জন্য প্রতি মাসে নিয়মিত চারিশত টাকাও দিতেন। সেপর্যন্ত শ্রীল আচার্যদেব তাহাকে শিষ্য করেন নাই। সেইজন্য তিনি অধৈর্য হইয়া একদিন বলিলেন, "প্রভো, চারবৎসর অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু এপর্যন্ত আপনার কৃপা পাইলাম না। আপনি যদি কৃপা করিয়া অনুমতি দেন তবে আমি অন্যের নিকট হইতে মন্ত্র লইতে পারি।" এই কথা শুনিয়া শ্রীল আচার্যদেব তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "তোমাকে শতবার অনুমতি দেওয়া হইল, তুমি অন্য গুরু করিতে পার।" তারপর তিনি অন্য গুরু করিলেন। পরের মাসে যখন চারশত টাকা আসিল, শ্রীল আচার্যদেব তাহা গ্রহণ না করিয়া ফিরাইয়া দিলেন এবং ভবিষ্যতেও তাহা গ্রহণ না করিতে তত্রস্থ সকলকে নির্দেশ দিলেন। তার পর তিনি অনেক বার আসিয়া শ্রীল আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলেন। তাহাও ব্যর্থ হইল।

শ্রীরায়বাহাদুর যে পদাধিকারী ছিলেন শ্রী * * ও সেই পদাধিকারীই ছিলেন। কিন্তু এক জনকে কৃপা করিতে ব্যাকুল থাকা স্থলে অন্য জনকে চরম উপেক্ষা করা শ্রীল আচার্যদেবের পক্ষে আদৌ দোষাবহ নহে। শ্রীরায়বাহাদুরের তাঁহার প্রতি মমত্ববোধ ও নিষ্ঠা তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছিল। তাই তিনি তাঁহাকে কৃপা করিতে ব্যগ্র হইলেন। যেহেতু তিনি কৃপার মূর্তি, কাহাকেও কৃপা করা তাঁহার পক্ষে একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। পক্ষান্তরে যে শিষ্য তাঁহার কৃপা বরণ করিতে পারিল, ইহা তাহারই মহত্ত্ব। যে নিজ জাগতিক পদমর্যাদাকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহার কৃপার জন্য যত কাঙ্গাল হইয়া চক্ষুর জলে বক্ষ সিক্ত করিতে পারিবে, সে ততই তাঁহার কৃপার ভাজন হইতে পারিবে। তাহা না করিয়া যে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া তাঁহার কৃপা আদায় করিতে চেষ্টা করিবে, সে বঞ্চিতই হইবে। শ্রীল আচার্যদেবের সম্পর্কে এইপ্রকার বহু উদাহরণ রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ পাল—শ্রীপালের ঠিকানা—গ্রাম ও পো: মগরা, জিলা: হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ। তিনি স্বধামগত খগেন্দ্রনাথ পালের পুত্র। শ্রীখগেন্দ্রবাবু শ্রীল আচার্যদেবের শিষ্য ছিলেন। তাই অচ্যুতানন্দবাবু বাল্যকাল হইতে তাঁহার পিতার নিকট হইতে শ্রীল আচার্যদেবের মহিমার কথা অনেক শুনিয়াছেন। চৌদ্দবৎসর বয়সে তিনি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। স্বধামগত মন্মথনাথ ঘোষ, এম. এ., বি. এল., তা'র গৃহশিক্ষক ছিলেন। শ্রীঘোষ মহাশয় খুব বিত্তশালী ছিলেন। তাই কোন চাকরি না করিয়া তিনি তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বেশ প্রতিভাবান্ ছাত্রও ছিলেন। আগ্রহী ছাত্রগণকে শিক্ষাদানে তাঁহার বেশ শখ ছিল। স্থানীয় লোকের অনুরোধক্রমে তিনি কিছুদিন বাগাটি রামগোপাল ঘোষ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য করিয়াছিলেন। শ্রীখগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে তাঁহার দীর্ঘদিনের পরিচয় ছিল এবং তিনি যে শ্রীল আচার্যদেবের আশ্রিত তাহা ঘোষ মহাশয়ও ভালভাবেই জানিতেন।

একদিন শ্রীঅচ্যুতানন্দ বাবু ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার শিক্ষক শ্রীঘোষ মহাশয়ের বাড়ীর নিকট আসিয়া পৌঁছাইলেন। সেই সময় শ্রীঘোষ মহাশয় সদর বারান্দায় একাকী বসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীঅচ্যুতানন্দ বাবুকে দূর হইতে দেখিয়া নিকটে ডাকিয়া ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বলিলেন—"তুমি তোমার বাবার গুরুদেবকে দেখেছ ?"

শ্রীঅচ্যুতানন্দবাবু—আজ্ঞে, হাঁ।

শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়—তাঁহার অসাধারণত্ব বিষয়ে কিছু জান ?

শ্রীঅচ্যুতানন্দ বাবু কিছু না বলিয়া নীরবে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়িতেছিলাম। একদিন কয়েক জন ছাত্র আসিয়া আমাকে বলিল যে আমাদের এখানে একজন শ্রুতিধর ছাত্র আসিয়াছে। তারপর ক্রমশঃ লক্ষ্য করিলাম যে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের মুখে সেই শ্রুতিধর ছাত্রের কথাই মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইয়াছে।

একদিন আমার কয়েকটি সহপাঠীর অনুরোধক্রমে তাহাদের সঙ্গে সেই শ্রুতিধর ছাত্রটিকে দেখিতে বাহির হইলাম। খুঁজিয়া খুঁজিয়া গিয়া দেখিলাম যে রূপলাবণ্যে ভরা দীপ্তিশালী একটি বালক গ্রন্থাগারে নিবিষ্টচিত্তে একখানি বই পড়িতেছে। পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিয়া এইটি বোধ হয় সেই শ্রুতিধর, ইহা অনুমান করিয়া তথায় বসিলাম। অনেক সময় বসিবার পর দেখিলাম যে,

ছেলেটি বইটির পড়া শেষ করিয়া বইটি রাখিয়া দিয়া চোখ বুঁজিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল। আমরা যে কয়েকটি ছেলে গিয়াছিলাম, কেহ শ্রুতিধর না হইলেও সকলেই মেধাবী ছাত্র হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচিত ছিলাম। ছেলেটিকে ধ্যানস্থ দেখিয়া আমরা সকলে ক্রমশঃ তাহার দিকে আগাইলাম। হয়ত' আমাদেরই চলার শব্দে ছেলেটির ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। আমাদের মধ্য হইতে একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করিল—"কি, বইটি পড়া হ'য়ে গেল?" ছেলেটি 'হাঁ' বলায় সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কি সবটা মুখস্থ হইয়া গিয়াছে?" ছেলেটি অপ্রত্যাশিতভাবে এইরূপ একটি প্রশ্ন শুনিয়া বিনীতভাবে উত্তর দিল—"কেন, কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন কী?" এই বলিয়া বইটি আমার সহপাঠীর দিকে বাড়াইয়া দিল। সহপাঠী বন্ধু বইটি হাতে ধরিয়া যেন একটু নিষ্প্রভের মত দাঁড়াইয়া থাকে। আমরাও সকলেই নিস্তব্ধ। এই সময় মৃদু হাসিয়া ছেলেটি সহপাঠী বন্ধুকে বলিল—"কি জিজ্ঞাসা করিতে চা'ন করিতে পারেন।" তখন সহপাঠী বন্ধুটি একটু দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া বইর পৃষ্ঠা উলটাইয়া একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। চিন্তা না করিয়া মুহূর্তের মধ্যেই শ্রুতিধর ছাত্রটি কেবল তার উত্তর দিল না, বইর কোন্ অনুচ্ছেদে ও কোন্ পৃষ্ঠায় উক্ত বিষয়টি আছে তাহাও বলিয়া দিল। আমরা সকলে সহপাঠী বন্ধুর পিছনে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতে ছিলাম। লক্ষ্য করিলাম সেই সহপাঠী বন্ধুর শরীরটা ঘামিয়া গিয়াছে। তার পর বন্ধুটি আরও দুটি প্রশ্ন করিল এবং প্রত্যেকটির উত্তর পূর্বের ন্যায়ই পাইল। ইহাতেই আমরা সকলে চকিত হইয়া গেলাম এবং মনে মনে শ্রুতিধরকে প্রণাম জানাইয়া নীরবে চলিয়া আসিলাম। 'শ্রুতিধর'এর কথা অনেকের নিকট শুনিয়াছিলাম। কিন্তু বাস্তবিক শ্রুতিধর কাহাকে বলে উহা সঠিক অবগত ছিলাম না। ঐ দিন সাক্ষাতে উক্ত বালককে দেখিয়া শ্রুতিধরসম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান লাভ করিলাম।

এ শ্রুতিধর ছেলেটি কে জানিতে পারিলে? ইনি তোমার বাবার গুরুদেব 'শ্রীঅনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ'। ইনি যে সাধারণ মনুষ্য নহেন, একজন ঐশশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, উহা তাঁহার ছাত্রাবস্থা হইতেই আমরা জানিতে পারিয়াছি। 'পরবিদ্যাভূষণ' উপাধির ইনি যে উপযুক্ত পাত্র ইহা নিঃসন্দেহ।"

শ্রীজগবন্ধু দাস— শ্রীসারঙ্গ-মুরারি শ্রীপাট, পো: জান্নগর, ভায়া: পূর্বস্থলী, পশ্চিমবঙ্গ। মামগাছিস্থ শ্রীসারঙ্গমুরারি শ্রীপাটে শ্রীল আচার্যদেব অবস্থান করিবার সময় আর একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ্যদর্শী হিসাবে শ্রীজগবন্ধুজী বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্যদেব মামগাছিতে আছেন শুনিয়া তাঁহার একজন সতীর্থ শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে তথায় গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ১২।১৪ জন লোকও ছিলেন। শ্রীল আচার্যদেবের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা না থাকার কথা শ্রীল সাগর মহারাজ পূর্ব হইতেই জানিতেন। তাই কোন কারণেও তিনি শ্রীল আচার্যদেবের প্রতি কোনও অসম্মানজনক ব্যবহার করিতে পারেন সেই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়া অন্যত্র বসিয়া রহিলেন। কারণ শ্রীল আচার্যদেবের মর্যাদাহানি সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত।

তাঁহাকে দেখা মাত্র শ্রীল আচার্যদেব বহু আদর করিয়া নিকটে বসাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জন্য প্রসাদ ব্যবস্থা করিতে শ্রীজগবন্ধুজীকে আদেশ করিলেন। সেখানে ত শ্রীল সাগর মহারাজ ও শ্রীজগবন্ধুজী এই দুইজনই থাকিতেন। তদনুযায়ী রান্নার বাসনও খুব ছোট ছিল। এত লোকের জন্য রান্না হবে কি করে? শ্রীজগবন্ধুজী বড় চিন্তায় পড়িলেন। যাহাই হউক, চারবার অন্ন রান্না করা হইল। তার পর বহু কষ্টে তরকারি ইত্যাদি করিয়া ভোগ দিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রসাদ পাইতে দিলেন। শ্রীল আচার্যদেব অনেক দৈন্য করিয়া শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীজীকে বলিতেছিলেন—"আপনি গোস্বামিসন্তান। কৃপা করিবেন যেন এ অধমের কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।" তিনিও তদ্রূপ দৈন্য করিয়া শ্রীল আচার্যদেবকে বলিতেছিলেন। বহু হরিকথা আলোচনার পর তাঁহাদের ভোজন শেষ হইল ও তাঁহারা বিদায় হইয়া গেলেন। যত লোক শ্রীল আচার্যদেবের নিন্দা করিত, তাঁহার আচরণ দেখিয়া তাহাদের অন্তরে তাঁহার প্রতি যথেষ্ট ভয় থাকিত। তজ্জন্য হঠাৎ তাঁহার প্রতি অসম্মান করিতে কেহ সাহস করিত না।

নিজ নিন্দুককেও শ্রীল আচার্যদেব এইরূপ যে আদর ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন ইহা তাঁহার অদোষদর্শিতারই নিদর্শন। পক্ষান্তরে শ্রীল সাগর মহারাজ শ্রীভক্তিসারঙ্গজীর সঙ্গে দেখা না করিয়া তাঁহার গুরুনিষ্ঠাই প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীসারঙ্গ মুরারি শ্রীপাটের আর এক দিনের ঘটনা। শ্রীপাটের আঙ্গিনায় একটি পুরাতন বকুলবৃক্ষ আছে। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের। লোকে ইহাকে সিদ্ধবকুল বলিয়া থাকেন। একদিন শ্রীল সাগর মহারাজ ও শ্রীল আচার্যদেব মন্দিরের পাশের বারান্দায় বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। এই সময়ে শ্রীসাধুচরণ দাস নামক একজন গৃহস্থ ভক্তের স্ত্রী উক্ত সিদ্ধবকুলের নীচে ঝাঁটাইতে ছিল। হঠাৎ শ্রীল আচার্যদেবের দৃষ্টি তাহার দিকে পতিত হইল। তিনি শ্রীল মহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ! এ স্ত্রীলোকটিকে আর মাতৃকুক্ষিতে আসিতে হইবে না।"

শ্রীল আচার্যদেবের অযাচিত কৃপায় এস্ত্রীলোকটি বিনা সাধনে উদ্ধার পাইয়া গেল চিন্তা করিয়া শ্রীল মহারাজ বিস্মিত হইলেন। অবশ্য তিনি শ্রীল আচার্যদেবের মহিমা পূর্ব হইতেই জানিতেন। তাই তিনি গৃহস্থলীলা করিলেও শ্রীল মহারাজ তাঁহাকে নিজ শিক্ষাগুরু ব্যতীত অন্য কোন দৃষ্টিতে কখনও দেখেন নাই।

তারপর উক্ত স্ত্রীলোকটি বাড়ী চলিয়া গেল। তার স্বামী (শ্রীসাধুচরণ দাস) বিশাল সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু তাঁহাদের কোন সন্তান ছিল না। শ্রীসাধুচরণ জী তাঁহার স্ত্রীকে খুবই ভাল বাসিতেন। একদিন তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের ত' কোন সন্তান নাই, এ বিশাল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ কে করিবে ? আমি আর একটি বিবাহ করিব বলিয়া ভাবিতেছি।" তখন তিনি বৃদ্ধাবস্থায় পদার্পণ করিয়া ছিলেন। তথাপি তাঁহার প্রস্তাবে তাঁহার স্ত্রী সম্মতি দিলেন ও তিনি বিবাহও করিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রী আসিবার পর ক্রমশঃ তিনি তাঁহাতে আসক্ত হইয়া পড়িলেন এবং প্রথম স্ত্রীকে হতাদর করিতে লাগিলেন। যে স্বামী পূর্বে তাহাকে এত ভালবাসিতেন, দ্বিতীয় স্ত্রী আসিবার পর তিনি তাহার প্রতি এইরূপ তাচ্ছিল্য করিতেছেন দেখিয়া তিনি যে শাড়ী খানি পরিয়াছিলেন সেই এক বস্ত্রেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তথা হইতে নিজের ভগ্নীর বাড়ীতে গিয়া কেবল শ্রীবৃন্দাবন যাইবার রেলভাড়ার জন্য যতটুকু আবশ্যক সেই পরিমাণ টাকা লইয়া তথায় চলিয়া গেলেন।

একবার শ্রীজগবন্ধুজী শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের জন্য গিয়াছিলেন। হঠাৎ দেখিলেন যে কেশীঘাটে তিনি বসিয়া ভিক্ষা করিতেছেন। শ্রীজগবন্ধুজীকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া আমার বিষয়াসক্তি ছাড়াইয়া আমাকে একান্তভাবে ভজন করিবার সুযোগ দিয়াছেন। কৃপা করুন যেন আমার ন্যায় পতিতার প্রতি তাঁহার অপার করণার কথা স্মরণ করিতে করিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারি।" তাঁহার এ অবস্থা দেখিয়া শ্রীজগবন্ধুজী নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কারণ এতবড় ধনীঘরের স্ত্রী, তিনি আবার ভিক্ষা করিতেছেন, অথচ তজ্জন্য তাঁহার একটু দ্বিধাও নাই! এইসব অঘটন কিরূপে ঘটিল ? ইহা মহৎকৃপারই প্রভাব। সেদিন শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীমুখে যে বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল—"এস্ত্রীলোকটিকে আর মাতৃকুক্ষিতে আসিতে হইবে না"—ইহা তাহারই পরিণতি। ধন্য সেই সৌভাগ্যবতী রমণী যে এইরূপ যাদৃচ্ছিকী মহৎকৃপার ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে দুশ্ছেদ্য সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া একান্তভাবে শুদ্ধভক্তিপথাশ্রিত হইল! অতঃপর তিনি কিরূপে বাড়ী হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে

আসিলেন ইত্যাদি সকল ঘটনা তাঁহার নিকট শুনিয়া শ্রীজগবন্ধুজী অনুভব করিলেন যে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে শ্রীল আচার্যদেবের ইচ্ছা হওয়ায় তাঁহারই প্রেরণায় শ্রীসাধুচরণজী তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রীর প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার সংসারত্যাগের কারণ হইল।

কিছুদিন পরে শ্রীজগবন্ধুজী শুনিলেন যে, তাঁহার ব্রজপ্রাপ্তি হইয়া গিয়াছে। মহৎকৃপার কি অদ্ভুত ফল! ইহাকেই "বিরলোদয় যাদৃচ্ছিকী কৃপা" বলা হয়। এই কৃপা কোন সাধনের অপেক্ষা রাখে না; বিনা সাধনেই চরমসিদ্ধি দান করিয়া থাকে।

মহৎকৃপাই ভক্তিকামীর একমাত্র সম্বল। শ্রীমদ্ভাগবতাদি সমস্ত শাস্ত্র তারস্বরে এই মহৎকৃপারই মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। মহৎকৃপা ব্যতীত ভক্তিসাধন ত দূরের কথা অনাদিবিমুখ স্বসুখকামী জীবের হৃদয়ে ভক্তিবাসনাই জাগিবে না। মহৎকৃপাই জীবের ভাগ্য, মহৎকৃপাই ধন, মহৎকৃপাই সবকিছু। মহৎকৃপালাভের পূর্বে যে তথাকথিত ভক্তির অনুষ্ঠান, তাহা ভক্তি নহে—পুণ্যকর্মমাত্র। অতএব তাহা সংসারবন্ধনেরই কারণ। ভক্তির একমাত্র কারণ মহৎকৃপা, কিন্তু মহৎকৃপার কোন কারণ নাই। ইহা স্বতন্ত্রা। মহতের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই তাঁহার কৃপালাভের একমাত্র কারণ। ইহা কখন যে কাহার উপর বর্ষিত হইবে তাহা কেহ বলিতে পারিবে না। অতএব সেই মহামহিমাময় মহৎকৃপালাভ-নিমিত্ত ব্যাকুল ক্রন্দনই সর্বসাধনসার। এই ক্রন্দনই মহতের হৃদয়কে বিগলিত করাইয়া তাঁহাকে কৃপোন্মুখ করাইবে।

'সহায়ো মে মাত্রং বিতথদলনী বৈষ্ণবকৃপা।'

আর্তিকুসুমাঞ্জলি

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথের শ্রীপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি

হে মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীগৌরহরি ! অনাদি-বিমুখ স্বসুখবাসনাজ্বালাসন্তপ্ত জগজ্জীবকে তোমার প্রেমরূপ অমৃতসিঞ্চনে স্নিগ্ধ করিয়া কৃতার্থ করিতে তোমার কি ব্যগ্রতা! আবার সেই প্রেমমকরন্দপানের পিপাসায় তোমার শ্রীচরণভৃঙ্গগণের যে কিরূপ ব্যাকুলতা ও তজ্জন্য কিরূপ অনন্যসাধারণ স্বার্থত্যাগ তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা এ জীবকীটের নাই। যাঁহার প্রীতিবিধাননিমিত্ত ভক্তপ্রবর শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত একমাত্র পুত্রের মৃত্যুরূপ শোকপর্যন্ত গণনা করিলেন না, শ্রীশ্রীরূপসনাতন রাজকার্য ত্যাগ করিয়া কাঙ্গাল হইলেন, শ্রীরামানন্দ রায় অনতিবিলম্বে রাজপদবী ত্যাগ করিলেন, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য ও অপ্সরাসম স্ত্রী এমনকি পানাহারপর্যন্ত ত্যাগ করিলেন, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য তোমার নিন্দাকারী স্বীয় জামাতার মৃত্যু কামনা করিলেন ও তাঁহার পত্নী নিজকন্যাকে রাঁড়ী(বিধবা)হইতে অভিশাপ দিলেন, গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব রাজপদবীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন, শ্রীগদাধর পণ্ডিত ক্ষেত্রসন্ন্যাসকে জলাঞ্জলি দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করিলেন না, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিপুল ঐশ্বর্যের অধিপতিত্ব ত্যাগ করিয়া ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি দিতে ব্যাকুল হইলেন এবং তুমিও যাঁহাদের স্বার্থত্যাগে অভিভূত হইয়া কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দি স্নেহভরা হৃদয়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছ—

“কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তাঁদের করিহ পালন ॥” (চৈ: চ: ম ২৫।১৩৬)

হে ভক্তপ্রেমকাঙ্গাল শ্রীগৌরহরি! জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধী সতত স্বসুখকামী এ নির্ঘৃণ কবে এইরূপ স্বার্থত্যাগপূর্বক সতত চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া তোমার সেই অমন্দোদয় অহৈতুকী কৃপাবরণে যোগ্য হইবে! তুমি কবে এ নরাধমের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া তোমার গুণবর্ণনে শতজিহ্ব, অনাদিবিমুখ স্বসুখবাসনাজর্জরিত কর্মাধিকারী জীবকুলকে তোমার শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া রাগমার্গীয় ভজনের অধিকারী করাইতে সতত ব্যগ্র ও তদুদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলিপ্রদানকারী তোমার অন্তরঙ্গজন জীবদুঃখকাতর হীনার্থাধিকসাধক শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরকে

তাহার হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া তোমার দ্বারা বিতরিত বিমল প্রেমলাভের অধিকারী করাইবে!

হে ঝারিখণ্ডের বন্যপশুকে গোপীপ্রেমদাতা শ্রীগৌরগুণধাম! এ স্বসুখচিন্তাকুল নরপশু এই জন্মেই যেন তোমার সেই প্রিয়জনের যথাযথ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদনকারী মহদ্‌গণের আনুগত্যে তাঁহার নিঃশুল্ক দাস হইতে পারে, তোমার শ্রীপাদপদ্মে এ দুরিত জীবের এই আকুল সাশ্রু নিবেদন।

হে গৌরদাতা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভো! পতিত আর্ত বিষয়ীর বিষয়বাসনা দূর করিয়া তাহাকে শ্রীগৌরপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট করানো তোমার একমাত্র কার্য। তুমি যেরূপ জগাইমাধাইর প্রতি করুণাপ্রকাশপূর্বক তাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলে এবং তোমার অলঙ্কার-অপহরণে চেষ্টিত দস্যুগণেরও পরিত্রাণ করিয়াছিলে, সেইরূপ তোমার সেই বিরলোদয় কৃপাদৃষ্টি এ জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধী, অনভীপ্‌সু নরপশুর প্রতি পতিত হউক। তোমার কৃপাকর্ষণের নিমিত্ত যে আর্তি আবশ্যক এ দুরন্ত অপরাধীর পাষাণ-হৃদয়ে তাহার লেশমাত্রও নাই। সুতরাং এ নরাধম তোমার কৃপাবরণে সর্বতোভাবে অযোগ্য। তথাপি হে জগাই-মাধাই-উদ্ধারকারী! হে দস্যুগণের পরিত্রাতা! তুমি তোমার বিরলোদয় কৃপাদৃষ্টিনিক্ষেপদ্বারা এ পতিতাধমকে কৃতার্থ করিয়া তাহাকে তোমার শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে সতত ব্যগ্র তোমার নিজজনের প্রতি গাঢ়প্রীতিযুক্ত করাও, তোমার অভয় শ্রীপাদপদ্মে এ পতিতাধমের এই সকাকু প্রার্থনা।

হে গৌরআনাঠাকুর শ্রীসীতানাথ! জগজ্জীবের দুঃখে বিগলিতহৃদয় তুমি ব্যাকুল প্রার্থনাদ্বারা শ্রীগৌরহরিকে এ জগতে প্রকট করাইয়াছ জগদ্‌বাসী বিমুখ জীবকে প্রেমদানে কৃতার্থ করিতে। কিন্তু এ অপরাধী কৃতঘ্ন দেহগেহচিন্তাকুল মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীগৌরপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হইল না। বিষয়াবিষ্ট হইয়াই পড়িয়া রহিল। হে সীতানাথ! তুমি কৃপাপূর্বক এ কৃপণের হৃদয়-সিংহাসনে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে উপবিষ্ট করাও। তাঁহারা এ নিঘৃণের হৃদয়ের স্বসুখবাসনারূপ অন্ধকার দূর করিয়া এই জন্মেই যেন তাহাকে তাঁহাদের প্রিয়জন হীনার্থাধিকসাধক শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের প্রতি প্রীতিযুক্ত করান। এ পতিত যেন সেই পরমকরুণাময় শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে নিত্যকাল অবস্থান করিয়া তাঁহার উপদিষ্ট তোমাদের (শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথের) নাম-গুণ-গানে ব্রতী হইতে পারে। এই জন্মে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম লাভ না হইলে এ নারকী

স্বীয় কর্মফলানুযায়ী কি জন্ম যে লাভ করিবে তাহা বলা যায় না। যদিও বা মনুষ্যজন্মই লাভ হয়, তবে তোমাদের গুণ-মহিমা ও তোমাদের নিজজনের গুণ-মহিমা কি তা'র স্মৃতিপটে থাকিবে? এই কারণে আর কালবিলম্ব না করিয়া এই জন্মেই যেন তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মবিক্রয়ের মহাসৌভাগ্য লাভ হয়, তোমাদের অভয় শ্রীপাদপদ্মে এ নির্ঘৃণের এই মিনতি।

শ্রীসদাশিবের শ্রীপাদপদ্মে সকাকু প্রার্থনা

হে শিবশম্ভো! এ অজ্ঞ তাহার বাল্যকালে বালসুলভ অজ্ঞতা হেতু কোন্ পথে গেলে তাহার নিত্য মঙ্গল হইবে বহু চিন্তাসত্ত্বেও তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তাহাকে উপযুক্ত পথ-প্রদর্শনের নিমিত্ত তোমার শ্রীপাদপদ্মে ব্যাকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিল। হে কৃপার্দ্র প্রভো! এ নির্বোধ পাছে বিপথগামী হইয়া যায় তজ্জন্য কালবিলম্ব না করিয়া তুমি সত্বরই তাহাকে তোমার প্রিয়জন শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের সন্ধান দিয়াছ। তোমার সেই প্রিয়জনের শ্রীপাদপদ্মধনকে যেন নিত্যকাল এ নরাধম তাহার হৃদয়-সম্পুটে সযত্নে রাখিতে পারে এবং তাঁহারই গুণ স্মরণ করিতে করিতে যাহাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে, তোমার শ্রীপাদপদ্মে এই সকাকু প্রার্থনা।

নিখিল শ্রীগৌরানুগ বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে আর্তি-নিবেদন

হে শ্রীশ্রীরূপসনাতন-জীবাদি শ্রীগৌরানুগ বৈষ্ণবমণ্ডলি! তোমাদের প্রিয়জন শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুর তোমাদের অনুসরণে তোমাদের প্রবর্তিত সিদ্ধান্তালোকে জগজ্জীবের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বিমল ভজনে প্রবৃত্ত করাইতে জীবন পণ করিয়া আবেগভরে কি যে বিপুল উদ্যম করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধী এ নির্ঘৃণ প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি সতত পতিত হইলেও সে তা'র অবিবেকিতায় তাঁহার এতাদৃশ কৃপা-বরণে নিজেকে যোগ্য করিতে পারিল না। তাহার এই দুরবস্থা দর্শনে কৃপার্দ্র হইয়া যদি তোমরা তাহাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট না কর তবে তাহার জীবন বৃথা হইয়া যাইবে। সুতরাং হে বৈষ্ণবঠাকুরগণ! এই জন্মেই তোমাদের প্রিয়জনের কৃপাবরণে যোগ্য করাইয়া এ দুঃখীকে সুখী কর, তোমাদের শ্রীচরণে এই আর্তি-নিবেদন।

শ্রীগুরুদেবতাত্ম বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে মিনতি

হে অমলাশয় শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ! শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাভাজন হওয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণের মধ্যে

তুমি ছিলে বরিষ্ঠ। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটের অব্যবহিত পূর্বে সকল শিষ্যগণের সমক্ষে শ্রীল আচার্যদেবকে (তদানীন্তন শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারীকে) তাঁহার অন্তে শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী কীর্তন করিয়া আচার্যের কার্য করিতে কৃপাদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, উক্ত শিষ্যগণের মধ্যে অধিকাংশই গুরু হইবার মোহ বর্জন করিতে না পারিয়া তাঁহার আনুগত্য ত্যাগ করিল। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে তুমি বরিষ্ঠ তথা তাঁহার (শ্রীল আচার্যদেবের) সর্বজ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা হইয়াও সর্বদা তাঁহাকে শিক্ষাগুরুর মর্যাদা দিয়াছ এবং তাঁহার দৃঢ় আনুগত্যে থাকিযাই তাঁহার কৃপানির্দেশানুযায়ী ভজনে ব্রতী হইয়া গুর্বানুগত্যের প্রকৃষ্ট আদর্শ জগতে স্থাপন করিয়াছ।

হে ত্রিকালজ্ঞ শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ! তুমিও শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণের অন্যতম। শ্রীল প্রভুপাদ তোমাকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া বহুবার বলিয়াছেন। তুমিও গুরু হইবার মোহ ত্যাগ করিয়া শ্রীল আচার্যদেবের একান্ত আনুগত্যে ভজন করিয়াছ। মিশনের ভিক্ষালব্ধ বিষয়ীর অন্নে উদর-পোষণ ভজনের ঘোর প্রতিকূল, শ্রীল আচার্যদেবের উপদেশ হইতে ইহা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ মিশনের সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য মলবৎ ত্যাগ করিয়া অসহনীয় কায়ক্লেশ স্বীকারপূর্বক তুমি শ্রীসারঙ্গমুরারি ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ ও শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া যেভাবে তাঁহাকে (শ্রীল আচার্যদেবকে) অভিভূত করিয়াছ, তাহার তুলনা নাই। শ্রীগুর্বানুগত্যের তোমার এই আদর্শ যুগে যুগে ভক্তিসাধকের আলোকস্তম্ভ হইয়া থাকিবে।

হে শরণাগতির মূর্ত বিগ্রহ শ্রীনারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভো! তুমি গৃহস্থবেশে থাকিলেও তোমার আদর্শ আচরণদ্বারা তুমি নিজেকে সন্যাসিগণেরও ঊর্দ্ধে অবস্থাপিত করিয়াছ। শ্রীল আচার্যদেব তোমার সতীর্থ হইলেও শিক্ষাগুরুজ্ঞানে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে তোমার যে শরণাগতি, যে সুদৃঢ় নিষ্ঠা, তাহা ভক্তিকামিমাত্রেরই নিত্যকাল আদর্শ হইয়া থাকিবে।

হে পরমারাধ্যা শ্রীমাতাঠাকুরাণি! শ্রীল আচার্যদেবের তিরোভাবের পর তোমার আত্মীয়গণের সঙ্গে সুখে অবস্থানের যাবতীয় অনুরোধ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া তুমি ২৮ বৎসরকাল সমস্ত ভোগসুখকে জলাঞ্জলিপ্রদানপূর্বক শ্রীগুরুদেবের সুখান্বেষণে ব্রতী হইয়া পড়িয়া রহিলে। শ্রীগুরুদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যে তোমার এবংবিধ স্বার্থত্যাগদ্বারা তুমি যেভাবে তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে তোমার অপ্রকটকালীন আচরণদ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল। তোমার এই আদর্শ গুর্বনুরাগী প্রত্যেক সাধকের যে অন্বেষণীয়, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

হে শ্রীগুরুদেবতাত্ম বৈষ্ণবঠাকুরগণ! শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুরের ন্যায় অমলাশয় মহতের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্বক তাঁহার শিক্ষার অনুসরণে ব্রতী হইয়া তোমরা জগতের সমক্ষে যে অপূর্ব আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছ, তাহা নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রে সকলেরই যে অনুসরণীয়, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সতত কর্মফল-আত্মসাৎকারী স্বসুখবাসনা-সাগরের অতলগর্ভে নিমজ্জমান মাদৃশ জীবাধমকে ক্রমপন্থায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমশৈলের উত্তুঙ্গ শিখরে আরূঢ় করাইতে তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম সত্ত্বে এ নরপশু তাঁহার কৃপার মহিমা উপলব্ধিই করিতে পারিল না। সুতরাং তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবেই বা কিরূপে ? হে অদোষদর্শী বৈষ্ণবঠাকুরগণ! এ দুরন্ত অপরাধীর মস্তকে পাদপদ্ম ধারণপূর্বক এই কৃপাশীর্বাদ কর যেন সে তোমাদের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বীয় সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলিপ্রদানপূর্বক তাঁহার অনাবিল শিক্ষার অনুসরণে ব্রতী হইতে পারে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাশ্রু নিবেদন

হে শুদ্ধভক্তিস্থাপনব্রতৈকনিষ্ঠ, বিপ্রলম্ভরসাবিষ্ট, কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দি স্নেহশীল, হীনার্থাধিকসাধক শ্রীগুরুদেব! কলিহত জীবগণকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ সুদুর্লভ সম্পত্তিদানে কৃতার্থ করিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উক্ত সম্পত্তির মূলস্বত্বাধিকারিণী শ্রীরাধারাণীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীগৌরহরিরূপে এজগতে অবতীর্ণ হইলেও কালপ্রভাবে হরিবিমুখ জীবকুল উপযুক্ত আচার্যের অভাবে তাঁহার শিক্ষার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া প্রেমপ্রাপক রাগমার্গীয় ভক্তিসম্বন্ধে বিকৃত ধারণা পোষণপূর্বক তৎসাধনে বঞ্চিত হইল। জগতের এই দুর্দিনে শ্রীগৌরহরির দ্বারা প্রেরিত হইয়া তুমি তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীজীবপাদের সন্দর্ভরূপ সিদ্ধান্তবর্তিকাদ্বারা ভক্তিগগনধ্বান্ত-বিনাশপূর্বক সকলের হৃদয়ে এমনকি দুরন্ত-অপরাধীর ঊষর হৃদয়-ক্ষেত্রেও ভক্তিবীজ-বপনে ব্যগ্র হইয়া নিজের সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়াছ। তোমার এতাদৃশ বিপুল চেষ্টাসত্ত্বেও অনেকে তোমার শিক্ষা ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে পারিল না বলিয়া তুমি যে কত ব্যথিত হইয়াছ, কত যে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছ, তাহার ইয়ত্তা নাই।

শ্রীগৌরহরি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইলেও তিনি শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট হওয়ায় তাঁহার হৃদয় সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানে মগ্ন। শ্রীরাধারাণী সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সম্পাদন করিয়াও প্রেমের স্বভাববশতঃ কিছুই করিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার যে ব্যাকুলতা ও তজ্জনিত যে অন্তর্দাহ, তাহা শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরহরিতে পরিপূর্ণরূপে সর্বক্ষণ পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার হৃদয়ের সেই ভাবতরঙ্গ তাঁহার ভজনকারীর

হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবে এবং অভাববোধজনিত অন্তর্দাহে হৃদয়কে মথিত করিয়া চক্ষুতে অশ্রুর উদ্গম করাইবে। যাহার চক্ষুতে নিরন্তর অশ্রুর উদ্গম হইবে, সে এই জন্মেই শ্রীগৌর-নিজজনের কৃপাবরণযোগ্য হইয়া শ্রীগৌরহরির প্রতি প্রীতিযোগ লাভ করিতে পারিবে। বস্তুতঃ অশ্রুই পরমকরুণ শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজনের একমাত্র অনবদ্য উপকরণ। তজ্জন্য তোমার অনুগত সকলের হৃদয়ে ভজনের অভাববোধজনিত অন্তর্দাহ সৃষ্টি করিয়া চক্ষুকে অশ্রুভারাক্রান্ত করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজনে প্রবৃত্ত করাইতে তোমার যে কিরূপ ব্যগ্রতা ছিল জনৈক অনুগতের প্রতি তোমার নিম্ন উপদেশই তাহার প্রমাণ—"তোমরা যদি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পার, যেখানেই থাক না কেন আমি তোমাদিগকে ছাড়িতে পারিব না। তোমরা আমাকে ছেড়ে দিতে পার, তাতে কিছু আসে যায় না, আমি কিন্তু তোমাদিগকে ছাড়িতে পারিব না, ছাড়িতে পারিব না।"

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রবর্তিত রাগমার্গীয় ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইলে চক্ষুতে অশ্রুর উদ্গম যে অপরিহার্য, তাহা স্বয়ং শ্রীগৌরহরি শ্রীশিক্ষাষ্টকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তজ্জন্য সকলকে এই অশ্রুপাতরূপ ভজনের অধিকারী করাইতে তোমার যে কিরূপ ব্যাকুলতা ছিল, তোমার নিম্ন উক্তিই তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়—"শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মহাবদান্যতা ও নিজের পরমশোচ্যতমতার চিন্তা যতকাল হৃদয়কে দৈন্যপরিপ্লুত করিয়া বিগলিত না করিয়াছে, ততকালপর্যন্ত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তির প্রকাশ একান্ত অসম্ভব। বাস্তব দৈন্যের অবিরাম উত্তপ্ত অশ্রুধারায় জন্মজন্মান্তরের অপরাধকঠিন হৃদয়-পাষাণকে ক্ষয় করিয়া দিতে হইবে, গলাইয়া দিতে হইবে"—এই বিচারের অগ্নিমন্ত্রে অকপট সাধক-সমাজকে দীক্ষিত করাইবার সুদৃঢ় সংকল্প লইয়া তুমি যেন শতজিহ্ব হইয়া প্রত্যেক সাধকের কর্ণে এই জাগরণের মন্ত্র ঝঙ্কৃত করিয়াছ। এইরূপে মায়ার কোলে মোহনিদ্রায় সুপ্ত স্বসুখস্বপ্নাবিষ্ট জীবের দেহসুখের প্রতি শতধিক্কার-প্রবৃত্তির উদয় করাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ে দীনতাদেবীর আবির্ভাবদ্বারা তাহা হইতে দম্ভদৈত্যের বিতাড়ন-কৌশল-শিক্ষা ও সর্বদা আর্তির জন্য অন্তর্দাহ উদ্রেক করাইবার প্রেরণাদান তোমার আচার্যত্বের মহান্ বৈশিষ্ট্য।

দুরন্ত-অপরাধপঙ্কে নিমজ্জমান কর্মফল-আত্মসাৎকারী অজাতরতি সাধককে অকপট অশ্রুর সাহায্যে কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল মহৎকৃপা-বরণযোগ্য করাইয়া জাতরতি-ভূমিকায় উন্নীত করাইতে তোমার এই যে নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম, ইহা যুগে যুগে তোমার নিত্যসিদ্ধ আচার্যত্বের বৈজয়ন্তী উড়াইতে থাকিবে।

হে হ্লাদিনীশক্তির দূত! অনুগতগণের প্রতি তোমার হৃদয়গঙ্গোত্রীনির্গত বাণীমন্দাকিনী অনাদিস্বসুখবাসনাজ্বালাসন্তপ্ত এ নির্ঘৃণের হৃদয়মরুকে শীতল করিয়া তোমার প্রতি প্রীতিযোগপ্রদায়িনী শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপালাভের আশায় উদ্বেলিত করুক এবং পরিশেষে অশ্রুরূপে তাহার নয়নপথে প্রবাহিত হইয়া তাহার সেই অভীষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মের পাদ্য রচনা করুক। এ জীবাধমের তোমার শ্রীপাদপদ্মে এইমাত্র সকাকু প্রার্থনা।

"আমার সকলের সঙ্গে আর দেখা হইতে পারিবে না। সকলকে বলিয়া দিবে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শচীসুত গৌরগুণধাম' ও 'শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সিতানাথ' এই নাম চোখের জলে বুক ভাসাইয়া সর্বদা কীর্তন করিবে। তাহা হইলে নিশ্চিতরূপে সকলে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপালাভ করিতে পারিবে।" অপ্রকটলীলাকালে অনুগতগণকে তোমার এই যে স্নেহপূর্ণ উপদেশ, তাহা তাহাদের প্রতি তোমার অচিন্তনীয় স্নেহশীলতার পরিচয় দেয় না কী? তোমার এতাদৃশ আচরণ হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে যে, মাদৃশ অযোগ্য শিষ্যাভিমানী তোমাকে ভুলিলেও তুমি তাহাকে ভুল নাই। একদিন না একদিন নিশ্চিতরূপে তাহাকে তুমি তোমার শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট করিবেই। অপ্রকট সময়ে তোমার অনুগতগণের কথা চিন্তা করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবেশের দ্বারা তুমি স্পষ্ট করিয়া দিয়াছ যে, তাহাদের নাম তোমার হৃদয়পঞ্জীতে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং সর্বসাধনহীন ও নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও যে একান্তভাবে তোমার শ্রীপাদপদ্মকে আশ্রয় করিয়া জীবনের শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত পড়িয়া থাকিবে, সে যে অবশ্যই তোমার কৃপাকণালাভের যোগ্য হইবে, ইহাতে লেশমাত্রও সন্দেহ নাই।

হে কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দি স্নেহশীল শ্রীল আচার্যদেব! এ অযোগ্য দীন হীন কাঙ্গালের তোমার শ্রীচরণকমলে পূর্ণপ্রাণে এই ব্যাকুল প্রার্থনা যে, এ অপরাধী ও অনভীপ্সুর শিরে পাদপদ্ম স্থাপন করিয়া তোমার সেই করুণার মহিমাজ্ঞানে তা' হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া দাও। সে যেন অনুক্ষণ তা'র প্রতি তোমার কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দি স্নেহ ও করুণার কথা স্মরণপূর্বক সেই কৃপালাভের আশাবন্ধ লইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে অশ্রুবর্ষণপূর্বক শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে। শাস্ত্রে আছে মৃত্যুসময়ে শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিলে জীব সংসারবন্ধনমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে, কিন্তু মাদৃশ অপরাধীর পক্ষে মৃত্যুসময়ে তোমার শ্রীচরণস্মৃতি শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি হইতেও বহুগুণে শ্রেয়স্কর। তুমি শ্রীহ্লাদিনীশক্তির দূত। তোমার হৃদয় নিত্য

নবনবায়মানভাবে শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের প্রীতিবিধানচিন্তায় নিমগ্ন। তোমার কৃপাকণা লাভ হইলেই তোমার এই স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হইবে এবং তোমার গুণের অনুক্ষণ স্মরণপ্রভাবে তোমার অহৈতুকী কৃপায় বৈকুণ্ঠবাস হইতেও শ্রেয়স্কর তোমার হৃদয়-দেবতার সেবালাভ হইবে।

"তোমার কৃপা-মহিমা দেহ হৃদে ভরি।
যায় যেন এ জীবন তব গুণ স্মরি॥
তোমার হইয়া যেন শ্রীচৈতন্য গাঙ।
জন্মে জন্মে যেন তোমার সংহতি বেড়াঙ॥"

তোমার কৃপার মহিমা স্মরণপূর্বক মৃত্যুবরণ করিয়া যেন জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর হইতে পারি, এ কৃতঘ্নের তোমার অভয় শ্রীপাদপদ্মে এই সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনা।

জয় অশরণগণবন্ধু হীনার্থাধিকসাধক
শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুর কী জয়।